মনজঙ্গল

শংকর

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৬১

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

মনোভূমি

মাধুরী, আজ আমার জন্মদিন।

তুমি এবাড়িতে থাকলে এতোক্ষণ তুমি নিজেই ব্যাপারটা আমাকে মনে করিয়ে হৈ-হৈ বাধিয়ে দিতে। এই জন্মদিনের প্ল্যানিং-এ তুমি আমার কোনো কথা শুনতে না, অথচ অতি বড় শত্রুও তোমাকে আমার অবাধ্য বলবে না।

আমার মনে আছে মাধুরী, এই জন্মদিন নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কত দার্শনিক আলোচনা করেছি। সাহিত্যিক স্বামীর সঙ্গে ফিলজফির গন্ধ-মেশানো গভীর আলোচনায় তোমার কখনই অনাগ্রহ ছিল না।

আমার ভুলে যাবার কথা নয় মাধুরী, আমি তোমাকে কোনো এক ফরাসী লেখকের উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম—'পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেরই জন্মদিন এবং জন্মমুহূর্ত রয়েছে। সামান্য একটা ঘটনাকে অসামান্য করে তোলবার কোনো মানে হয় না। জন্মদিনে জন্মে মৃত্যুদিনের জন্যে তেরি হওয়াটাই প্রত্যেকটি জীবের একমাত্র কাজ।'

মাধুরী, তুমি তোমার পাতলা চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তারপর জিজ্ঞেস করেছিলে, "লোকটার ঠিকানা কী?"

লেখককে এক সেট শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ডাকে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলে তুমি এবং আমি খুব মজা পেয়েছিলাম। সেই ফরাসী লেখক জন্মদিন সম্বন্ধে কটূক্তি করে যথাসময়ে সেখানে চলে গিয়েছেন যেখানে পৃথিবীর কোনো ডাক পিওনোর পৌঁছনোর এক্তিয়ার নেই।

মাধুরী, স্বামীর জন্মদিনে তোমার ছকে-বাঁধা সময়সূচী ছিল। তুমি ভোরবেলাতেই স্নান সেরে নিতে। তারপর একটা দেড়হাত চওড়া-পাড়ের লাল শাড়ি শরীরে জড়িয়ে ছুটতে সেই কোথায় দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে। পাড়ার একটা বশংবদ ট্যাক্সি ড্রাইভার তোমাকে নিয়ে যেতো খুব খুশি হয়ে, কারণ সেও বিনা পথখরচায় মায়ের পায়ে এই সুযোগে ফুল চড়িয়ে আসতো। আমাদের বাড়ির কাছে কালিঘাট, সেখানেও জননী আদ্যাশক্তি সমমহিমায় বিরাজ করছেন, কিন্তু তুমি ওই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে আমার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে শান্তি পেতে। একই কোম্পানির বিভিন্ন ব্রাঞ্চ অফিস! সুতরাং যেখানেই যাও দেবীর কোনো আপত্তি হবে না।

দক্ষিণেশ্বর থেকে তোমার ট্যাক্সি ছুটতো বেলুড়ে, স্বামীজীর উত্তরসাধক মহারাজদের শ্রীচরণের ধুলি তুমি আমার জন্যে সংগ্রহ

করে আনতে, তোমার সঙ্গে থাকতো আমার শেষ প্রকাশিত উপন্যাসের এক কপি। আশীর্বাদধন্য সেই কপিটা তুমি সযত্নে আলমারিতে তুলে রাখতে পরম ভক্তিভরে। তারপর বলতে, তুমি এবার এমন জিনিস লেখো যাতে মানুষের মুক্তি হয়।

মাধুরী, আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি, তোমার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, সন্দেহ নেই। তুমি মহাপুরুষদের আশীর্বাদের ওপর স্থির বিশ্বাস করে বসে আছো—মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। মানুষের বুকের মধ্যে যে ঈশ্বর বসবাস করছেন তাকে জাগরিত করে মহাশক্তিমান হয়ে ওঠা মোটেই শক্ত কাজ নয়।

তোমার মধ্যে বিশ্বাসের সীমাহীন শক্তি থাকলেও, ছিল অশেষ বিনয়। তুমি আমাকেও ভক্তি করতে, শ্রদ্ধা করতে। তুমি বলেছিলে, "তুমি লেখক। আর তোমার স্ত্রী-হলেও, আমি ছোট অপিসের লোয়ার গ্রেড কেরানি। আমি তোমাকে এসব বিষয়ে নতুন কী বলবো? মহারাজদের সান্নিধ্যে যেসব কথা কানে আসে তাই তোমাকে ছুটে এসে জানাই। ওঁরা তো সাধারণ মানুষ নন, ওঁরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আশীর্বাদ লাভ করেছেন! ওঁরা সকলেই তো একদিন রামকৃষ্ণলোকে লীন হবেন।"

তোমার কথাগুলো, মাধুরী, আমি প্রায়ই কানে না-ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। তুমি কিন্তু তার জন্যে কখনও কোনো দুঃখ প্রকাশ করোনি। অথচ কী আশ্চর্য, আজ এই স্মরণীয় দিনে তুমি আমার কাছে না-থাকলেও তেমার কথাগুলো কত সহজে স্মরণ হচ্ছে, একটু একটু বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হচ্ছে। আমি দেখছি, কত ছোটখাট স্মৃতির টুকরোকে জড়ো করে রাখবার মতো জায়গা আমার মতো মানুষের মনের মধ্যে এখনও রয়েছে।

মাধুরী, প্রতি জন্মদিনে তুমি আমাকে একটা লাইন-টানা খাতা উপহার দিতে। তার প্রথম পাতায় কালীমন্দিরের লাল সিঁদুরের ছাপ থাকতো।

এই ব্যাপারে আমার কিছু উন্নাসিকতা থাকতো। আমি তোমার কাছেই আপত্তি জানিয়েছি, "আজ এই দেহটার হালখাতা। কিন্তু আমার সাহিত্যের বর্ষারম্ভ নয়!"

মাধুরী, লাল পাড় শাড়ির ফ্রেমে তোমাকে অসীম ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মনে হতো। ঐ যে রামকৃষ্ণ-গৃহিণী সারদা, যিনি শতরূপে ভক্ত-হৃদয় আলোকিত করে বসে আছেন, তাঁর থেকেও তোমাকে সেই সময়ে

ঐশ্বর্যশালিনী মনে হতো। আমি বলতাম, "যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখে তারা দোকানদার নয় যে প্রতিবছর লাইন দিয়ে কালীমন্দিরে ঢুকে খেরোর খাতায় ছাপ মারিয়ে নতুন হিসেব শুরু করতে হবে।"

তখন আমার মনে অকারণ দম্ভ ছিল। মনের গভীরে কোথায় যেন বিশ্বাস ছিল, যারা লেখে, যারা মানুষের সুখ দুঃখের সমুদ্রে ডুব দিয়ে সাহিত্যের মণিমুক্তো উদ্ধার করে আনে তাদের সঙ্গে দোকান-দারদের কোনো তুলনা করা যায় না। সেই দম্ভ অবশ্যই এখন আমার ভেঙে গিয়েছে, জীবনের জটিল পথে অনেক যাতায়াত করে ক্লান্ত দিবসের প্রান্তে আমি অবশেষে উপলব্ধি করেছি সব বৃত্তিই সমান, সকলেরই সমান মহত্ত্ব—অথবা নীচতা।

মাধুরী, তুমি আমারই মতো নিজের ছোট ছোট খেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে ভালবাসতে। সংসারযাত্রার শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও একজন জলজ্যান্ত লেখককে স্বহস্তে প্রতিপালন করে তুমি আনন্দ পেতে। আমি তো বন্ধু ইন্দ্রভূষণকে বলেওছিলাম, "কেউ শখ করে পাখি রাখে, কেউ কুকুর পোষে, আর মাধুরী আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে একজন গল্প লেখককেই স্বগৃহে পালন করছে।"

তুমি শুনলে হয়তো কিছুই বলতে না, শুধু একটু হাসতে। কিংবা মিষ্টি স্বরে বলতে, "যে যা করে তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। মানুষ মুরগি পালন করে লাভের আশায়। তোমার লেখাগুলো পড়ে যে স্পেশাল আনন্দ পাবো তার হিসেবটা কে রাখবে?"

ইন্দ্রভূষণ তোমারও অনেকদিনের পরিচিত। আমার বিয়ের আগেই, অফিসি কর্মের সূত্র ধরে সে তোমার সঙ্গে বোন পাতিয়ে বসে আছে। সে তোমাকে বোনের মতোই ভালবেসে এসেছে। আমাদের বিয়ের পর সে যে সরস পত্রাঘাত করেছিল তাতে আমাকে 'ভূতপূর্ব বন্ধু এবং বর্তমানে ভগ্নিপতি' বলে বর্ণনা করেছিল। আর তোমার সামনেই সে রসিকতা করেছিল, 'এই একটিমাত্র কেস যেখানে শালা বললে গালাগালি করা হয় না।'

এই ইন্দ্রভূষণ সেবার ওই প্রতিপালন কথাটা শুনে খুব বিরক্ত হয়েছিল। ইন্দ্রভূষণ মজুমদার (ওরফে আই-বি-এম) আমাকে বলেছিল, "শোনো ব্রাদার, ওই কুকুর-বেড়াল পোষাক তুলনাটা উইথড্র করো উইথ রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট। শব্দের সাধনায় নিযুক্ত সাহিত্যিক-দের মুখে ওটা মানায় না। আমি সিস্টার মাধুরীকেও বলেছি, আমার বোন বাগান করতে ভালবাসে, তাই এমন মানুষকে নির্বাচন করেছে।

তোমার সাহিত্যকানন নানা ফুলে ভরে উঠলেই তার আনন্দ।"

আমি ইন্দ্রভূষণের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, বেশ চকচকে কথা বলেছে সে। ইন্দ্রভূষণ তখন যোগ করেছে. ফুলবাগানের মালিক একাই সমস্ত ফুলের গন্ধ এবং সৌভাগ্য উপভোগ করে না। তোমার লেখা কত লোকে পড়বে, তারিফ করবে, বাগানের মালিকের তাতেই আনন্দ।"

ওই যে 'বাগান' কথাটা মন্দ নয়। আমি কী ছিলাম। অখ্যাত অফিসের হরিপদ কেরানি. সেই সঙ্গে একটু লেখালেখির ঝোঁক। আর ইন্দ্রভূষণ এবং তুমি—সেই একই অফিসের সহকর্মী।

এই অফিসগুলো এক বিচিত্র জায়গা। মানুষের চরম স্বার্থপরতা এবং চরম ভালবাসা দুই-ই এখানে বিকশিত হয়। নরকের পূতিগন্ধ এবং স্বর্গের সৌরভ যদি একসঙ্গে কোথাও খুঁজে পাবার ইচ্ছা থাকে তা হলে এই অফিসগুলোতেই তল্লাসী চালাতে হবে।

ইন্দ্রভূষণের সব মনে থাকে। ওর ভিতরে একজন গল্পলেখক উদাসীবাবার মতো অবস্থান করছে সেই ছোটবেলা থেকে। ইন্দ্রভূষণ নিজেই বলেছিল, "কী আশ্চর্য এই অফিসতীর্থ। একই অফিসে ম্যানেজার অনিলবন্ধু পালকে আর একজন সহকর্মী খুন করলো কয়েকটা ওভার-টাইমের টাকার হিসেবে মতান্তর নিয়ে। আবার সেই অফিসেই মাধুরীর মতো মেয়ে আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তার সমস্ত দায়িত্বভার তুলে নিলো যাতে তার প্রতিভার বিকাশ হয়, যাতে সে একজন সম্মানীয় লেখক হয়ে উঠতে পারে।"

মাধুরী, তোমার আমার সম্পর্কের শুরুটাও এই ভোরবেলায় আজ মনে পড়ছে। আমি নিজেই একবার লিখেছিলাম, 'শুরু নিয়েই এদেশে বেশী মাতামাতি, কারণ এখানে আদৌ কিছু শেষ হবে এমন গ্যারান্টি নেই।' তুমি এই লাইনটা পছন্দ করেছিলে এবং মুখে কিছু ঘোষণা না করলেও আমি বুঝেছিলাম, তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও তা করাবেই।

ব্যাপারটা কত সহজ মনে হয়েছিল তখন, মাধুরী। ইন্দ্রভূষণ ও আমি কলেজের বন্ধু। ইন্দ্রভূষণ মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে একটা অফিসে চাকরি ম্যানেজ করলো। ইন্দ্রভূষণ কী একটা হিসেব-যন্ত্র চালানোর বিদ্যে আগাম শিখে নিয়ে বেকারত্ব যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ নিজেই বের করে নিয়েছে। ওই ধরণের দুঃসাহসিকতা দেখানোর লোভ থাকলেও আমার নিজের ক্ষমতায় কুলোতো না। আমি চাকরি-সন্ধানের ঘূর্ণিপাকে দিশেহারা হয়ে যেতাম। কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছা

অন্যরকম। আমি বি এ পরীক্ষায় পাশটাশ করে গিয়েছি, ইন্দ্রভূষণ নিজেই যথাসময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

আমি তখন গল্প লেখার নেশায় বুঁদ। আমার দু-একটা লেখা রবিবারের সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হচ্ছে। ইন্দ্রভূষণ নিজে সেইসব পড়েছে এবং সে আমার ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট। আমাদের দু-একজন সহপাঠী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছে কিন্তু ইন্দ্রভূষণ বলে বসলো, "শেষ পর্যন্ত তুমিই এদের সকলকে মেরে বেরিয়ে যাবে।" গল্প-উপন্যাসে বিরাট নাম হয়ে যাবে আমার, এই হলো ইন্দ্রভূষণের ফোরকাস্ট। (ভবিষ্যদ্বাণী কথাটা ইচ্ছে করেই লিখলাম না।)

ইন্দ্রভূষণই আমাকে খবর দিয়েছে তার অফিসে লোক নেবে এবং তার জন্য পরীক্ষা হবে। আমি কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কথা শুনলেই অস্বস্তি বোধ করি। সহযোগিতাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, প্রতিযোগিতা নয় —আমি এক জায়গায় লিখে বসে আছি।

ইন্দ্রভূষণ আমার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তিনখানা রচনার বিষয়ে আগাম তৈরি হবার ইঙ্গিত দিয়েছে। আমি তৈরি হইনি। কিন্তু পরীক্ষার ঘরে গিয়ে দেখলাম আমি বোকামি করেছি, কারণ ইন্দ্রভূষণের পূর্বাভাষ ফলে গিয়েছে। আমি তখন যা মনে এসেছে পরীক্ষার খাতায় তা লিখে গিয়েছি—একজন লেখকের যা মনে আসে, একজন চাকরিপ্রার্থীর ভাবনাচিন্তা নয়।

"শাপে বর হয়েছে, আমার সাজেশনগুলি তুমি যে মুখস্থ কারোনি। তাই পরীক্ষার খাতায় একজন লেখকের ভাবনাচিন্তা প্রকাশিত হলো এবং সেই লেখা পড়ে পরীক্ষকের চক্ষু চড়কগাছ!" ইন্দ্রভূষণ আনন্দ প্রকাশ করেছে।

অর্থাৎ নির্বিঘ্নে আমার চাকরি হয়ে গেলো আমি নিয়মিত অফিসে আসি। কাজ করি। ইন্দ্রভূষণ আমার টেবিলের কাছেই কাজের ফাঁকে-ফাঁকে দু-জনে প্রাণভরে সাহিত্যসম্পর্কে নানা আলোচনা করি। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ইংরিজী এবং বাংলা দুটোতেই কম নম্বর পেলে কী হয়, ইন্দ্রভূষণের মতো রসিক সাহিত্য- এদেশে তেমন জন্মায় না। গপ্পো-উপন্যাস ওর খুব প্রিয়।

ইন্দ্রভূষণ জানে আমি রামকৃষ্ণমার্কা ইস্কুলে পড়াশোনো করেছি। ছোটবেলা থেকে আমরা বেদস্তোত্র মুখস্থ করেছি। স্তবকুসুমাঞ্জলি আমার কণ্ঠস্থ। তারপর ফাইভ-সিক্স ক্লাস থেকে পড়তে আরম্ভ করেছি

রামকৃষ্ণর বাণী, বিবেকানন্দর রচনা এবং তাঁর শিষ্যদের ব্যাখ্যা। আমি, যাকে বলে একটু মিশনমার্কা, তাই ছিলুম।

সেই সঙ্গে কথাসাহিত্যের নেশা। আমি অফিসের বাইরের অবশিষ্ট সময় সাহিত্যরচনায় বুঁদ হয়ে থাকি। আমার গল্প এবং উপন্যাস কাগজে বেরিয়েছে। সম্পাদকরা এখন আমায় চিঠি লেখেন। আমি প্রকাশনার তীর্থক্ষেত্র কলেজ স্ট্রীটের দোকানে গেলে চপকাটলেট না হোক চা-টা অন্তত পাই। সত্যিকথা বলতে কি, আমার দুঃখ করার মতো কিছুই যেন ছিল না। এবং সাবধানী ইন্দ্রভূষণ আমাকে বলেছে, "দুধ এবং তামাক দুই-ই একসঙ্গে খেয়ে যাও। ব্রাদার, অফিসে যত খুশি ফাঁকি দাও, কিন্তু ভুলেও চাকরিটা মেজাজের মাথায় ছেড়ো না। হাজরে দিয়ে খাতা লিখে নাও কিছুক্ষণ—তারপর বাড়ি ফিরে যতখুশি মা সরস্বতীর সেবা করো।"

এইভাবেই কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। তারপর একদিন মাধুরী, তুমি অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে বদলি হয়ে আমাদের অফিস ঘরে সশরীরে প্রতিষ্ঠিতা হলে। এর আগে তোমাকে কখনও দেখিনি। দেখবো কোথা থেকে? তুমি আগে ছিলে থিয়েটার রোড অফিসে, এখন এলে এই মিশন রোতে। আমি দেখলাম, চিরন্তন বাঙালী মেয়ের ধাঁচে বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি গৌরী না হলেও কৃষ্ণা নও, তোমার বিশাল দুটি চোখে দুটি পদ্মফুলের উপস্থিতি। তুমি বাঙালী মেয়েদের তুলনায় একটু দীর্ঘাঙ্গিনীই বটে, কিন্তু তোমার কোথাও প্রচারের প্রয়াস নেই। বিকশিত হয়েও কিছু ফুল লজ্জায় জড়সড় হয়ে থাকতে ভালবাসে। তোমার মতো মেয়েরাই এখনও বাঙালীদের বাঙালী করে রেখেছে—চারুহাসিনী কিন্তু স্বল্পভাষিণী। সুদেহিনী কিন্তু সজ্জায় পরিমিতিবোধ। এইসব মেয়েরই নাম হয় মাধুরী, মালতী, মমতা।

মাধুরী, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম পর্বটা বড় চাপা, আজকালকার প্রত্যাশা অনুযায়ী বড় প্রাণহীন। আজকের মানুষ ঘন ঘন ভালবাসার পরিচয় এবং প্রমাণ চায়—আমি তোমাকে ভালবাসি, এই অনুভূতি বুকের মধ্যে গোপনে চাবিবন্ধ করে কাজকর্ম করলে আজকাল প্রেম হয় না। প্রিয়জনের সান্নিধ্যসুখই আধুনিক প্রেম নয়। আজকাল প্রেম মানে শুধু প্রেমের প্রকাশ নয়, বেশ কিছুটা প্রতিযোগিতাও বটে। যারা আমার মতো সব প্রতিযোগিতাকে ভয় পায় প্রেমের বিলাসিতা তাদের জন্যে নয়। তাছাড়া আমি একটু সেকেলে! আমি এখনও রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দর যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করি তা প্রেমের পক্ষে উপযোগী কিনা তাও সন্দেহ।

ইন্দ্রভূষণ ও আমি অফিসে দিনের পর দিন যখন অসংখ্য অসংলগ্ন সাহিত্যচিন্তার বিনিময় করতাম তখন তুমি যে তা মন দিয়ে শুনতে তা আমার জানা ছিল না। বন্ধু ইন্দ্রভূষণ এবং আরও কয়েকজন তখন প্রায়ই আমার পিছনে লাগতো। বলতো, "তুমি ওই ঠাকুর-স্বামীজী ভজনা একটু কমাও—না হলে কোথাও কোনো বড় উপন্যাস ছাপা হবে না।"

আমি সাধ্যমতো আমার চিন্তাধারার পক্ষে মতামত দিতাম। ওরা রসিকতা করতো, "দেখো, শেষ পর্যন্ত উদ্বোধন পত্রিকাতেই হয়তো তোমার উপন্যাস প্রকাশিত হবে!" কঠিন রসিকতা, কারণ মিশনের ওই ধর্মীয় পত্রিকায় কোনোদিন গল্প-উপন্যাস ছাপা হয় না।

মাধুরী, এই সময় একদিন যখন বন্ধুরা আমার সদ্যপ্রকাশিত একটা লেখা নিয়ে রসরসিকতা করছে, আমার পিছনে লাগছে, তখন ইন্দ্রভূষণ বলেছে, "বেশী বিবেকানন্দর গন্ধ থাকলে মেয়েরা সে-লেখা পড়বে না, আর মেয়েরা যে-লেখা পড়ে না এদেশে তার অবস্থা কী জানো তো!"

মেয়েরা তেমন বিবেকানন্দভক্ত নয় শুনে আমার একটু চিন্তা হয়েছে। ইন্দ্রভূষণ তখন রসিকতা করছে, "মেয়েরা জানে, বেশী স্বামীজী-স্বামীজী করলে দেশের সেরা ছেলেগুলো সব সন্ন্যাসী হয়ে যাবে! নারীর সংসার তখন মরুভূমি!"

আমি জানতাম না মাধুরী, যে তুমিও ঠাকুর-স্বামীজীকে ভক্তি করো। তুমি সেদিন ভাগ্যে চুপি-চুপি আমাকে একটা কাগজের টুকরো পাঠিয়েছিলে। আমি হঠাৎ ফাইলের তলায় মুক্তোর মতো হাতের লেখা একটা স্লিপ পেয়ে অবাক! মাধুরী আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, "যে যাই বলুক, আপনি যা ভাবছেন তার থেকে সরবেন না।"

সেই প্রথম আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা অফিস ঘরেই আছে। মাধুরী, তোমার লজ্জা একটু বেশী ছিল। তুমি প্রকাশ্যে কিছু বলতে না, আড়ালে একান্তে আমাদের দেখা হওয়ার কথাই ওঠে না। তবু আমি যখন খুব কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছি, যখন সবাই আমাকে অন্য পথের সন্ধান দিচ্ছে, তখন তোমার হাতের লেখা কাগজের টুকরাগুলো আমাকে নিজের পথে প্রয়োজন হলে একলা চলার সাহস জুগিয়েছে।

মাধুরী, কী অবিশ্বাস্য সুন্দর ছিল সেই টুকরো কথার

মণিমুক্তোগুলো। সেগুলো কেন যে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখিনি! তখন ভয়ে ভয়ে সব লেখা ছিঁড়ে ফেলেছি। তোমারও বোধ হয় তাই ইচ্ছে ছিল। তুমি ধরা পড়ে লজ্জা পাও তা আমিও চাইনি। আমি নিজে এইসব টুকরো পেয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছি, তুমি নিশ্চয় আমার মুখে গভীর কৃতজ্ঞতার প্রসন্ন আলো দেখেছো। সায়েবরা যা 'থ্যাংক ইউ' শব্দের মধ্যে প্রকাশ করে তা আমরা কোনো কথা ব্যবহার না করেই কেবল মুখের ভাবে প্রকাশ করতে পারি। বিদেশীদের পক্ষে এটা শক্ত ব্যাপার।

আমি তখন ভেবেছি মাধুরী, তোমাকেও ছু-লাইন উত্তর দিই। কৃতজ্ঞার স্বীকৃতিকে পশ্চিমী সভ্যতায় মূল্য দেওয়া হয়—স্বামী বিবেকানন্দর পত্রাবলী পড়ে দেখো, ওই বিদ্যাটা তিনিও শতব্যস্ততার মধ্যেও সায়েবদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন। 'ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার' চিঠি লিখতে যে পারে না সে পশ্চিমী সভ্যতার কিছুই জানে না।

কিন্তু তোমাকে আর চিঠি লেখা হয়নি। আমি তখন জানি মেয়েদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হয়। অফিসটা কাজের জায়গা। এখানে একটি মেয়ে, যে করুণাবশে তোমাকে নিজের পথ থেকে ভ্রষ্ট না হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করা তোমার ভদ্রতা নয়। যে তোমাকে একটা স্লিপ পাঠিয়েছে দয়াপরবশ হয়ে তার প্রতি পত্রবোমা ছুঁড়ে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এইখানেই সব শেষ হতে পারতো। হলে মন্দ হতো না হয়তো। অন্তত, আজ এইভাবে পড়ার এই টেবিলে বসে নিজের জন্মদিনে পুরনোদিনের কথা এমনভাবে চিন্তা করতে হতো না, মাধুরী।

মাধুরী, নিজের জন্মদিনে মানুষ তো নিজের কথা ভাববেই। কিন্তু তুমি আমার সমস্ত ভাবনাচিন্তা হরণ করে বসে আছো।

এসব কিছুই প্রয়োজন হতো না, যদি-না সেবার ঐ বেলুড়মঠের উৎসবে ঐভাবে আমাদের দেখা হয়ে যেতো। ওখানে তো উৎসব লেগেই আছে। আমি গিয়েছি জন্মদিনের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, ওখানে যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি। আমার মতোই ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন ও দর্শন তোমাকে আকৃষ্ট করে। তুমি ধারণা করে বসে আছো ওই পথেই মানুষের শান্তি এবং সাফল্য আসবে। তুমি যে শব্দটা ব্যবহার করতে তা হলো মুক্তি—সহজে স্বর্গে পৌছে স্বর্গসুখ উপভোগের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি এদেশের দূরদর্শী

ধার্মিক মানুষদের কখনও ছিল না।

আমি ক্রমশ জেনেছি, মাধুরী আমার মতোই এখানে, দক্ষিণেশ্বরে গোলপার্কে ঘুরে বেড়ায়, সাধু-ভাষণেই তার তৃপ্তি. সাধুসঙ্গেই তার আনন্দ।

বেলুড় থেকে আমরা দু'জনে সেদিন একসঙ্গে কলকাতায় ফিরে এসেছি। পথে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে একটাও কথা বলিনি—বলাটা কেমন রুচিবিহীন মনে হয়েছে। কিন্তু সেদিন মাধুরীকে বিদায় দেবার পর হঠাৎ যেন মনে হয়েছে সে আরও কিছুক্ষণ সঙ্গে থেকে গেলে মন্দ হতো না।

না, আপনারা যা আন্দাজ করেছেন তাতে কোনো ভুল নেই। রাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দর পাদপদ্মে আশ্রিত হয়ে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করবার আগেই আমরা একদিন রেজিস্ট্রি আফিসে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি।

মাধুরীকে আমার প্রয়োজন ছিল। মাধুরী নিজে মুখ ফুটে প্রেমের প্রাথামিক কথাগুলো পুনরাবৃত্তি না-করলেও আমি বুঝেছি, ওর ধারণা আমার প্রতি ওর অনেক দায়িত্ব আছে. আমাকে নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছামতো অনেক কিছু করতে হবে।

বিয়ের রেজিস্ট্রির পরেই আমরা কোনো রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করিনি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি।

না, নববিবাহিতের নিবিড় ভালবাসার উত্তপ্ত কাহিনীগুলো সবার কাছে সবিস্তারে পেশ করবার জন্যে আমি এখন উন্মুখ হয়ে বসে নেই. মাধুরী। আমি জানি তুমি এইসব কখনোই পছন্দ করোনি। তুমি একবার রসিকতা করে বলেছিলে "আমাদের এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে যদি কখনও কোনো গল্প লেখো তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে!"

আমি রসিকতা করেছি ইন্দ্রভূষণকে উদ্ধৃতি দিয়ে। "আফিসের লোকরা আড়ালে বলছে, দিনের পর দিন কথামৃত, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ আলোচনা করতে-করতে, একটাও প্রেমের কথা উচ্চারণ না-করে এমন নিঃশব্দ হৃদয়বিনিময় কেমন করে হয়ে গেলো এটাই জানবার কথা!"

ইন্দ্রভূষণ সত্যিই আমাকে বলেছিল, "তোমাদের প্রেম ও পরিণয়ের ব্যাপারটা কোনো এক উপন্যাসে সুযোগ বুঝে ঢুকিয়ে দিও, ব্রাদার, বিস্তারিত ডায়ালগগুলো পড়ে লোকে শিখে নেবে প্রেমের বুলি না আওড়িয়েও কীভাবে প্রেম নিবেদন করা যায়।"

মাধুরী, তুমি বিশ্বাস করে বসেছিলে আমি তোমাকে কোনোদিন বিপদে ফেলবো না। অপরকে অতিক্রম না করে পরস্পরের সমস্ত লজ্জাকে আবরণ করাই তো স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য।

তখন একদিন আমি রসিকতা করেছিলাম, "যারা গল্প লেখক তারা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই প্রাণ ধরে অপচয় করতে পারে না। সব অভিজ্ঞতাই মেখে নিয়ে সুস্বাদু পুর হিসেবে মিশিয়ে দেয় কোনো গল্পে অথবা উপন্যাসের কাহিনীতে।

মাধুরী, তখন আমিই তোমাকে ছেলেমানুষী করে বলেছিলাম, "ঠিক আছে, আমাদের বিবহের সুবর্ণজয়ন্তীতে 'যুগলজীবন, বলে একটা উপন্যাস লিখে ফেলবো এবং সেখানে সব গোপন কথা ফাঁস করা যাবে।

মাধুরী, তখন তুমি এমনভাবে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলে! কেন যে তখন হাতের গোড়ায় একটা ক্যামেরা ছিল না—বিরক্ত প্রেয়সীর সেই রূপটা দেখবার জন্যে মনটা আজ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তুমি তখন একটাও কথা বলছো না, চিৎকার করছো না, প্রতিবাদ জানাচ্ছো না, অথচ তোমার চোখ মুখ আমাকে বলছে, পঞ্চাশ বছর পরেও এমন ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে জানলে তুমি কিছুতেই সেদিন মঠে যেতে না, গেলেও একই পাবলিকবাহনে সুদীর্ঘপথ পেরিয়ে আমার সঙ্গে শহরে ফিরতে না।

মাধুরী, তোমার হাসিমুখটি আমি এই জন্মদিনে বারবার দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। তুমি তো ইচ্ছে করলে আজকেও আবার হাসতে পারতে। আমাদের যুগলজীবনের সুবর্ণজয়ন্তী তো আসবে না। তাছাড়া আমি তো 'যুগলজীবন' বলে কোনো উপন্যাস লিখবোই না। না, আমি কিছুতেই আমাদের দাম্পত্যসম্পর্ক সম্বন্ধে বই লিখবো না, আমার সে-অধিকার চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মাধুরী, তুমি বিশ্বাস করো, লেখা সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মতামত, ধ্যানধারণা সব পরিবর্তন করে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে একান্ত আলোচনা না করেই আমি এই লেখক-জীবন সম্বন্ধে অনেকগুলো সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

মাধুরী, এক এক সময় ভাবি সাহিত্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে যাবো আমি। এই যে সমাজে মানব-মানবীর জটিল সম্পর্ক, এসব নিয়ে শত শত বছর ধরে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, নতুন কিছু বলার নেই কারুর। মানুষ এবার গল্প লেখা বন্ধ করে দিক। যা গল্প মজুত হয়ে আছে তার একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।

মাধুরী, কী সহজেই এই কথাগুলো আজকের এই দিনে আমি নিজের কাছে ঘোষণা করতে পারছি। আমি এখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। আমার লেখার কিছু ভক্ত পাঠক আছে। ট্রাম-বাসে আমাকে নিয়ে তুমুল উত্তেজনা না-থাকলেও আমার সম্পাদক এবং প্রকাশক আছেন, তাঁরা চান আমি যেন মাঝে-মাঝে লিখি। তার থেকেও বড় কথা, আমি এই লেখা থেকেই জীবনধারণ করতে পারি। প্রচণ্ড ধনীর মতো নয়, কিন্তু একজন গৃহস্থ বাঙালী ভদ্রলোক হিসেবে। কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয়, আমি কোনো কাগজের অফিসে গিয়ে প্রুফ সংশোধক হয়ে এখন থেকে জীবিকা নির্বাহ করবো। আমি আর এই গল্পলেখার নিদারুণ যন্ত্রণায় নিজের সর্বনাশ পরবো না।

ইন্দ্রভূষণকে আমি সেদিন এমন একটা ইঙ্গিত দিতেই সে হাঁ-হাঁ করে প্রতিবাদ করলো। সে ভেবেছে লেখক হিসবে আমি পাগলামি করতে চলেছি। "দেশের খুব ক্ষতি হবে," সে বলে উঠেছে।

আমি একটু নিষ্ঠুর হবার জন্যেই বলেছি, "তোমার একটু ক্ষতি হবে—আমার সব বইয়ের 'সৌজন্য' কপি তুমি আদায় করেছো। কিন্তু দেশের কোনো ক্ষতি হবে না।"

ইন্দ্রভূষণ বলেছে, "বেশ বাবা, বিনা পয়সার কমপ্লিমেন্টারি কপি সব ফিরিয়ে দিয়ে যাবো—গাঁটের কড়ি খরচা করেই তোমার প্রত্যেকটা বই এবার থেকে কিনবো, তবু তুমি ওইসব কুচিন্তা মাথায় এনো না। ওই তো বিমল মিত্তিরই বলেছেন, লেখক হবার অসুবিধা হলো, তাকে সারাজীবনই উত্তরোত্তর ভাল লিখে যেতে হবে।" লেখকের স্বেচ্ছাগৃহীত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের কথা বলছে ইন্দ্রভূষণ।

আমি ওইসব কথা সহজেই হজম করে নিতে পারতাম। কিন্তু ইন্দ্রভূষণ চান্স বুঝে তোমার কথা তুললো, মাধুরী। সাহিত্য-জীবনে যাই ঘটে থাক, তোমার কথা একবার নাকি আমার চিন্তা করা উচিত।

আমার সাহিত্যজীবনে তুমি মস্ত এক ভূমিকা নিয়েছো, সেকথা এই ইন্দ্রভূষণ এবং অফিসের লোকরা ভালভাবেই জানে। বিশেষ করে এই হতভাগা ইন্দ্রভূষণ। কারণ সে তোমার সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে বসেছিল। বিয়ের পরে ইন্দ্রভূষণ বলেছিল, "এ-জানলে কিছুতেই আমি মাধুরীকে বোন করতাম না। তুমি আমাকে কথায়-কথায় শালা বলবে আর আমি কোনো স্টেপ নিতে পারবো না, এর থেকে অস্বস্তিকর অবস্থা কী হতে পারে?"

ইন্দ্রভূষণ সেদিন বললো, "শোনো ব্রাদার, এখন যে পরিস্থিতিতেই থাকো, তুমি গল্প লেখা বন্ধ করলে মাধুরীর সমস্ত জীবনের স্বপ্নটাই বিফল হয়ে যায়।"

কথাটা সত্যি নয় বলতে পারলে কত সুবিধে হতো আমার। বুকের গুরুভার বোঝাটা হাল্কা হয়ে যেতো। কিন্তু মাধুরী, আমার অস্বীকার করবার উপায় নেই, তোমার স্বপ্নই আমাকে তিলে তিলে তৈরি করেছে।

তোমার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। সস্তা একটা শব্দ আজকাল বহুব্যবহারে মলিন হয়ে উঠেছে—সংগ্রাম। না, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি বলাটাই বোধহয় শোভন হবে। অশোভন শব্দ তুমি মোটেই তখন ভালবাসতে না, মাধুরী। একজন প্রচেষ্টারত প্রতিষ্ঠা-অভিলাষী গল্পলেখককে তুমি বিয়ে করলে, যে তোমার সহকর্মীও বটে। তারপর একদিন কোন বইতে পড়লে, লেখকের সাধনায় কোনো পার্টিশন শোভা পায় না। একজন লেখক হয় পুরোসময়ের লেখক অথবা আদৌ লেখক নয়, এমন একটা ছাপানো লাইন তোমাকে বেশ বিব্রত করে তুললো।

তুমি আমার সাহিত্য-যন্ত্রণার সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠলে। যে-লেখক তাঁর সব চরিত্রের রাজাধিরাজ, যাঁর অঙ্গুলিহেলনে তাঁর সৃষ্ট পুরুষ ও নারীদের ভাগ্য নির্নীত হয়, তিনি কেমন করে কলম বন্ধ রেখে পরবর্তী মুহূর্তে দাসের ভূমিকা গ্রহণ করবেন? লেখক শুধু একটা পেশা নয়, একটা মনোবৃত্তিও বটে, বিখ্যাত লেখক কুমারেশ মিত্র তোমাকে একবার বললেন, আর তুমিও তা বিশ্বাস করে নিলে। তুমি বললে, "ঠিকই বলছেন কুমারেশ মিত্র বাড়ির চাকরের মনোবৃত্তি নিয়ে চরিত্রদের পার্টটাইম ভাগ্যবিধাতা হওয়া যায় না, সৃষ্টির কোথাও গুরুতর খুঁত থেকে যেতে বাধ্য।"

কর্মজীবনে স্বাধীনতা ঘোষণার দুঃসাহস আমার প্রকার কখনই হতো না। তুমি কিন্তু আমাকে এবং সবাইকে অবাক করে দিলে। তুমি বললে, "তোমার কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা। ঠাকুর-স্বামীজির বাণীকে হৃদয়ে গ্রহণ করে তোমাকে নতুন কথাসাহিত্যের পথ-প্রদর্শন করতে হবে। তোমাকে এমন গল্প লিখতে হবে যা পড়ে মানুষ তার ক্ষুদ্রতার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে মহৎ উপলব্ধির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করবে।"

এসব কথার কী অর্থ তা আমার অজানা নয়। আমিও সেই

ছাত্রাবস্থা থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে বারবার বোঝবার চেষ্টা করেছি, বড় কঠিন সে কাজ।

মাধুরী, তুমি বলেছো, "কঠিন কাজ করার জন্যেই তো তোমার জন্ম। ঠাকুরের তাই তো ইচ্ছে। যে যত শক্ত অঙ্ক কষতে পারে মাস্টারমশায় তাকে আরও শক্ত অঙ্ক দিয়ে আনন্দ পান।"

মাধুরী, তুমি কিন্তু বুঝেছো, আমার কী কর্তব্য। তুমি সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমাকে চাকরি থেকে অকাল-পদত্যাগের অস্থিরতা দেখিয়েছো। দুঃসাহসিনী তুমি বলেছো, "আমি তো চাকরি করছি। তুমি সারাক্ষণ লেখা নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকো, গভীর চিন্তায় সমুদ্রে ডুব দাও, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখাও মানুষকে। সবাইকে বলো, 'কেউ পর নয়, জগৎ তোমার। তুমি নিশ্চয় একদিন মস্ত লেখক হবে।"

লেখকের জীবনের আর্থিক অনিশ্চয়তার ভয়াবহ গল্পগুলো যে মাধুরীর অজানা তা নয়। কোন কোন বাঙালী লেখক সারাক্ষণের স্রষ্টা হবার দুঃসাহসিকতা দেখাতে গিয়ে যথাসর্বস্বহারা হয়েছেন এবং আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে অধঃপতনের নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গিয়েছেন তা মাধুরী জেনেও বিন্দুমাত্র অস্থির নয়।

মাধুরী, তুমি জানো, সময়ের স্বাধীনতা থেকেও গল্প লেখকের যা বেশী প্রয়োজন তা হলো আত্মমর্যাদা। দাসের শৃঙ্খল খুলে নিলেই সে স্বাধীন, যে-কোনো সময়েই এই মুক্তি কেনা যেতে পারে, কিন্তু লেখকের আত্মমর্যাদা একবার হারালে তা আর ফিরে আসে না। ভিখিরিরা কখনও মহৎ লেখক হতে পারে না।

মাধুরী কিন্তু শ্রদ্ধেয় মহারাজদের ভাবনার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে। সে শুনেছে, "মানুষ তো মহাশক্তিরই অংশ, সুতরাং মর্যাদা হারাবার প্রশ্নই ওঠে না। পাঁকের মধ্যে শতবর্ষ পড়ে থাকলেও স্বর্ণবলয় তার স্বর্ণত্ব হারায় না। মর্যাদার গায়ে অনেক সময় কাদা জমে যায়, এই মাত্র। তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলেই সে আবার সোনার মতো ঝকঝকে।" এরপর কী একটা উপনিষদীয় স্তোত্র থেকে পাঠ করেছিল মাধুরী। ভগবান ওকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস দিয়েছেন। ওইটাই ওর শক্তির উৎস।

মাধুরী, কত আশা নিয়ে তুমি আমাকে দশটা-পাঁচটার শিকলে

বাঁধা চাকরির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এনে সীমাহীন সাধনার মুক্তাঙ্গনে সারাক্ষণের জন্যে বসিয়ে দিলে। আমার মর্যাদা ক্রয় করতে গিয়ে তখন কী তোমার পরিশ্রম। সেই সকালে উঠে রান্না করা সংসারের সব কিছু পরিচ্ছন্ন করে রাখা। তারপর আমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে কলকাতায় এই জন-অরণ্য ঠেলে প্রতিদিন নাটার সময়ে অফিসে যাওয়া। ভর্তা এবং স্ত্রীর যৌথ দায়িত্বই তুমি হাসিমুখে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলে শুধু এই আশায় যে একদিন তোমার স্বামী বাংলার পাঠক ও রসিক সমাজের স্বীকৃতি পেয়ে খ্যাতনামা হয়ে উঠবে। তোমার স্বামীর লেখা ঘরে-ঘরে আদৃত হবে এবং সেদিন তোমার মনে আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

নিজের জীবনের সর্বস্ব বন্ধক রেখে তুমি মাত্র একখানা লটারির টিকিট কিনছো, তোমার কোন বান্ধবী তোমাকে বলেছিল। তুমি একবারও কর্ণপাত করোনি। মিশনের কোন স্বামীজী তোমাকে নাকি একবার বলেছিলেন, যে যেদিকে বাড়তে চায় সেদিকেই তাকে বাড়তে দিতে পারলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। আর তুমিও ওই ধারে বসে আছো, মানুষের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বরের খাস তালুক রয়েছে, সুতরাং খারাপ হবার কথা উঠবে কেন? ঈশ্বরের রাজত্বে কেবলই আরোহণ, অধঃপতনের সুযোগই নেই সেখানে।

মাধুরী, তোমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আমি কয়েকবছর একাগ্র সাহিত্য-সাধনায় বেশ কিছুটা সফল হয়েছি। বিপুল স্বর্ণপ্রসূতা লাভ না করলেও আমি প্রতিষ্ঠার অমৃত আস্বাদন করেছি। পাঠক আমাকে প্রীতির প্রশ্রয় দিয়েছে, আমার উপন্যাস ট্রামে-বাসে ব্যস্ত মানুষের হাতেও দেখা যায়, আমার কাছে অনেক চিঠি আসে, আমাকে নিয়ে আমার পুরনো অফিসেও আলোচনা হয়। এই আলোচনায় আমার বন্ধু ইন্দ্রভূষণ ভীষণ গর্ব বোধ করে। আর মাধুরী, তুমি পরম আনন্দে আমার সাফল্যের অমৃতসুধা উপভোগ করো। তোমার বেপরোয়া বিনিয়োগ একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

ইন্দ্রভূষণটা তখনও রসিকতা ত্যাগ করেনি। আমার এক একটা বই বেরুলেই বাড়িতে এসে হৈ-হৈ বাধাতো। বলতো, "আজ যে-ট্যাক্সিতে এলাম, তাতে লেখা অমুক ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা আছে। ব্রাদার, তোমার প্রতিটা বইয়ের টাইটেলপাতায় ছাপানো উচিত: 'হাইপথিকেটেড টু মাধুরী চ্যাটার্জি।"

মাধুরী, তুমি মৃদু বকুনি দিয়েছো, "ইন্দ্রদা, তুমি লেকচার বন্ধ করে,

চা খেলে আগে।”

ইন্দ্রভূষণ রসিকতা করেছে, “তুমি বলছো, সমস্ত আমগাছটাই যখন বন্ধক দেওয়া, তখন প্রত্যেক আমের ওপর ‘হাইপথিকেশন’ ছাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই! এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখতে হবে!”

ইন্দ্রভূষণ চা খেয়ে বলেছে, “মাধুরী, তোমার সাহসের কথা ভাবলে তোমাকে ‘হরেন মুখুজ্যে সাহসিকতা অ্যাওয়ার্ড’ দিতে ইচ্ছে হয়। এই লেখককে নিয়ে তুমি যা খেললে, তার নাম ফাটকা। যদি চাকরিও গেলো অথচ লেখক লাইনে কিছু হলো না, এমন হতো?”

অবশ্যই সেরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে এই বাংলায়। সেরকম হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মাধুরীর সেই একই কথা, “ঠাকুর, স্বামীজী এবং শ্রীমায়ের ছবি রেখে দিয়েছি ওঁর লেখার টেবিলে, ওঁরা সারাক্ষণ ওঁর লেখার ওপর নজর রেখেছেন, খারাপ হলেই হলো?”

মাধুরী, তোমার মনে আমাকে ঘিরে আরও কত প্রত্যাশা ছিল। স্বপ্ন কথাটাই বোধহয় আরও ভাল। তুমি ভেবেছিলে, আমি যদি আমার সাধনা চালিয়ে যাই একদিন দেশের লোকেরা আমার ওপর তাদের সমস্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ঢেলে দেবে।

মাধুরী, এখন তুমি এই বাড়িতে নেই। এমনই জন্মদিনে আমার পাঠকরা আমার বাড়িতে ছুটে আসবে, আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে শতজীবি হবার প্রার্থনা জানাবে, এমন কথা তোমার মনে ছিল এক সময়। তুমি আমার ওপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে বসেছিলে।

না, সেরকম হয়নি, মাধুরী। ওই ‘আনন্দসঙ্গিনী’ বইটা কেন যে আমি গর্ভে ধারণ করলাম!

মাধুরী, আজ তুমিও নেই এখানে। পাঠক-পাঠিকাদের ভিড়ও নেই এই বাড়িতে। লেখক আমি নিজেই রাজা সেজে জন্মদিনের সমস্ত গৌরব উপভোগ করছি। আনন্দ বড্ড বেয়াড়া জিনিস, মাধুরী। সকলের সঙ্গে ভাগ করে না-নিলে কিছুতেই সুখ হয় না। আজ আমার জন্মদিনের গৌরব আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। আমি চুপচাপ বাড়িতে বসে রয়েছি, ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তার কথা ভাবছি যে আমাকে সৃষ্টির গৌরবে উজ্জ্বল করে তুলবার পুতুলখেলায় নেমেছিল। আর তার প্রতিদানে আমি কী করে ফেললাম!

কী করলাম? কেন করলাম? হে পূজ্যপাদ ঈশ্বরপ্রেরিত নারী ও পুরুষবৃন্দ! আপনারা আমাকে আমার জন্মদিনে আমার সমস্ত

সাধনার গৌরব উপভোগ করতে দিন, অন্তত একদিনের জন্য। আজ আমার আসামীর ভূমিকায় জবানবন্দি দেওয়ার মানসিকতা নেই।

আমি এখন বরং মাধুরী যা-যা করতে ভালবাসে তা স্মরণ করি, নাই বা থাকলো সে এই বাড়িতে।

মাধুরী, তুমি আমাকে বলেছিলে, "তুমি গভীর চিন্তার সাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তার সন্ধান করবে। জন্মদিনে জগজ্জননীর আশীর্বাদধন্য খাতায় কিছু চিন্তার কথা লিখবে। সেসব চিন্তা নিয়ে সস্তা হৈ চৈ না হোক, তাতে যেন মানুষের মর্যাদাবৃদ্ধি পায়। মানুষ যেন মুক্তির স্বাদ লাভ করে।"

মাধুরী, তবে তাই হোক। যদিও আমার আর উপন্যাস লেখার উৎসাহ নেই, তবু আমি কিছু চিন্তা করি, কিছু ভেবে দেখি। এই সময় ওই 'আনন্দসঙ্গিনী' উপন্যাসটার কথা আমি একদম ভুলে যেতে চাই।

মাধুরী, তোমারই দেওয়া ছোট্ট একটা উপমার কথা মনে হচ্ছে। তুমি একবার ইন্দ্রভূষণ ও আমার বাক্যবিনিময় শুনতে-শুনতে বলেছিলে, "লেখকরা হলেন গাছের মতো। একমাত্র ফলেতেই তাঁদের পরিচয়।"

ইন্দ্রভূষণ তারিফ করেছিল। বলেছিল, "নিজের বউ বলে কথাটা অবহেলা কোরো না, ব্রাদার। নিজের নোট বইতে লিখে রাখো।"

আমি বলেছিলাম, "গাছের তুলনাটা মন্দ নয়, কিন্তু এ-এক অদ্ভুত গাছ—একই সঙ্গে বিভিন্ন শাখায় আম ও আমড়ার ফলন হতে পারে।"

তুমি ও তোমার পাতানো ভাই দু'জনেই আমার সমালোচনা করেছিলে। বলেছিলে, ফলবতী বৃক্ষের ধর্ম কখনও পাল্টায় না।

আমি আজ কলম ধরে, অনেক অভিজ্ঞতার স্রোতে ভেসে বেড়িয়ে, ভাবছি মানুষের জীবনকে টলস্টয় সঠিকভাবেই একবার নদীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কোনো মানুষেরই একটা মার্কামারা রূপ নেই—কখনও বন্যা, কখনও খরা, কখনও উৎসমুখে দুর্দমনীয় গতি, আবার কখনও মোহনায় বিপুল বিস্তৃতির মধুর প্রশান্তি। কখনও জোয়ার, কখনও ভাটা—কত বিচিত্র গতিপ্রবাহ একই নদীর।

আমি আজ লিখলাম, অন্য মানুষের মতন প্রত্যেক লেখকও একটি নদী। একটি দিনের একটি মুহূর্তে তার একটি রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েই তাকে চেনা যায় না। নানা ঋতুতে, নানা সময়ে তার নানা

অবস্থা—কখনও দু'চোখ দিয়ে সবিস্ময়ে দেখবার, কখনও ভয় পাবার, আবার কখনও করুণা করবার। আমি ভাবছিলাম, আমাকে নিয়ে কেউ কখনও যদি কিছু বিস্তারিতভাবে লেখবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে যদি সবদিকে খোঁজ-খবর নেয়—যেমন মাধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার সম্পর্কে ইন্দ্রভূষণের মতামত—তা হলে একটা মানুষের মতো না-দেখিয়ে আমাকেও একটা নদীর মতনই দেখাতে হবে। উৎস থেকে সাগরে মিলন পর্যন্ত সংখ্যাহীন পরিবর্তনের কথা লিপিবদ্ধ হবে।

মাধুরী, তুমি যে নদীর এই মানচিত্র আঁকায় সাহায্য করবে না, এটা আমার পক্ষে খুব ভাল কথা।

আমি নিজের চেয়ারে বসে (এই চেয়ারটা মাধুরী নিজেই নকশা এঁকে মিস্ত্রি ডেকে তৈরি করিয়ে দিয়েছিল, সিংহাসনের গাম্ভীর্য আছে এই আসনের।) আর কয়েকটা কথা লিখবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এমন সময় দরজায় বেলটা বেশ জোরেই বেজে উঠলো।

এমনভাবে এ-বাড়ির বেল এখন একজনেই বাজায়। তার নাম ইন্দ্রভূষণ—সে যে এখনও বার্ধক্যে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে এখনও যে যথেষ্ট ছেলেমানুষী রয়েছে তা এই বেল বাজানো শুনেই বোঝা যায়।

হৈ হৈ করে ইন্দ্রভূষণ আমার ঘরে ঢুকে পড়লো। "আরও অনেক আগে অফিস থেকে কাট মেরে বেরিয়ে আসবো ভেবেছিলাম, ব্রাদার। কিন্তু হেড অফিসের সেই হারামজাদা নরহরি ব্যানার্জি এসে গেলো। অডিটের লোক, চটাবার উপায় নেই। দেরি করিয়ে । তারপর ভাবলাম, কলেজ স্ট্রীট থেকে একখানা জন্মদিনের উপহার কিনে নিই, গঙ্গা জলেই গঙ্গাপুজো সারা যাবে। ওমা! সেখানেও মস্ত বিপত্তি, তোমার সঙ্গে অনেক কথা রয়েছে ওই সাবজেক্টে। যথাসময়ে বলবো। বইপাড়ায় সরেজমিনে সব তদন্ত হাফ-অ্যান-আওয়ার লেগে গেলো। তারপর সমস্ত কলেজ স্ট্রীটে । যাই হোক অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে এখানে হাজির

হয়েছি। এই নাও একখানা কবিতার বই, এই নাও তোমার ফেভারিট ছানার মুড়কি, এই নাও এক প্যাকেট চন্দন ধূপ। এই সব উপভোগ করে, মিনিমাম ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স্ ধরে পরমানন্দে বাঙালী পাঠকদের গুষ্টির পিণ্ডি চটকাও!"

গুষ্টির পিণ্ডি চটকাবার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। আমি ইন্দ্রভূষণকে আজই বলবো, গল্প-উপন্যাস যদি আমি আর না লিখি কেমন হয়? প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই ইনিংস ডিক্লেয়ার করবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু এখনই এই মুহূর্তে ওইসব কথা তোলা ঠিক হবে না। ইন্দ্রভূষণ নিজেই রান্নাঘর থেকে কাঁচের প্লেট সংগ্রহ করতে গেলো। তারপর গুণে গুণে ছানার মুড়কির নিখুঁত দ্বিভাজন শুরু করলো।

আমি জানি, এইসব আপাতত ছেলেমানুষীর অভিনয়ের পিছনে ইন্দ্রভূষণ নিজেও এই মুহূর্তে মাধুরীর অনুপস্থিতি অনুভব করছে। সে শুধু বন্ধুর স্ত্রী নয়, সে তারও পাতানো বোন। ঘরে পাতানো দই এবং বাইরে পাতানো বোন দুটোই খুবই উপাদেয়, ইন্দ্রভূষণ নিজেই একবার রসিকতা করেছিল। কিন্তু আমি জানি ইন্দ্রভূষণ খুব সাবধানী। আমি যখন চায়ের জল গরম করবার জন্যে রান্নাঘরে যাবো তখন সে নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে মাধুরীর ছবিটা দেখবে, কিন্তু আমাকে কিছুই বুঝতে দেবে না। মাধুরী বলে একটি মেয়েকে আমরা দুজনেই যে একসঙ্গে জানতাম তা-ও ওর কথাবার্তায় ধরা পড়বে না। হয়তো অসীম দয়ার বশবর্তী হয়েই ইন্দ্রভূষণ আমাকে এই সুবিধেটুকু দেয়। আমাকে কষ্ট দিতে চায় না। চন্দন ধূপটা যে মাধুরীরই প্রিয় সে-কথা ইন্দ্রভূষণ একবারও উল্লেখ করলো না।

আমি এই ইন্দ্রভূষণ চরিত্রটার কথা ভাবি। ভীষণ ভালবাসা ওর ওপর। আবার আজকাল ওর সম্বন্ধে আমার ভীষণ রাগ। যদি ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে সেবার ওই রিকশা চড়ে আমি ওয়েলেসলির রাস্তা ধরে না আসতাম, তা হলে আমার জীবনে অনেক কাণ্ড ঘটতো না। ওই যে 'আনন্দসঙ্গিনী' উপন্যাসটা আমার না-হয় না-লেখাই হতো, সম্পাদক হরিহর দে না-হয় প্রতিশ্রুতি খেলাপের দায়ে আমাকে চিরদিনের জন্যে ব্ল্যাকলিস্ট করতেন, কিন্তু সে অনেক ভাল হতো।

একটা প্লেটে ছানার মুড়কির অর্ধেক আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রভূষণ। "দোকানদারকে আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়েছিলাম,

ওয়ান অফ বেঙ্গলস্ গ্রেটেস্ট লিভিং নভেলিস্ট জন্মদিনে তোমাদের এই ছানার মুড়কি টেস্ট করবেন।"

আমি হাসলাম ইন্দ্রভূষণের কথায়। গ্রেটেস্ট আমি অবশ্যই নই। একজন প্রাক্তন নভেলিস্ট বলে নিজেকে ঘোষণা করবার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি আমি। লিভিং, এইটাই একমাত্র এই লেখকের শেষ কোয়ালিফিকেশন।

"একজন লিভিং লেখক ইজ ইকুয়াল টু দশজন ডেড লেখক, প্রকাশক নৃপেন সামন্ত তোমাকে একবার বলেছিল না! নতুন বই সারাক্ষণ প্রকাশিত হবার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেকচার দিচ্ছিল।" প্রকাশকদের ধারণা, সারাক্ষণ শ্রীচরণে ধরনা না দিলে পাঠকের মনে থাকবে না লেখকের কথা। নৃপেন সামন্তর কথা শুনলে, লেখকের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে মৃত্যুর পরেও অন্তত এক দশক ধরে প্রতি বছর একখানা নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হয়। "অপ্রকাশিত পত্রাবলীর ফ্রি পাবলিসিটি না-থাকলে রবি ঠাকুরের বইয়ের বিক্রি কোথায় গোঁত খেতো দেখতেন," নৃপেন সামন্ত বলেছিলেন এবং ইন্দ্রভূষণ এখনও তা মনে রেখেছে।

মাধুরী একবার মজা পেয়ে বলেছিল, "ইন্দ্রদাকে ক্যারাক্টার খাড়া করে তোমার একটা বই লেখা উচিত।"

রসিক ইন্দ্রভূষণ বলেছিল, "সম্পাদক হরিহর দে হয়তো টোপ গিলবেন। ম্যাগাজিনে ছাপাও হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রন্থাকারে টোটাল এগারো কপির বেশি বিক্রি হবে না—আমাদের আপিস লাইব্রেরিতে ছ'খানা, আমার শ্বশুর বাড়ির তিন শাখায় তিনখানা, আর মাধুরী দাদার প্রতি ভালবাসায় স্পেশাল দু'খানা, এছাড়া আর কোনো কপি সেল হবে না।"

ইন্দ্রভূষণ সেবারেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, "মনে রেখো ব্রাদার, আজকালকার মানুষ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, নিজেদের ঘর-সংসার সম্পর্কে তাদের অরুচি ধরে গিয়েছে, তারা এখন মুখ বদলাতে চায়—আমার মতো ঘরোয়া ক্যারাক্টারে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে তারা এখন ঘর-ভাঙিয়েদের কথা পড়বার জন্যে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।"

আমি সাহিত্যিক কুমারেশ মিত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। "ইট ইজ নট দ্য ম্যাটার ছাট ম্যাটারস্। ইট ইজ দ্য ম্যানার অফ পুটিং ইট। মালটা কীভাবে পরিবেশন করছো সেইটাই সাহিত্য।"

ইন্দ্রভূষণের তাৎক্ষণিক উত্তর মাধুরী এবং আমার দু'জনেরই ভাল লেগেছিল। "তরুণ প্রতিযোগী লেখকদের বিপথে পরিচালিত করবার জন্যে বড় বড় লেখকরা খুবই আগ্রহী। ওঁদের কথার টোপ গিলেছে তো মরেছো। তুমি দেখলে না, তরুণ লেখক মানব রায়ের কী হলো একখানা বই নিজের বুদ্ধিমতো লিখেছিল, লোকে নিয়েও ছিল তারপর মানব রায় ঔপন্যাসিক-কাম-রেভলিউশনারি হবার স্বপ্ন দেখলেন —সমস্ত লেখা গোল্লায় গেলো।"

"ইন্দ্রভূষণ, তোমার মনে রাখা উচিত, বিপ্লবের অনেক নতুন আইডিয়া উপন্যাস থেকেই আহরিত হয়েছে। একটু ইতিহাসের খোঁজ-খবর নিলেই জানতে পারবে।"

ইন্দ্রভূষণ সেদিন আমাদের দু'জনকে খুব মজা দিয়েছিল "ন্যায্য দরে একটু কেরোসিন সন্ধানে বেরিয়েছি, না-হলে তোমার সঙ্গে তর্কে নেমে যেতাম। দোকানের আমসন্দেশে আমটা প্রধান, না সন্দেশটা প্রধান? লোকে সন্দেশ খাবার জন্যেই আমসন্দেশ কিনেছে, তাতে যদি বাড়তি একটু আমের আকার, রঙ এবং গন্ধ থাকে তাহলে খদ্দের খুশী। কিন্তু যদি দেখো টোকো সবুজ আম পেয়েছো, সন্দেশ যেখানে নেই বললেই চলে, তা হলে তুমিও দাম ফেরত চাইবে।"

ইন্দ্রভূষণের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। "এই তো সেদিন রাস্তায় তুমি আর আমি যে স্ট্রবেরি আইসক্রিম খেলাম। ওতে স্ট্রবেরির রং আর গন্ধটুকু ছাড়া আর সবই তো আইসক্রিম। উল্টোদিকে তুমি যখন স্ট্রবেরি কিনতে যাবে তখন তোমাকে আইসক্রিম দিলে তুমি মোটেই মজবে না। যখন যা তখন তা, বুঝেছো ব্রাদার!" হেসেছিল ইন্দ্রভূষণ।

ইন্দ্রভূষণের কথাটা আমি ডায়েরিতে লিখে নিয়েছিলাম, মানুষ যখন যা খুঁজছে তখন তা না পেলেই বিরক্ত হয়। অন্য জিনিস মহামূল্যবান হলেও সে তখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমের সময় আম, সন্দেশের সময় সন্দেশ।

"অর্থাৎ উপন্যাসের ছদ্মবেশে দর্শন এবং দর্শনের ছদ্মবেশে উপন্যাস দু-ই অচল।"

"খুব প্রাণ আইঢাই করলে একটু সুগন্ধী মশলার মতো দর্শন ছড়িয়ে দিতে পারো উপন্যাসের ওপর। তার বেশী নয়।"

ইন্দ্রভূষণ জানে, ওর কিছু কিছু বক্তব্য আমি অনেকদিন থেকে নোটবুকে লিখে রাখি। সে হেসে বলেছিল, "পণ্ডশ্রম করছো,

ব্রাদার। এসব কোনোদিন তোমার কোনো কাজে লাগবে না। বরং লুকিয়ে একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে জগার চায়ের দোকানে পিছনের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকোগে. নতুন নতুন ডায়ালগ এবং আধুনিক দর্শনে তোমার সঞ্চয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। মানুষ আজকাল বড্ড ছটফটে হয়ে উঠেছে—তারা এখন আর ধৈর্য ধরে কিছু পড়তে চায় না।"

ছানার মুড়কি খাওয়া শেষ হয়েছে। আমি নিজের হাতে চা বানিয়েছি পুরনো বন্ধুকে আপ্যায়নের জন্যে। ইন্দ্রভূষণ বলেছে, "তোমার জীবনী যখন কেউ লিখবে তখন এই ছানার মুড়কি এবং চায়ের ব্যাপারটা ইনক্লুড করিয়ে দিতে হবে। শুধু বড় বড় দার্শনিক কথায় পাতা ভরালে চলবে না।"

আমি ইন্দ্রভূষণকে বলেছি, "জেসেফ এপস্টাইন একবার আমেরিকান লেখক জন ডস প্যাসোসের জীবনী লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তড়িৎগতিতে সাহিত্যিকের উত্তর এলো, ওই কাজটি করবেন না। গল্প লেখকের জীবনী লেখা অসম্ভব ব্যাপার। নিজের জীবনটাই তিনি বারে বারে তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, ফলে জীবনসায়াহ্নে জীবনী-লেখার মতো কোনো অব্যবহৃত উপাদানই তাঁর ঝুলিতে পড়ে থাকে না!"

ইন্দ্রভূষণ বললো, "তুমি তো এখনো এই ছানার মুড়কির ব্যাপারটা কোনো বইতে ঢোকাওনি।"

মাধুরী আমাকে বারণ করতো, "গল্প-উপন্যাসে বেশী খাওয়ার বর্ণনা ঢোকাবে না। লোকে ভাববে লেখক পেটুক।"

ইন্দ্রভূষণ ফাঁস করে দিলো, "মাধুরীকে আমি বলেছিলাম, লেখকের সুবর্ণজয়ন্তীতে সোনা দিয়ে ওজন না-করে ছানার মুড়কি দিয়ে ওজন করাবো এবং পাঠকদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে।"

একটু পরেই ইন্দ্রভূষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "তোমাকে এখন আমার সঙ্গে বেরোতেই হবে। আমি আবার যাবো কলেজ স্ট্রীট। তুমি আজকাল কিছুই দেখো না ব্রাদার। বই লিখে চরিত্রগুলোর জন্ম দিয়েই তোমার যেন দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। চরিত্রগুলো কেমন রইলো, তাদের কী অবস্থা হলো সে-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখো না।"

আমাদের ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি লাগিয়ে অনেকদি

পরে আজ আবার জন্মদিনে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পথে বেরোলাম।

ইন্দ্রভূষণ বললো, "মনে পড়ে, সেই কলেজ লাইফে আমরা দু'জন কী রকম টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম?"

অবশ্যই মনে পড়ে, সুদূর এক স্বপ্নের মতো। তারপর অফিসে ঢুকে বিয়ের আগেও দু'জনে অনেক ঘুরেছি আমরা। ইন্দ্রভূষণ শুধু পবিত্রস্থানে যেতে উৎসাহ প্রকাশ করতো না। বলতো, "মন্দিরে মঠে মিশনে একলা একলা যাও ভাই। ঈশ্বর লাজুক, বেশি ভীড় থাকলে ভক্তের কাছে আসেন না।"

ইন্দ্রভূষণ বললো, "কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে রেলিঙের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মেজাজটা ভীষণ গরম হয়ে উঠলো। দেখলাম ওখানে তোমার বই বিক্রি হচ্ছে। প্রথমে ভাবলাম, ভাল কথাই কুমারেশ মিত্তির একবার তোমায় বলেছিলেন, কলেজ স্ট্রীটের রেলিঙে না-ওঠা পর্যন্ত কোনো লেখক জাতে ওঠেন না।"

ইন্দ্রভূষণ বুঝছে না, নিজের বইগুলো সম্বন্ধে আমি ইদানীং উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। ওসব যেন সাবালক ছেলেমেয়ে, ওদের নিজেদের ঘরসংসার হয়েছে, আমার কিছু করবার নেই। আমি বরং সেই সময়টুকু যদি মাধুরীর কথা ভাবি, কেমন করে আমাদের পরিচয় হয়েছিল তা স্মরণ করি, কেমন করে আমি প্রতিষ্ঠিত লেখক হলাম তা চিন্তা করি তা হলে অনেক ভাল হয়।

ইন্দ্রভূষণ বলছে, "আমাকে উপহার দেওয়া তোমার একখানা বই কে যেন চুপিচুপি আলমারি থেকে গায়েব করে দিয়েছে। ভাবলাম, একটু কম দামে কলেজ স্ট্রীটের রেলিঙ থেকে ম্যানেজ করে নিই। ওমা, সেই আশাতে হাত বাড়িয়েই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। জন্মদিনে না হলে তোমাকে অবশ্য আমি বিরক্ত করতাম না। জন্মদিনে কেউ তোমার ক্ষতি করছে ভাবতে রক্ত গরম হয়ে উঠলো।"

ইন্দ্রভূষণ খুব বিরক্ত হয়েছে। অত কষ্ট করে আমি যে-বই লিখেছি, তা এখন মরচেপড়া রেলিঙের ওপর কাটা ছাগলের মতো ঝুলবে, এই দৃশ্য সে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

ইন্দ্রভূষণ বলছে, "তুমি তো কোনো ব্যাপারই কানে নাও না। তাই তোমাকে নিজের চোখে দেখাবো। দেখলে নিশ্চয় তোমার ভীষণ কষ্ট হবে।"

কী কষ্ট হবে? কেন কষ্ট হবে? তেমন কোনো ইঙ্গিতই দিচ্ছে

না আমাকে ইন্দ্রভূষণ।

আমি যে আজকাল আমার অতীত সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন তা তো ইন্দ্রভূষণের অজানা নয়।

ইন্দ্রভূষণ আজ স্পেশাল বাবুগিরি করে বসলো। একটা চলমান রিকশওয়ালাকে থামিয়ে বইপাড়ায় যাবার জন্যে উঠে বসলো। আমি আজকাল এই রিকশকে অপছন্দ করি।

ঘণ্টা বাজিয়ে, পথের ট্রাফিক সামলে রিকশ বেশ দ্রুত বেগেই লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর ইন্দ্রভূষণ বলছে, "এই রিকশ একসময় তোমার খুব প্রিয় ছিল, ব্রাদার। পথে চলমান হয়েও আকাশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এমন চমৎকার পাবলিক যান এখন ত্রিভুবনে নেই। তুমিই তো লিখেছো, এদেশে প্রয়োজন ছিল হুডখোলা মোটর গাড়ি, কিন্তু মেমসায়েবদের সোনালী চুলের কথা ভেবে ওই ধরনের গাড়ি বানানোই বন্ধ হয়ে গেলো।"

ইন্দ্রভূষণ আমাকে বলছে, "প্রকাশকদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রাখা উচিত। তোমার জনপ্রিয় বইগুলোর কী অবস্থা হচ্ছে তা নিজে মাঝে-মাঝে খবরাখবর নিলে অনেক ভাল হয়।"

আমি এ বিষয়ে নতুন মনোবৃত্তি অবলম্বন করেছি। নিজের বইগুলো প্রকাশকের সামনে পাহারা দেবার জন্যে কতজন লেখকই বা এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছেন? আসলে নিজের পাহারাদারি যখন শেষ হবে তখনই বোঝা যাবে লেখার শক্তি। মরার পরেই প্রত্যেক লেখকের দ্বিতীয় জন্ম হয়, সমস্ত অর্থেই এঁরা দ্বিজ।

চলমান রিকশয় বসে ইন্দ্রভূষণ এখন প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করছে। সে বলছে, "এই কঠিন পৃথিবীতে নিরন্তর নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। তুমি নিজেই তো 'জীবনসংগ্রাম' উপন্যাসে এই মেসেজ জাতিকে দিয়েছো। তুমি অবশ্য বিনয় করে তখন বলেছিলে, ভাবনার মূল সূত্রটি তুমি পেয়েছিলে স্বামী বিবেকানন্দর পত্রাবলী থেকে।"

কোথাও কিছু স্বার্থের সংঘাত থাকলেও আমি সেখানে দুম করে সশরীরে হাজির হতে চাই না। ইন্দ্রভূষণকে বললাম, "যদি কিছু গোলমাল থাকে প্রকাশককে একটা চিঠি লিখে দেওয়া যেতো।"

ইন্দ্রভূষণ সবসময় আমার পুরনো লাইনগুলো মনে রেখেছে। সে

বললো, "তোমার লেখা থেকেই কোট করছি ঃ পত্রলজ্জা না থাকলেও এদেশের কিছু মানুষের এখনও চক্ষুলজ্জা আছে। মুখোমুখি দেখা হলে অনেক অপ্রিয় কাজ থেকে তাঁরা বিরত থাকেন। চিঠির কোনো শক্তিই নেই এদেশে—কারণ কাগজ, কলম, কালি কোনোটাই এই পবিত্রভূমিতে আবিষ্কার হয়নি।"

"কী হলো, ব্রাদার? রিকশয় চড়ে যেন আগেকার মতো সুখ পাচ্ছো না মনে হচ্ছে?" ইন্দ্রভূষণ আজ আমার জন্মদিনে যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখাচ্ছে।

"মানুষকে মানুষ টানছে ভাবলে আজকাল যেন কেমন লাগে, ইন্দ্রভূষণ।" আমি আমার বন্ধুকে বললাম।

ইন্দ্রভূষণ ওসব ছেঁদো কথা শুনতে চায় না। "পয়সা দিয়ে গাড়ি চড়ে একটু নির্মল আনন্দ পাবো তাতেও বিবেকের দংশন! আর ক'দিন পরে সমস্ত খেলা চুকিয়ে, বুকের ইঞ্জিন বন্ধ করে যখন চিৎপটাং হয়ে খাটে শুয়ে থাকবো তখন তো কারও না কারও ঘাড়ে চেপেই বার্নিং ঘাটে যেতে হবে। সুতরাং দ্বিধা কী? এই রিকশতেই রিহার্শাল হয়ে থাক।"

বহুদিন আগে এই পথ ধরেই আমি ও ইন্দ্রভূষণ আর একবার রিকশ চড়েছিলাম। আমি তখন শুধু কবিতা লিখি এবং প্রবন্ধ পড়ি। ইন্দ্রভূষণ জানতে চেয়েছিল, আমি গপ্পো-উপন্যাস লিখি না কেন? আমি তখন বলেছিলাম, সাহিত্যের সর্বোত্তম রূপ হলো কবিতা।

ইন্দ্রভূষণই আমাকে এই গল্প-উপন্যাসের লাইনে নামবার পরামর্শ দিয়েছিল। সে বলেছিল, "আমার ভাই গপ্পো-উপন্যাস ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। তুমি ভাই মানুষের জীবনে কি হচ্ছে এবং কি হতে পারতো তা একের পর এক সাধারণের জন্যে লিখে যাও—কবিতার চাঁদ তারা আকাশ নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্বটা অন্যদের ওপরে ছাড়ো। মিস্টার এন এন দত্তর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ এসব তো তুমি বার বার পড়ো, ওইগুলো থেকে রস নিংড়ে নিয়ে মজাদার গপ্পো তৈরি করো।"

স্বামী বিবেকানন্দর বদলে ওই এন এন দত্ত কথাটা আমি একটা উপন্যাসে লাগিয়েছিলাম। দু'-একজন পাঠক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন,

কিন্তু মিশনের একজন সন্ন্যাসী বিমল আনন্দ পেয়েছিলেন। মাধুরীকে তিনি বলেছিলেন, "মহাপুরুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা তাঁদের নিন্দুকরা নন, তাঁদের ভক্তরা। অন্ধ ভক্তরাই যুগে যুগে ভগবানকে সেফ ডিপোজিট ভল্টে পুরে কুলুপ এঁটে নির্বাসনে পাঠাতে সমর্থ হয়েছেন। মিস্টার এন এন দত্ত কথাটার মধ্যে প্রাণ আছে, একটু মজা পাওয়া গেলো।"

আমি সাহসী হয়ে উঠেছিলাম এর পরে। গরিমা লাহিড়ি নামে একটা দেহসর্বস্ব কলগার্লের মুখে একটা কথা দিয়েছিলাম: "বিশ্বাস দিয়ে শুরু করে অবিশ্বাসের অন্ধকারে যাওয়ার চেয়ে অবিশ্বাস থেকে শুরু করে বিশ্বাসের আলোকে পৌঁছনো ঢের ভালো।"

না, ওই সব চরিত্রর কথা আমি একবারও ভাববো না। আমার মনের সামনে এই সব চরিত্রদের জন্যে আমি প্রবেশ নিষেধ বোর্ড ঝুলিয়ে রাখতে চাই। আমি আজ এই জন্মদিনে যদি একান্তে বসে কেবল মাধুরীর কথাগুলো ভাবতাম তা হলে অনেক ভাল হতো। ইন্দ্রভূষণ কেন যে আমাকে বইপাড়ায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না। আমি কয়েক ডজন গল্প-উপন্যাস লিখেছি, কিন্তু আমি তো বলছি, যা হয়ে গিয়েছে তাতে আমার আগ্রহ নেই, আমি ওসব ভুলতে চাই।

কিন্তু ইন্দ্রভূষণের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি। নিজের সব সমস্যা ম্যানেজ করে সে বন্ধুর ব্যাপারেও চিন্তা করবার মতো উদ্দীপনা রাখে। মল্টেড মিল্কপাউডারের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও আজকাল মধ্যবয়সী মানুষের এই বাড়তি এনার্জির ছবি পাওয়া যায় না।

আজকাল ইন্দ্রভূষণের ওপর আমার মাঝে-মাঝে রাগও হয়। আমার জীবনে যা হয়ে গিয়েছে তার পিছনে ইন্দ্রভূষণের অনেকখানি হাত রয়েছে, ভাগ্যের আদালতে আমার বিচার হলে ইন্দ্রভূষণও সম্পূর্ণ নিরপরাধী হবে না। ইন্দ্রভূষণ যেন আমার নিয়তি। যদিও ইন্দ্রভূষণ বলতে পারে, আমি নাবালক নই, আমার জীবনে যা হয়েছে তার জন্যে আমিই দায়ী। বড় জোর অন্য কেউ নিমিত্ত মাত্র।

না, ভাগ্যের আদালতে যদি মাধুরীকে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তা হলে কী হতে পারে তা এখনই ভেবে ওঠা কঠিন কাজ। তা ছাড়া ইন্দ্রভূষণকে আমি আজ কোনো কঠিন কথা বলতে পারবো না। জন্মদিনে মানুষের সেই সব দিনের কথা স্মরণ করতে হয় যা স্মরণের যোগ্য।

ইন্দ্রভূষণের কাছে আমার তো কৃতজ্ঞতারও অন্ত নেই। ইন্দ্রভূষণ আমাকে অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে-অফিস ত্যাগ করে আমি

প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু ওই অফিসে না-ঢুকলে মাধুরীর সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হতো না। সব যেন একসূত্রে বাঁধা চেইন রিঅ্যাকসন—কোনো নিপুণ গল্পকারের বোনা গল্পের মতো, এক ঘটনা থেকেই আরেক ঘটনার উৎপত্তি। মনে হয় যেন আগের ঘটনাটা না ঘটলে পরবর্তী ঘটনা অসম্ভব হতো। ঐ আমি তখন কেউ নই। লুকিয়ে-চুরিয়ে পার্টটাইম কেরানি-সাহিত্যিক। কিন্তু ইন্দ্রভূষণ কখনও আস্থা হারায়নি আমার ওপর। সে সব সময় আমাকে সম্মান দিয়েছে।

অফিসের সহকর্মীদের কাছে ইন্দ্রভূষণ আমার সম্বন্ধে বলেছে, "এই যে আমার রাইটার বন্ধু অফিসে প্রতিদিন হাজিরা দিচ্ছে, আমাদের সঙ্গেই ফাইল ঠেলাঠেলি করছে, আমাদের মতোই সায়েবের হুকুম তামিল করছে, আমাদের মতোই নোংরা গ্লাসে চা খাচ্ছে বলে ভাববেন না ও আমাদের মতনই লোক। লেখকের কপালে ঈশ্বর একটা অদৃশ্য চোখ এঁকে দিয়েছেন, সেই চোখ দিয়ে সে এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা আমরা কেউ দেখতে পাই না। আমরা যেন ওকে সাধারণ মানুষ ভেবে না বসি, যেহেতু ওরও আমাদের মতো একজোড়া হাত এবং একজোড়া পা এবং একটা মাথা আছে।"

আমার কাছে সহকর্মীদের সরস এবং বিরক্ত মন্তব্যর রিপোর্ট ভেসে আসতো। ইন্দ্রভূষণ মজুমদার—অফিসে যার ডাকনাম আই-বি-এম—বলতো "সাধারণ মানুষ এবং লেখক-মানুষের মধ্যে যে অনেক তফাৎ তা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিয়েছি। এই ধরো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জামাকাপড়, হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলন দেখে কে বলবে বনগাঁয়ের পাঁচটা ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুর থেকে তিনি আলাদা? মানুষ যখন অর্ডিনারি হয় তখন আশেপাশের সবাইকেও সে তার মতো সাধারণ ভাবে। কিন্তু কী অবস্থা হলো? সেই নিশ্চিন্তপুর গ্রাম তারাও দেখলো আর বিভূতি ব্যানার্জিও দেখলেন—সেই আষাড়ুর হাট, সেই আকন্দফুল, সেই আসশেওড়া। সেই গরীব হরিহরের দুঃখের সংসারে সর্বজয়া দুর্গা অপুকে প্রতিদিন দেখে দেখে সাধারণ মানুষের চোখ পচে গেলো, কিছু প্রতিধ্বনি উঠলো না। আর একজন নিঃশব্দে সেই একই ছবি এঁকে বিশ্ববিজয় করে বসলেন। শুধু ইণ্ডিয়ার লোকরা নয়, সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এখন অপু-দুর্গার জন্যে চোখের জল ফেলছে, তাদের নিজের পরিবারের মানুষ মনে করছে।

"জানো তো, বিভূতি বাঁড়ুজ্যে আমাদের এই রাইটার বন্ধুর মতোই ঝকমকে জামাকাপড়ে অভ্যস্ত ছিলেন না। পাঞ্জাবি এবং জুতো অপরিষ্কার ছিল, বিড়ি খেতেন, বাজারে মুলো বেগুন মাছের উঠতি দর দেখলে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়তেন—অথচ মহাকালের জন্য কী উপহার রেখে গেলেন!"

ইন্দ্রভূষণের কথা শেষ হতে চাইতো না। সে বলতো, "এ-দেশে গেঁয়ো যোগীর বড়ই দুর্দশা—ভিক্ষে পাওয়াও মুশকিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জমিদার সেরেস্তায় কোন খাতাখানা লিখেছিলেন, বনগাঁর কোন আবগারি দারোগার কোন আত্মীয়কে কী চিরকুট পাঠিয়েছিলেন তা খুঁজে বের করবার জন্যে এখন মানুষের কী আগ্রহ। একদিন এই অফিসের ফাইলগুলোরও যে সে-অবস্থা হতে পারে তা বুঝেও বুঝছে না মানুষ।"

অনেকদিন আগে ইন্দ্রভূষণ আমাকে কর্মক্ষেত্রেও এই প্রশ্রয় দিয়েছে। আমার রাগ করা উচিত নয়। কোনো স্বার্থ নেই মানুষটার, তবু আজ এই জন্মদিনে সে ছুটে এসেছে। তারপর আমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির সামনে আমরা রিকশ থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছি। হেয়ার ইস্কুলের কাছে উঁচু রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রভূষণ চিৎকার করে উঠলো, "ঐ দেখো। তোমার কী সর্বনাশ করেছে।"

সর্বনাশ কথাটা অন্য কোথাও বাড়াবাড়ি মনে হতো, কিন্তু যখন দেখলাম নোংরা মলাটে কাঁচা হাতে নাম লেখা আমার বই সিককাবাবের মতো রৌদ্রে দগ্ধ হচ্ছে তখন আমার মনটাও খুশি রইলো না। ছাপানো মলাট না-থাকায় বইটা চামড়া-ছাড়ানো চিকেনের মতো মনে হচ্ছে।

"একটা বই নামাও ভাই," ইন্দ্রভূষণ নিজেই উদ্যোগ নিলো। লোকটা বুঝলো না স্বয়ং লেখক মহারাজ তাঁর বই দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

প্রত্যেক লেখকের কাছেই তাঁর বইগুলো সন্তানতুল্য। আশ্রয়হীন অসহায়ের মতো সন্তানরা পথে এসে দাঁড়িয়েছে দেখলে কোন পিতার কষ্ট হয়?

আমার আরও যন্ত্রণা অন্য কারণে। আমি যার মুখদর্শনীর

চাইছিলাম না, যে-বইটার কথা আমি সম্ভব হলে ভুলতে চাই, সেই বইটাই লোকটা নামিয়ে এনেছে। আমি মোটা অক্ষরে কাঁচা হাতে লেখা নামটা দেখে নিয়েছি, আনন্দসঙ্গিনী।

আমি এই বইটা আমার জন্মদিনে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবশ্যই দেখতে আগ্রহী নই। কিন্তু ইন্দ্রভূষণ ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। সে বলছে, "কী সর্বনাশ হয়েছে নিজের চোখে দেখো।"

সর্বনাশ কথাটা সত্যিই সর্বনাশা। শুভদিনে কে সর্বনাশের কাছাকাছি যেতে চায়? কিন্তু ইন্দ্রভূষণ ফর ফর করে পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছে।

সে বলছে, "গরিমা লাহিড়ি না, তোমার নায়িকার নাম? তোমার সৃষ্টি করা সব চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একটা গ্র্যাণ্ড পার্সোনালিটি, কিন্তু তার সর্বনাশ হয়েছে।"

কী সর্বনাশ হয়েছে? কেন সর্বনাশ হয়েছে? তা জানা প্রয়োজন।

ইন্দ্রভূষণ রেগেমেগে বলছে, "তুমি চোখ খোলো, ব্রাদার। তুমি নিজের চোখে একবার দেখো।"

"তোমার অমন ব্রিলিয়াণ্ট চরিত্র গরিমার কী হয়েছে ভাবা যায় না। অনেকগুলো পাতা উধাও। তার বদলে কোন এক যোগীর সরল যোগশিক্ষার অনেকগুলো ফর্মা ঢুকে পড়েছে।"

ইন্দ্রভূষণ তখন বইটার পাতা উল্টে যাচ্ছে দ্রুত। "কবে থেকে বইটার এমন অবস্থা হলো বলো তো? গরিমা বলে ওই মেয়েটির আনন্দসঙ্গিনীর এক একটি অধ্যায় এবং তার পরের অধ্যায়েই যৌগিক মহিমার কীর্তন। ইন্দ্রিয়র দাসত্ব থেকে সহজ মুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে পথনির্দেশ।"

ইন্দ্রভূষণের আফসোস শেষ হচ্ছে না। "অফিসে আজও ছেলেরা বলছিল, তুমি যত বই লিখেছো তার মধ্যে এই আনন্দসঙ্গিনীই সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত। গল্পটা তুমি অতি চমৎকার ম্যানেজ করেছো।"

ম্যানেজ! কথাটা কাঁকরের মতো আমার মনের নরম জায়গায় বিঁধছে। কিন্তু আমি এখন বইটা নাড়াচাড়া করছি নিজের হাতে। ...নকদিন পরে আবার আমি গরিমা লাহিড়িকে হাতের মধ্যে পেলাম।

অপু-দু. ...ভূষণ বললো, "অফিসের ছেলেরা আজকেও বললো, ঐ গরিমা
...নুষ মনে ...কেমন জমে গিয়েছে। বেশ যেন ডাঁটিয়াল ডাঁসা মহিলা। গরিমার দেহবর্ণনা না পড়লেও, স্রেফ নাম

থেকেই বলা যায় সুদেহিনী নায়িকা, আঁটসাট শরীর, বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশী হতে পারে না, কথাবার্তায় বেশ ঝাঁঝ।"

"এই দেখো", বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়েছে ইন্দ্রভূষণ। "নিবিড়নিতম্বিনী বলে একটা শব্দ কী চমৎকার ব্যবহার করেছিলে। নারীদেহের নিবিড় বর্ণনা, অথচ অশ্লীল হয়ে ওঠেনি। অশ্লীল হলে মাধুরী তখন অবশ্য তোমাকে আস্ত রাখতো না!" ইন্দ্রভূষণ অতি সাবধানে তার পাতানো বোনের উল্লেখ করলো।

ইন্দ্রভূষণ বলছে, "তোমার লেখা পড়েই তোমাকে আমি চিঠিতে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।"

চিঠিটা হয়তো এখনও খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। ইন্দ্রভূষণ লিখেছিল, "এই গরিমা নামটায় তুমি এক কোপে দুই ছাগল কেটেছো। ডাঁটো-সাঁটো রমণী, একটু গর্ব-গর্ব ভাব রয়েছে। অথচ অভিধান খুলে অর্থ দেখো, মাহাত্ম্য। যোগের অষ্টসিদ্ধির অন্যতম।"

আমি একবার 'আনন্দসঙ্গিনী' থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেলিঙের দিকে তাকালাম। আমি বিপুলভাবেই জাতে উঠেছি এবার! একখানা নয়, কয়েক ডজন 'আনন্দসঙ্গিনী' সগর্বে সাজানো দেখতে পাচ্ছি।

"নিশ্চয় প্রচণ্ড চাহিদা আছে, না-হলে ফুটপাথে কিছুতেই এতো কপি রাখতো না।" ইন্দ্রভূষণের মন্তব্য।

আমি আরও একটা কপি দেখতে চাই, সেখানেও এই নতুন লেখা ঢোকানো হয়েছে কিনা। ফুটপাথের দোকানদার অতশত বোঝে না, সে বললো, "বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।"

"ওরে বাপধন, যিনি ঘাঁটাঘাটি করছেন তাঁরই সন্তান", ইন্দ্রভূষণ বললো, কিন্তু লোকটা কিছু বুঝলো না।

"পুরো দামে রসিদ লিখিয়ে কিনে এনেছি স্যর, দু'নম্বরী কিছু নেই", দোকানদার সাফাই গাইলো।

আমি মালিকানা জাহির করতে আসিনি, আমি শুধু বইয়ের পাতাগুলো উল্টে দেখতে এসেছি। হ্যাঁ, ওই স্বামী নিরূপানন্দ লিখিত যোগপ্রক্রিয়ায় সংযম অনুচ্ছেদগুলি গরিমার স্তনকানন ও নিতম্বের আশেপাশে শোভা পাচ্ছে।

ইন্দ্রভূষণ বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। প্রকাশককে বিশেষ শিক্ষা দেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সে আমাকে প্রায় টানতে টানতেই প্রকাশকের দোকানের দিকে টেনে নিয়ে চললো।

নৃপেন সামন্তর ছেলে সুকান্ত সামন্ত তখন সামন্ত প্রকাশনীর

দোকানে বসে পান চিবোচ্ছিলেন। ইন্দ্রভূষণ জানে আমি একটু মুখচোরা, অপ্রিয় কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে আমি অভ্যস্ত নই।

দোকানে ঢুকেই আমার পক্ষে সওয়াল শুরু করলো ইন্দ্রভূষণ। "করেছেন কা মশাই! জীবিত লেখকের বুকে শক্তিশেল ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যদি নারীপ্রধান উপন্যাসে ধর্মীয় উপাদান পাঠকরা এতোই পছন্দ করেন তা হলে তো মূল লেখকের কাছে গিয়ে আপনারা অনুরোধ করবেন—গরিমার মধ্যে একটু ধর্মচেতনা ঢুকিয়ে দিন, একটু ঈশ্বরচেতনার দোলায় দুলুক সে। তা নয় আপনারা স্বামী নিরূপানন্দকে দিয়ে আটচল্লিশখানা পাতা সংযম সম্পর্কে নতুন মেটিরিয়াল লেখাবেন?"

সুকান্ত সামন্ত মোটেই উত্তেজিত হলেন না। কর্মচারিকে বললেন, "বই আনো।" তারপর যখন রিপোর্ট পেলেন স্টকে এক কপিও নেই, তখন পানের পিক মুখের মধ্যে সামলে বললেন, "বাইণ্ডারের কারখানায় এবং রেলিঙে কী হয় তার জন্যে আমরা দায়ী নই। গলতি ফর্মা নিশ্চয় বাইণ্ডার ঝেড়ে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে হাতের গোড়ায় আর কিছু না পেয়ে স্বামী নিরূপানন্দর বইয়ের তিনটে ফর্মা জুড়ে দিয়েছে পেজ নম্বর ঠিক রাখতে। এই দেখুন, ৪৯ পাতা থেকে শুরু হয়েছে—তার মানে ফর্মা চার, পাঁচ আর ছয় মহারাজের লেখা থেকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

ইন্দ্রভূষণ বলতে গেলো, "এটা যে উপন্যাস লেখকের বিরাট ক্ষতি!"

"দুঃখ করবেন না, যোগের বইতেও হয়তো দেখবেন আপনার আনন্দসঙ্গিনী তিন ফর্মা ধরে বিরাজ করছেন। স্বামীজীও শুনলে খুবই বিরক্ত হবেন। আমি স্বামী নিরূপানন্দর মুঠোর মধ্যে রয়েছি, আমার ছেলে ওঁর ইস্কুলেই পড়ছে।"

ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত, কিন্তু দুর্বুদ্ধিপ্রণোদিত নয়, এইটাই বোঝা যাচ্ছে। "আমরা তো মশাই ভেবে বসেছিলাম, ইচ্ছে করেই এই সব মেটিরিয়াল আপনারা আনন্দসঙ্গিনীতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন," ইন্দ্রভূষণ বললো।

"ককটেল জিনিসটা খুব ভাল, বাজারে নেয়ও খুব, কিন্তু আমরা ওসব কাজ অথরকে না জানিয়ে করি না। খদ্দের এবং অথর দুই-ই আমাদের লক্ষ্মী, বাবা রোজ রাত্রে খাবার সময় বলেন। খদ্দের চটলে অথর যেমন থাকবে না, তেমনি অথর চটলেও খদ্দের আর থাকবে না। দেখুন আমার কাকার পাবলিশিং-এর অবস্থা। আগে কত রমরমা ছিল, এখন কেবল পাওনাদার পড়ে রয়েছে।"

ইন্দ্রভূষণ এখন আনন্দসঙ্গিনীকে পুনরুদ্ধারের পন্থা চিন্তা করছে।

বইটা বেশ ভাল চলেছিল।

সুকান্ত সামন্ত বললো, "আপনারা চা খান, একটু অপেক্ষা করুন, বাবা এখনই এসে পড়বেন। ওঁর সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা বলে নেবেন। কেন বই দোকানে নেই অথচ রেলিঙে আছে তা উনিই বোঝাতে পারবেন। আমি এখন অমরেশ গাঙ্গুলীকে হ্যাণ্ডেল করি। ওনার বই বেরুতে না বেরুতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ সব লেখকদের এক উইকনেস, কোনো বইকে আউট-অফ-প্রিন্ট রাখা চলবে না। অমরেশ গাঙ্গুলীকে সন্তুষ্ট রাখতেই আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।"

তরুণ সুকান্ত সামন্ত এবার অমরেশ গাঙ্গুলীর বিতর্কিত উপন্যাস 'নির্জনে নগ্ন'র প্রুফ দেখায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

"কী আছে ভাই, অমরেশ গাঙ্গুলীর এই 'নির্জনে নগ্ন' উপন্যাসে? হৈ-হৈ করে বিক্রি হয়ে গেলো?"

"বিক্রি বলে বিক্রি! আমরা বাইণ্ডারদের ওভারটাইম দিয়ে কূল পাচ্ছি না।" সুকান্তর বাকভঙ্গিতে আনন্দ এবং বিরক্তির মধুর মিশ্রণ।

"কোনো নুডিস্ট কলোনিতে অভিজ্ঞতা? ওই যে সেবার অমরেশবাবু সাউথ আমেরিকা না কোথায় গেলেন?" ইন্দ্রভূষণের প্রশ্ন।

"লোকে তাই ভাবছে, বিজ্ঞাপনেও আমরা চুপচাপ রয়েছি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মেড ইন ক্যালকাটা এবং আরও একসাইটিং। রত্না নাগ বলে একটি মেয়ে, একটি লাক্সারি বাথরুম এবং একটি স্পেশাল আয়না ছাড়া আর কিছুই নেই উপন্যাসে। অথচ কী দুরন্ত হ্যাণ্ডলিং অমরেশবাবুর—প্রতি চ্যাপটারে রত্না নাগের সমস্ত অতীত একবার করে স্ক্যানিং করছেন আর আয়নাটা ক্রমশ হিরো হয়ে উঠছে।"

"তারপর?"

"তারপর, ব্যাপারটা আমরা হাইলি কনফিডেনসিয়াল রাখছি, পাঠকদেরও বিজ্ঞাপনে অনুরোধ করেছি প্লিজ পরিণতিটা কাউকে ফাঁস করে দেবেন না, ওটা আপনার নিজের কাছে রেখে দিন। পোয়েট্রি এবং রহস্যের চাউ-চাউ। মনে হয় এবার সারিডন পুরস্কার পেয়ে যাবে—মাথা ঘামান অথচ মাথা ধরাবেন না এই স্লোগানও তো অমরেশ গাঙ্গুলীমশাই সারিডন কোম্পানিকে লিখে দিয়েছেন।"

"কী হলো রত্না নাগের? একটু খুলে বলো না ভাই।" ইন্দ্রভূষণের প্রশ্ন।

খুলে বলার কিছু নেই।"

"তা হলে ? গল্পের শেষ নেই ? আজকালকার বেশীরভাগ উপন্যাসই তো অসম্পূর্ণ, লেখকরা শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে জানেন না।"

"শেষ আছে বই কি, একটা চমৎকার ভেলভেটের মতো নরম পরিণতি আছে—যা মনের মধ্যে চমৎকার নিটোল অনুভূতি জাগায়।"

আরও চাপ দিলো ইন্দ্রভূষণ। "আমার এই লেখক বন্ধু এবং আমি সেকেলে লোক। ডিকেন্স, শরদিন্দু, বিমল মিত্র, তারাশঙ্কর এঁরা সবাই বলে গিয়েছেন পরিণতির সময় একটা সলিড কিছু ঘটনা প্রয়োজন—অনুষ্ঠানের শেষে নাট্যমঞ্চে যেমন নিশ্চিত যবনিকা নেমে আসে।"

সুকান্ত সামন্ত এই সব মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। সে তখন ইচ্ছে করেই প্রুফ সংশোধনে ডুবে যাচ্ছে। "আমাদের কাছে সব লেখাই সমান, স্যর। বেড়াল কাঠের হলেও যদি ইঁদুর ধরতে পারে আমরা তাকে বেড়াল বলেই সম্মান করবো।"

সুকান্তর সহযোগী ছেলেটি এতোক্ষণ মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল এবং মিটমিট করে হাসছিল। সে বললো, "নির্জনে নগ্নর পরিণতিটা আমার থেকে ভাল কেউ জানে না। আসল কাঁচের আয়নাটা শেষে সহস্র সহস্র খণ্ডে ফেটে গেলো, এমনভাবে ফাটলো যে দেহের প্রতিফলন আর হয় না। অর্থাৎ কাঁচেরও হৃদয় আছে, তারও প্রলোভন সহ্যের একটা সীমানা আছে. এই সার-সত্যটুকু হৃদয়হীনা রত্না নাগের উপলব্ধি হলো।"

ইন্দ্রভূষণ জিজ্ঞেস করলো, "রত্না নাগের স্ট্যাটাস কী ? পতিতা ?"

"মোটেই না। রত্না অফিসে ভাল কাজ করে, তবে যাকে খুশি বাড়িতে নিয়ে আসে এবং তাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখে, টয়লেট থেকে স্নান সেরে আসছি এই অজুহাতে। সে দেখতে চায় অবহেলা সহ্য করে একজন মানুষ কতক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। ধৈর্যের পরীক্ষায় যে পাশ করে রত্না নাগ তাকে বিতাড়িত করে, আর যে ধৈর্যহীন হয়ে বিদায় নিয়েছে রত্না নাগ তাকে আবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এবং তাকে আবার প্রলুব্ধ করার মতলব আঁটে।"

ওরা আর কথা বাড়াতে চায় না আমাদের সঙ্গে। এই রেটে সব গল্পের নির্যাসটা বাইরের লোক শুনে নিলে বই পড়ার কোনো প্রয়োজনই হবে না।

ইন্দ্রভূষণ অবশ্য নানা বিষয়ে বক বক করে যাচ্ছে, সিনিয়র সামন্ত

করে না। আস। পর্যন্ত এখানে সময় কাটাতেই হবে।

সামন্ত প্রকাশনীর সিনিয়র সামন্ত এসে গিয়েছেন। আনন্দসঙ্গিনীর সঙ্গে যৌগিক প্রক্রিয়ায় বাসনানিবৃত্তির এই অবাঞ্ছিত মিলনে নৃপেনবাবু মোটেই উত্তেজিত হলেন না। তিনি বললেন, "দপ্তরিদের দয়ার ওপরেই বাংলা সাহিত্য টি[ঁ]কে আছে! ওরা যা খুশি করতে পারে। চোরগুলোকে নিয়ে কী করি বলুন তো? গলতি ফর্মাগুলো কখন গুদোম থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তারপর ফর্মা ৪—৬ অন্য কোথা থেকে টেনে নিয়েছে। ইদ্রিসকে ডেকে পাঠাচ্ছি আপনার সামনেই—সাহিত্য রসাতলে গেলেও ওদের কিছু এসে যায় না। কাঁচা পয়সা নিয়েই ওদের যতো মাথাব্যথা।"

দাড়িওয়ালা ইদ্রিস বাইণ্ডার একটু পরেই ছুটে এলো। "আমাকে দোষ দিচ্ছেন কি হুজুর? আনন্দসঙ্গিনীর তো কোনো এস্টকই নেই আমার কাছে।"

সামন্ত প্রকাশনীর সিনিয়র সামন্ত বললেন, "তাই তো। দাঁড়ান। স্টক তো অনেকদিন শেষ।"

ফাইল খুঁজে একটা চিরকুট বের করে ফেললেন সিনিয়র সামন্ত। "আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। আপনিই তো লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, আপনি লেখাটা নতুনভাবে আবার লিখে দেবেন। পুনর্লিখিত কপি না পাওয়া পর্যন্ত যেন বই আর ছাপা না হয়।"

চিরকুটটা দেখলো ইন্দ্রভূষণ। "এতো তোমারই লেখা দেখছি। তুমি হঠাৎ ওইরকম নির্দেশ দিতে গেলে কেন, ব্রাদার?"

মনে পড়ছে বটে, এই রকমই একটা স্লিপ অনেকদিন আগে দুপুর রাতে আমি লিখে ফেলেছিলাম। মাধুরী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। তার আগে সে চাইছিল সাহিত্যের সব দুশ্চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আমি তার পাশে এসে শুই।

"ওমা! এতো দেখছি বই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তুমি বই আর না-ছাপার ফর্মান জারি করেছো! কী হয়েছিল তোমার? নিজের দোষেই বইখানা আউট অফ প্রিন্ট হয়ে পড়ে আছে—রেলিঙের আনন্দসঙ্গিনীর সঙ্গে যে অ্যালজেব্রা জিওমেট্রির ফর্মা মিশে যায়নি এই যথেষ্ট।" ইন্দ্রভূষণ আমাকে বুঝতে পারছে না।

সেই পুরনো পথ ধরে রিকশয় চড়ে আমি ও ইন্দ্রভূষণ আবার কলেজ স্ট্রীট থেকে ফিরে আসছি। আমার বন্ধুর অভিযোগ, আমি একটা

কেমন ধরনের লোক হয়ে উঠছি। অমরেশ গাঙ্গুলী, কুমারেশ মিত্র-র মতো লেখকরা নিজের বেস্ট বইটা এমনভাবে নিজেই নষ্ট করতে পারতেন ?

এখন আমার আবছা-আবছা মনে পড়ছে, সামন্ত প্রকাশনীর বঙ্কিম চন্দ্র শী দু-একবার সংশোধিত কপি সম্বন্ধে আমাকে তাগাদা দিয়েছিল, আমি তখন কেবল মাধুরীর কথাই ভাবছি। আমি বলেছিলাম, তাগাদার প্রয়োজন নেই, সময় হলে আমি নিজেই তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবো।

"তোমার মতলবখানা কী ? লেখকদের মাথায় তো কতরকম তাজ্জব আইডিয়া খেলে যায় ?" ইন্দ্রভূষণ আমার অভিভাবকের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী।

ইন্দ্রভূষণ সন্দেহ করছে, সামন্ত প্রকাশনীর ছোট ছেলেটা নিশ্চয় আমার মাথায় বুদ্ধি দিয়েছে বইটার আকার আরও বাড়ানোর।

ইন্দ্রভূষণ বলছে, "তোমাকে একটা কথা বলবো, খবরদার ওই লাইনটা যেখানে বিবস্ত্রা গরিমা নিজেকে আবার আবৃত করতে করতে গল্পের শেষ মারাত্মক লাইনটা বলছে তারপর আর একটা শব্দও বাড়িও না। ওই আশ্চর্য কথাগুলোর পরে কেউ-কেউ হয়তো গরিমার শয্যা-মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ চাইছে, কিন্তু আর একটি শব্দ যোগ হলেই ছন্দপতন। গরিমার প্রফেশনাল স্ট্যাটাস ওই লাইনেই তুঙ্গে উঠে গিয়েছে, চিরকালের আলোয় আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্রভূষণ বোঝে না, ছোট-বড় সব লেখকের বুকের মধ্যে একজন সন্ত্রাসবাদী বসবাস করে। সে মাঝে-মাঝে বেপরোয়া হয়ে যা লেখা হয়েছে তা তছনছ করে দিয়ে আবার লিখতে চায়। এই ইনটারন্যাল টেররিস্টই লেখকের সবচেয়ে বড় শত্রু, একে বিনাবিচারে যে-লেখক যতদিন বন্দী রাখতে পারেন তাঁর ততদিনই মঙ্গল। টেররিস্টদের ন্যায়বিচার চলে না, বুকের মধ্যেও—একথা অমরেশ গাঙ্গুলী সেবারে প্রচুর মদ খেয়ে আমাকে বলেছিলেন। এদের বুকের মধ্যে লালন-পালন করাও কষ্টকর। একমাত্র নিরাপদ পথ খুব বমি করা, হঠাৎ যদি বমির সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে বুক হাল্কা হয়ে যায়।"

অমরেশ গাঙ্গুলীর বয়স আমারই মতন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। সেবার বললেন, "আগেকার যুগে বারাঙ্গনারা অশিক্ষিতা ছিল, তাই তাদের উপলব্ধিতে অরিজিন্যালিটি থাকতো। আর এখন সর্বত্র জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে—বিনোদিনীরাও প্রচুর সস্তা নভেল

স্পেয়ারটাইমে একের পর এক গলাধঃকরণ করছে। ফলে ওদের চিন্তার অরিজিন্যালিটি হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ততঃ আধডজন মেয়ে আমাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করে আপনার লেখা আনন্দসঙ্গিনী থেকেই কোটেশন দিয়েছে—আমরা দুঃখ পাবো কেন? আনন্দসঙ্গিনীর শেষ পাতার শেষ লাইনটা এখন খারাপ পাড়ার বিছানায়-বিছানায় ঘুরছে।"

অমরেশ গাঙ্গুলী মত্ত অবস্থায় হাহাকার করেছিলেন, "আপনি মশাই নোংরা একটা জীবিকাকে প্রফেশনাল স্ট্যাটাস দিয়ে ওদের শিরদাঁড়া শক্ত করে দিলেন।"

ইন্দ্রভূষণ এসব খবর রাখতো। কিন্তু সে বলেছিল, "অমরেশ গাঙ্গুলীর গর্তে পা দিও না। উনি আজকাল তো একের পর এক নিজের বইগুলোর সর্বনাশ করছেন, নতুন করে লিখে। শেষ কথা হয়ে যাবার পরে আবার শুরু করা যায় না, ব্রাদার।"

রিকশ চড়েই আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। রিকশয় ইন্দ্রভূষণ আমাকে খুব বকেছে। জন্মদিন না-হলে হয়তো আরও কড়া কথা বলতো।

"এতো কষ্ট করে, এতো যন্ত্রণার পরে যে-বইটা লিখলে, সেটা অমনভাবে কেউ আউট-অফ-প্রিন্ট ফেলে রাখে?"

ইন্দ্রভূষণ হয়তো ভাবছে মাধুরী যদি আমার দায়িত্বে থাকতো তা হলে এমন ঘটতে দিতো না। অন্তত আনন্দসঙ্গিনী কখনও পাঠকের চোখের সামনে থেকে এইভাবে সরে যেতো না।

"ব্রাদার, তুমিই তো বলেছিলে, অদ্ভুত এদেশের পাঠকসমাজ। এখানে ভাল হোক, মন্দ হোক, কিছু লেখা নিয়ে সারাক্ষণ তোমাকে পাঠকের চোখের সামনে হাজির থাকতে হবে। চোখের আড়াল হলেই মানুষ ভুলে যাবে।"

ইন্দ্রভূষণ এই কথা বলে, কিন্তু মাধুরী আমার আনন্দসঙ্গিনী পড়েই অন্য মন্তব্য করেছিল। সে বলেছিল, "যা একবার লেখা হয়ে যায়, তা চিরদিনের খাতায় জমা পড়ে, কিছুতেই তা মুছে ফেলা যায় না।"

মাধুরী অবশ্যই বলেছিল, আমি এতোদিন যা ছিলাম তার থেকে একবারে পাল্টে গিয়েছি। মাধুরী, তুমি তো জানতে, লেখকের সৃষ্টির

সঙ্গে ওই নদীর তুলনা। গতিপথ পাল্টায়, বারবার নদী মোড় নেয়।

আমি এখন ভাবছি আমার ফেলে-আসা সাহিত্যজীবনের কথা। আর সেই কথার সঙ্গে গরিমা লাহিড়ির জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই আনন্দসঙ্গিনীই আবার আমাকে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে দিলো।

মাধুরী, তোমাকেই আজ বেশী করে মনে পড়ছে। আবার ঐ ইন্দ্রভূষণকেও ভুলতে পারছি না। আনন্দসঙ্গিনী পড়া শেষ করে সে আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, "তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছো ব্রাদার। স্বয়ং সরস্বতী যে লেখকের কলমের ওপর ভর করেন তা এবার আমি বুঝতে পারলাম। শুধু কানে শুনে, তনিমা মেয়েটাকে একবারও না-দেখে গরিমার যে-ছবিটা আঁকলে তা একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে উঠলো। আমি তো জানি কাঁসের থেকে কী সৃষ্টি হলো।"

আমি তখন কোনো মন্তব্য করতে উৎসাহিত বোধ করিনি। ইন্দ্রভূষণ তখনকার মতো আমার নীরবতাকে ক্ষমা করলেও আর কয়েকদিন পরেই আমাকে বকুনি লাগিয়েছে, "তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছো। আস্থাহীন লেখকের যে অনেক বিপদ তা তুমি নিজেই এক জায়গায় লিখেছো। শোনো, বিশ্বনিন্দুক সমালোচক অরণি দাস পর্যন্ত তোমার এই আনন্দসঙ্গিনী সম্পর্কে এবারের সাপ্তাহিক পত্রে কী লিখেছে।"

অরণি দাসের সেই মন্তব্য মাধুরীও পড়েছিল : "এই উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে দেহসর্বস্ব গরিমা মানবসমাজকে অবশেষে তাহার বিশ্বাস ফিরাইয়া দিয়াছে। মহাসৃষ্টির যে আনন্দমঞ্চ হইতে এই মানবসমাজের উৎপত্তি, সে আনন্দরূপ অমৃতের আশীর্বাদ শুধু মহাজনদের মস্তকেই বর্ষিত হয় না, সামান্য গরিমাও সেই চিরশক্তির অমোঘ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া নিজেকে ধন্য করিতেছে, যদিও মানুষের রচিত নশ্বর সামাজিক আইন তাহাকে সম্মানিতের আসরে প্রবেশপত্র দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়।"

এখন এই বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি আমার জন্মদিনে আমার চিন্তাহীন শৈশবে ফিরে যেতে চাই। আমার একখানা উপন্যাস সম্পর্কে আমি মোটেই সময় ব্যয় করতে আগ্রহী নই। কিন্তু ইন্দ্রভূষণ

আর যে মানুষটি আমাকে এই ঘরে নিয়ে এসেছিল, যে তিলে তিলে আমাকে আজকের এই অবস্থায় আসতে সাহায্য করেছে, সে এখানে না-থাকলেও তার উপস্থিতি আমি মুহূর্তের জন্য অগ্রাহ্য করতে পারছি না।

এখন সন্ধ্যা পেরিয়েছে। জন্মদিনের নায়করা আত্মীয়বন্ধু সান্নিধ্যে এইসময় সান্ধ্যভোজনের আনন্দ শুরু করেন। আমি এখন আমার বাড়িতে একা। আজ আমার খাবার ইচ্ছেও নেই। আমি এখন টেবিলে বসে-বসে নিজের কথাটাই লিখতে চাই।

এই যে আনন্দসঙ্গিনী উপন্যাস— এর শুরু কবে থেকে? বোধ হয় আমার জন্মমুহূর্ত থেকেই। দেখুন না আমার অবস্থা!

আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পদাশ্রিত শিক্ষকদের ছাত্র হবার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাঁরা পরম যত্নে মহাপুরুষদের বাণী এবং চিন্তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়েছেন। আমি কৈশোরে শত শত সংস্কৃত স্তব কণ্ঠস্থ করেছি, সেইসব আবৃত্তি করে আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের প্রীতি ও স্নেহ অর্জন করেছি।

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্, অবীরাবীর্ম এধি, বেদস্য মে আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি, ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে। এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিবারাত্র সংযোজিত করিব। আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আচার্যকে রক্ষা করুন; আচার্যকে রক্ষা করুন। শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক।"—এই আবৃত্তি করে প্রধান শিক্ষকের হাত থেকে আমি একখণ্ড স্তবকুসুমাঞ্জলি পুরস্কারও পেয়েছিলাম।

বিবেকানন্দর চিন্তার আলোকেই আমি সৃষ্টির জটিল রহস্যকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি আমার সাধ্যমতো। আমি জেনেছি, সতত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের চেষ্টার নামই জীবন।

আমি যৌবনে কবিতা লিখতাম। কাব্যই মানসের শান্তি দিত

পারে বলে আমি বিশ্বাস করেছি। সেই সময়ে কলেজে ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে ভাব হয়েছে আমার। গল্পপাগল ইন্দ্রভূষণ আমাকে বুঝিয়েছে, কাব্যের যুগ নয় এখন, তার স্নুবর্ণযুগ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। এখন গল্প-উপন্যাসের যুগ। কথাটা আমি বিশ্বাস করে নিয়েছি। ইন্দ্রভূষণ আমাকে বলেছে, "মানুষের প্রধান প্রধান দুঃখের কথাগুলো এখন গল্পের মাধ্যমেই বলতে হবে ব্রাদার, না-হলে কেউ তা শুনবে না।"

শুরু হয়েছে আমার কথা-সাহিত্যযাত্রা। আমি একের পর এক লিখে চলেছি। ইন্দ্রভূষণ আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। তারপর নিজের আপিসে চাকরি করে দিয়েছে। আমি তখন নিজের পথ স্থির করে নিয়েছি। মহাপুরুষরা যেসব অমৃতবাণী মানবসমাজের জন্যে রেখে গিয়েছেন, অথচ যা মানুষের কানে ভালভাবে পৌঁছয়নি সেসবই ঘুরে ফিরে আসবে আমার কথাসাহিত্যে, আমি মানুষকে তার মূল্যবোধ ফিরিয়ে দেবো।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা···হে দেবগণ, আমার কর্ণে যেন কল্যাণবচন শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমার চক্ষে যেন সুন্দর বস্তু দর্শন করি। রাত্রি এবং দিবসসকল মধুময় হউক; পৃথিবী-লোক মধুময় হউক; পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হউক। তুমি তেজ, আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য, আমায় বীর্যবান কর; তুমি বল, আমায়-বলবান কর; তুমি ওজঃ, আমায় ওজস্বী কর; তুমি অন্যায়দ্রোহী, আমায় অন্যায়দ্রোহী কর; তুমি সহ্যশক্তি, আমায় সহনশীল কর। হে পৃথিবী, তুমি কণ্টকশূন্যা, বাসোপযোগিনী এবং সর্বতঃ বিস্তৃতা হইয়া আমাদের নিকট সুখস্বরূপ হও; আমাদিগকে আশ্রয় দাও।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমে বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।—আমি এই বিরা পুরুষকে জানি; দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য, আদিত্যবর্ণ, অবিদ্যার ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই পুরুষকে জানিয়াই লোক মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাঁহাকে আশ্রয়ের অন্য কোনো উপায় নাই।

আমি ধীরে-ধীরে আলোকের পথে অগ্রসর হচ্ছি। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর গভীরতম চিন্তা-ভাবনা। ঠিক সেইসময় মাধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হলো।

মাধুর্যের বহুল উপস্থিতির জন্যই বোধ হয় ওর নাম রাখা হয়েছিল মাধুরী। সে যার সান্নিধ্যে আসে তাকেও মধুর করে তোলে। সে

আমার ভবিষ্যতকে রঙীন দৃষ্টিতে বুঝে নিলো, সে চায় আমি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করি যা মানুষকে মহৎ কর্মে উদ্দীপ্ত করবে।

এরপর আমি মাধুরীকে বিয়ে করেছি। জীবনের দুর্গম পথে সে যথার্থ সঙ্গিনী হবার ব্রত গ্রহণ করেছে। সে আমাকে দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে, নিজে আরও কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। এক একজন এক একটা কাজের জন্যে জন্ম নেয়, মাধুরীর বিশ্বাস। মাধুরী চায় না আমি মূল্যবান সময়ের অপচয় করি। তার ইচ্ছা আমি আমার সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকি, ছোটখাট আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবার মতো শক্তি ও সুযোগ ঠাকুর তো তাকে দিয়েছেন।

আমি ক্রমশ অনেকটা সফল হয়েছি। আমার এই কয়েক বছরের সাধনা অসম্ভব হতো মাধুরীর নিঃশব্দ ত্যাগ ছাড়া। ইন্দ্রভূষণ আমাকে বলছে, "তুমি সত্যিই লাকি!"

আমি অবশ্যই সৌভাগ্যবান। না-হলে মাধুরীর মতো মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে খুঁজে পাবো কেন?

মাধুরী চায় আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আরও এগিয়ে যাই। আমি একদিন তাকে বলেছি, "ছোট আপিসের প্রাক্তন কনিষ্ঠ কেরানি আর কত এগোবে? তোমার স্বপ্নের একটা সীমা থাকা প্রয়োজন।"

মাধুরী আমার কথা শোনেনি। সে বলেছে, "তুমি মন দিয়ে সরস্বতীর সাধনা করো।"

আমার লেখার সময় সে ধূপ জ্বেলে দেয়। তারপর একদিন কোথা থেকে ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজীর তিনখানা নতুন ছবিও আমার লেখার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেলো।

আমি কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট হলাম না। আমার অস্বস্তির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইদানীং আমার মঠ-মিশন মার্কা গল্পের সমালোচনা হচ্ছে চাপা গলায়। একজন সম্পাদক বলেছেন, "রান্না খাবারে ধুনোর গন্ধ। উপন্যাস কখনোই আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের যোগ্য মাধ্যম নয়—বিশ্বসুদ্ধু লেখক বলছে, মিডিয়া ইজ দ্য মেসেজ।" আমি বললাম, "মাধুরী, পূজার ঐসব উপচার সরিয়ে নাও। মনে রেখো, আমি কবিতা লিখি না। আমি গান লিখি না। আমি মানুষের মনের পানাপুকুরে নেমে গল্প খুঁজে বেড়াই।"

"ওমা! সেই জন্যেই তো বেশী করে ধূপধুনোর গন্ধ প্রয়োজন!" মাধুরী মিষ্টি হেসে আমাকে বলেছিল।

আমি জানি, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের অনেকেই জনপ্রিয়তায় আমাকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছেন। আমার মনটা ইদানীং খচখচ করছে—আমার তৈরি খাবারে সত্যিই কি ধূনোর গন্ধ ?

মাধুরীকে আমি বললাম, "শোনো, সাহিত্যিক কুমারেশ মিত্র সেদিন বলেছেন, কথাসাহিত্যসৃষ্টি ভাল মানুষের কম্মো নয়। এক নম্বর শয়তান না হলে এক নম্বর গল্পলেখক হওয়া যায় না।"

"কেন? রবীন্দ্রনাথ কি ভাল গল্প, ভাল উপন্যাস লেখেননি ?" মাধুরীর মিষ্টি প্রশ্ন।

"কুমারেশ মিত্র গোপনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। মানুষটা নিজে যেমন, সমস্ত লেখায় তেমন ব্রাহ্মণোচিত গুণ ছড়িয়ে। অত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও মানুষটা নাকি গ্রেট কথাসাহিত্যিক হতে পারলেন না স্রেফ ওই শয়তানীর অভাবে। খাদ না থাকলে সোনার জেল্লা হয় না। তুমি হয়তো বুঝবে, কারণ শরদিন্দুর সঙ্গে তোমার দূরসম্পর্কের কী একটা আত্মীয়তা রয়ে গিয়েছে।"

মাধুরী বলছিল, "আমি তোমার ওই কুমারেশ মিত্তিরের সঙ্গে মোটেই একমত হচ্ছি না—সাহিত্য মানে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়ের রিপোর্ট নয়।"

মাধুরী বিপুল আত্মবিশ্বাসে নিবন্ত ধূপ দুটো জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত ঘরটা গন্ধে পূর্ণ করে দিয়েছে!

স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবীর নজরের সামনে কলম নিয়ে বসতে হবে আমাকে। "মহাত্মাগণ, এতো কাছ থেকে এই অধমের ওপর সারাক্ষণ এমন কড়া নজর রাখলে তার সাহিত্যকর্ম কেমন করে স্বাধীন হবে ?"

মহাত্মাগণ আমার প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাঁরা জানেন আমার জোরে তাঁরা এই কক্ষে আমন্ত্রিত অথবা প্রতিষ্ঠিত হননি। যিনি তাঁদের আবাহন করেছেন তিনি এই মুহূর্তে স্নান সেরে সাহিত্যিক স্বামীর জন্য চা প্রস্তুতে ব্যস্ত।

মাধুরী চা নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার আগামী উপন্যাসটা নিয়ে ভাবনা শুরু করেছো ?" আমি কয়েক লাইন হিজিবিজি কেটেছি, তাই সকৌতূহলে মাধুরী সে-দিকে দৃষ্টিপাত করলো।

"ওমা! তুমি তো বিবেকানন্দ বন্দনা রচনা করছো।"

"বন্দনা নয় মাধবী। চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড দত্ত কোং-এর বিরুদ্ধে

স্মারকলিপি। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস জি ডি চ্যাটার্জি, ওরফে গদাধর, ওরফে রামকৃষ্ণ এবং মিস্টার এন এন দত্ত, ওরফে বিবেকানন্দ, কোনো মেয়েই যাঁকে স্বামীত্বে বরণের সুযোগ পেলো না, তিনি নিজেই সগৌরবে স্বামী টাইটেল বসিয়ে নিলেন নিজের নামের সামনে!"

"আঃ! মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এসব কী বলছো?" মাধুরী আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিল, কিন্তু সে আমাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করেনি—শিল্পীর স্বাধীনতায় সে বোধহয় মনে-মনে বিশ্বাস করে।

মাধুরীকে সেদিন খু-উব মিষ্টি দেখাচ্ছিল। একটু আলতো আদর করে দিলাম, যদিও কোথায় যেন পড়েছিলাম কামিনী সংসর্গ যে কোনো সাধনপথের দুর্জয় বাধাস্বরূপ।

মাধুরী দেখলো আমি কাগজ কলম নিয়ে কী করেছি। আমি লিখেছি, "হে মহাপুরুষগণ, আপনারা ভাগ্যবান, আপনারা সত্যে উপনীত হয়েছেন, উপলব্ধির ঐশ্বর্যে আপনারা মহীয়ান। আপনারা দিশেহারা ভীরু ভক্তের নিরাপদ আশ্রয়, কিন্তু আমার এই কথাসাহিত্যশালায় আপনাদের উপস্থিতি এখন বিপজ্জনক। আপনারা বিশ্বাসের অমৃতলোকের বাসিন্দা, আর অবিশ্বাসই গল্পলেখকের শ্রেষ্ঠ মূলধন!"

মাধুরী সকৌতুকে শুনেছিল আমার স্মারকলিপি। "হে মহাশক্তিমান ত্রয়ী, আপনারা এই বিশাল নগরীর অন্যত্র মহানন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন। আমি একজন গল্পসন্ধানী শ্রমিক। সন্ধান করার আনন্দটাই আমার মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়—মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ। জার্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে শোনা যায়, ঈশ্বর যদি এসে তাঁকে বলতেন—তুমি সত্য চাও—না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন–আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাবো, কেমন করে পাবো······এই খোঁজের খেলার বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হয়ে থাকতে চাই!"

মাধুরী আমাকে একটুও বিশ্বাস করেনি। সে ভেবে নিয়েছে, আমি মজা করছি। মজা করাতে তার আপত্তি নেই। চাটুজ্যে অ্যাণ্ড দত্ত দু'জনেই খুব মজার লোক ছিলেন–ইয়ারকি ঠাট্টায় মশগুল না হলে অনেক মহাপুরুষেরও ভাত সহজে হজম হতো না।

পরপর অনেকগুলো উপন্যাস কয়েকবছরে লিখে ফেলেছি। বাড়িতে সারাক্ষণ বসে থাকি আমি। আমাকে দাসত্বের বোঝা বইতে হয় না। মানুষের জঙ্গল ঠেলে আমাকে অফিস যেতে হয় না।

আমার স্ত্রীর পয়সা রোজগার যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ আমার আর্থিক দুর্ভাবনা নেই। আমি লিখেও কিছু কিছু টাকা রোজগার করি। বউয়ের ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলে আমাকে গোপন সামাজিক অমর্যাদায় ভুগতে হয় না। আমার যত সময় আছে তা আমি বই পড়ায়, ভাবনা-চিন্তায় এবং লেখায় ব্যয় করতে পারি।

অর্থাৎ আমি সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন যে সবিনয়ে নিজেকেই নিজের ভাগ্যবিধাতা বলে দাবি করতে পারে। মাধুরী এই অবস্থাতেই খুশি। সে এমনই চেয়েছিল। সে জানে গভীর চিন্তার অবসর না থাকলে মহান কথাসাহিত্য তৈরি হয় না। মানুষের এই সমাজের বুনন বড় জটিল। তার সমাধান খুঁজতে চাইলে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে, পার্টটাইম লেখকদের সে কর্ম নয়।

মাধুরী তার আনন্দ চেপে রাখে না। সে বলেছে, "আমি নিজের ফ্ল্যাট, নিজের গাড়ি, এককাঁড়ি ইলেকট্রনিক যন্ত্রসামগ্রী এসব তো চাইনি। আমি চেয়েছি তুমি একটা দাগ রেখে যাও। বিবেকানন্দ তাই চেয়েছিলেন—জন্মালি তো একটা দাগ রেখে যা।"

আমি আমার ভাবনা-চিন্তা মতো অনেকগুলো বই লিখেছি, আমার চরিত্ররা মহৎ উপলব্ধির উচ্চস্তরে ঘোরাঘুরি করেছে। তারা দাগ রেখে যাওয়ার মতো ভাবনা-চিন্তা করে। কিন্তু তবু অদ্ভুত এক অস্বস্তি ইদানীং আমাকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে।

সম্পাদক হরিহর দের সঙ্গে সেবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো। তিনিও অজান্তে ওই একই কথা বললেন। "এবার একটা দাগ রেখে যাবার ব্যবস্থা করুন।"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছি। দাগ তো কত রকমের হয়। সম্পাদক বলেছেন, "সিঁদুরের দাগ, রক্তের দাগ, ময়লার দাগ—এসব বলছি না। সমাজের শিলাপটে মানুষের পায়ের দাগ। এমন দাগ যা জলে ধুলেও মুছবে না।"

সম্পাদক হরিহর দের কথাগুলো আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হচ্ছে না। হরিহর বলছেন, "সামনেই তো আমার বিনোদন সংখ্যা রয়েছে, ইংরিজী নববর্ষের গোড়ায়। আপনি দেখিয়ে দিন। এমন একখানা উপন্যাস যা প্রমাণ করবে আপনি দুরন্ত নদীর মতো যতবার ইচ্ছে মোড় নিতে পারেন।"

সম্পাদককে আমি বলেছি, "আর একটা চিন্তাধারা আছে। ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তন কোরো না, নিজের বক্তব্যে অটল থাকো,

মানুষের কানে কথা পৌঁছতে সময় লাগে।” আমার মনে পড়েছে মাধুরীর কথা, “আকাশ চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পর্বত সমুদ্র এসব পাল্টায় না, ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় শুধু চঞ্চলমতী রমণীর শাড়ির ডিজাইন, ব্লাউজের কাট, চুলের স্টাইল।”

সম্পাদক হরিহর দে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করলেন, আমার লেখায় একই চিন্তা বারে বারে প্রতিফলিত হচ্ছে, লৌকিক ভাষায় যার নাম একঘেয়েমি। আমি বড্ড বেশী ভূমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। গানে এবং কবিতায় পাঠক ঐভাবটা মেনে নেয়, কিন্তু উপন্যাসের পাঠক অভিনবত্বের পূজারী। ইংরিজী নামটাই তো নভেল—অর্থাৎ অভিনব।

সম্পাদক হরিহর দে আমাকে উত্তেজিত করার জন্যেই যেন বললেন, “সদাপরিবর্তনই আধুনিক কথাসাহিত্যের ধর্ম। আর ওই যে একই মেসেজ পুনরাবৃত্তির কথা বলছেন ওটা বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীদের পলিসি।”

“আমাদের ধর্মগুরুরাও ওই পুনরাবৃত্তিতে বিশ্বাস করতেন,” আমি সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকার অভিজ্ঞ সম্পাদক হরিহর দেকে বলেছি।

হরিহর বলেছেন, “ওঁরাও হয়তো ওই বিজ্ঞাপন লাইনেই রয়েছেন। পণ্যের প্রচার ওঁদেরও কাম্য। ওঁরা কোনো বিশেষ একটা ধারণাকে মার্কেট করতে চান, আর এখন থেকে আপনার সাহিত্যে আমরা চাই সদাবিস্ময়।”

আমি বুঝেছি আকারে ইঙ্গিতে ওই অমরেশ গাঙ্গুলীর সুবিপুল সাহিত্য-সাফল্যের কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছেন জহুরী সম্পাদক হরিহর দে। অমরেশ গাঙ্গুলী এবার কোনদিকে গতি-পরিবর্তন করে কোন বিষয়ে লিখবেন তা জানবার জন্যে সবাই ব্যাকুল হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আমাকেও যে এবার অপ্রত্যাশিত কিছু করতে হবে তা আমি বুঝতে পারছি। নিজের আদর্শের গণ্ডিতে নিজের সাহিত্যকর্মকে বন্দী রাখা চলবে না। আমি মাধুরীর সঙ্গেও এ-বিষয়ে একটু একটু আলোচনা করেছি। ও বেচারা ধারণা করে বসে আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে, বিবেকানন্দ বাণী ও রচনায়, ভগিনী নিবেদিতার পত্রাবলীতে অসংখ্য বৈচিত্র্য ছড়িয়ে রয়েছে। শত বৎসর ধরে পাতায় পাতায় চিন্তার বিস্ময় খুঁজে পাচ্ছেন ভক্ত পাঠক। তাঁরা সকলেই নিশ্চয় বোকা নন।

কথাটা অবশ্যই মিথ্যা নয়। হরিহর দে ও মাধুরীর কথাগুলো আমি দিনের পর দিন ধরে বুকের মধ্যে লালন করছি। এইভাবেই তো

মানুষ পথের সন্ধান পায়।

প্রতিবার উপন্যাস লিখতে গিয়ে আমি অসংখ্য দ্বিধার জালে বন্দী হয়ে পড়ি। মাধুরী আমাকে অসহায়ের মতো ছটফট করতে দেখে, কিন্তু চিন্তিত হয় না। কারণ মাধুরী জানে, প্রতি বছর আমি শেষপর্যন্ত সমস্ত বিপত্তির জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আমি যা চেয়েছি অবশেষে তাই খুঁজে পেয়েছি।

এই শেষ কথাটা মাধুরীর খুব প্রিয়। সে বলে, "মানুষ যা চায় তার বাইরে সে কিছু পায় না। সুতরাং তোমাকে চাওয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে।"

আমি তর্ক করিনি। না চাইতে কবে কী পাওয়া যায় তার হিসাবেও মগ্ন হইনি। কারণ মাধুরী এখনই কোনো পূজ্যপাদ মহাপুরুষের বাণী স্মরণ করবে—এঁদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমার পক্ষে শোভা পায় না।

সেবার কী এক উৎসব শুরু হলো আলমবাজারে। সারাদিনের ব্যস্ততা। মাধুরী অবশ্যই যাবে। কিন্তু আমি এই নতুন উপন্যাসের ভিত্তিভূমি রচনার কাজে বিভোর হয়ে আছি—আমার নিরবচ্ছিন্ন ভাবনার অবসর চাই।

আমি বাড়িতে বসে আছি। সমস্ত দুপুর ধরে আমি চিন্তা করেছি। নূতনের মোহমায়া আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সম্পাদক হরিহর দেকে আমি বোঝাতে চাই যে অন্য লেখকদের থেকে আমার অভিনবত্ব কম নয়, আমি এখনও ফসিল হইনি, আমি এখনও পরিবর্তিত হতে পারি অপ্রত্যাশিতভাবে।

আমি ভাবছিলাম, নিবেদিতার চিন্তার আলোকে নতুন এক নায়িকা সৃষ্টি করলে কী হয়? উজ্জ্বল এক মানবী যিনি বজ্রের থেকেও কঠোর, যিনি সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে এই নির্বীর্য জাতকে তুলে এনে তাকে আবার পরিচ্ছন্ন এক মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আমি গানের মাধ্যমে, ছন্দের মাধ্যমে এমন এক অনির্বচনীয় পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারি, কিন্তু গল্প-উপন্যাসের ফ্রেমে এসে আমার কল্পনার রথ বারবার থমকে দাঁড়াচ্ছে। আমার সমস্ত প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। যতই এগোবার চেষ্টা করছি ততই মনে হচ্ছে,

ব্যাপারটা কোনো চিৎপুর কোম্পানির যাত্রার মতো হয়ে যাচ্ছে। চম্বলের কোনো নারী দস্যুর সঙ্গে আমার মানসলোকের নায়িকার তেমন তফাৎ থাকছে না। আমার সূক্ষ্ম রসবোধ বিরক্ত হচ্ছে। আমি যা চাইছি তা কিছুতেই পাচ্ছি না।

অনেকক্ষণ বিফল সাধনার পর, সমস্ত চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অবশেষে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ওয়েলিংটনে হিন্দ সিনেমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, ভাবছি পার্কে ঢুকে দু'একটা মেঠো বক্তৃতা শুনবো কিনা। এইসব বক্তৃতা শুনে অনেকসময় নতুন আইডিয়া পাওয়া যায়।

"একি ব্রাদার! এখানে?" ঠিক সেইসময় ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে যে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

আফিসে আগাম কাট দিয়ে ইন্দ্রভূষণ বেরিয়ে পড়েছে। ওকে কিছু বলা চলবে না এই কর্তব্যকর্মে অবহেলা সম্পর্কে, সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখ করবে, "আমার বউতো মাধুরীর মতো শিক্ষিতা নয়, হলে আমিও তাকে অফিসে পাঠিয়ে নিজের স্বাধীনতা কিনে নিতাম। মোদ্দা কথা হলো অফিস আমার ভাল লাগে না, পেটের দায় না থাকলে কোন ব্যাটা প্রতিদিন ওখানে হাজিরা দিতো।"

আমি এবং ইন্দ্রভূষণ সেই পুরনো দিনের বন্ধুর মতো চিনেবাদাম কিনে ফেলেছি। ইন্দ্রভূষণ রসিকতা করছে, "মাধুরী একটা দিনের জন্যে আলমবাজারে গিয়েছে আর তাতেই তুমি ব্যাকুল, ব্রাদার!"

"তোমার বোন। তুমি কিছু বশীকরণ মন্ত্র দিয়েছো কিনা কে জানে?" আমি হাল্কা হবার চেষ্টা করি।

"বোন বলে গেলো, লেখক-স্বামী এখন নতুন কিছু লেখবার জন্যে সাধনায় ডুব দিয়েছে। ঘন ঘন 'সমাধি' হচ্ছে। এই সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

"সমাধি, তবে ইংরিজী কায়দায়। এক একটা আইডিয়া আসছে, দু'দিন ধরে তাকে লালন করতে হিমসিম খাচ্ছি, তারপর কবর দিতে হচ্ছে। কেউ বাঁচছে না। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এলাম রাস্তায় একটু ভিড়ের ধাক্কা খেতে।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও ব্রাদার।" ইন্দ্রভূষণ এবার ঝট করে একটা রিকশকে ডেকেছে। "এই রিকশয় কিছু ঝাঁকানি খেলে ব্রেনের জট খুলে যায়। সেবার তুমি একটা কবিতা লিখে ফেললে আমার সঙ্গে রিকশ

যাত্রার পর। কেউ যখন তোমার জীবনী লিখবে তখন আমি তার কাছে তোমার সব ঘটনা ফাঁস করে দেবো।"

রিকশ চড়েই আমি ও ইন্দ্রভূষণ ফিরে যাচ্ছি। কেরানি-কলকাতা এখনও ছুটি পায়নি, রাস্তায় তাই একটু ভিড় কম।

ইন্দ্রভূষণ একভাবে বকবক করে চলেছে। মাঝে-মাঝে আমার আগামী উপন্যাস সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করছে। "সম্পাদক হরিহর দে যখন বিনোদন সংখ্যায় তোমাকে উপন্যাস লিখতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে তখন এবার তোমাকে স্পেশাল খেলা দেখাতেই হবে। বিনোদনের সময় মানুষের মেজাজই অন্যরকম—তোমার পক্ষে সুবর্ণসুযোগ।"

আমি দ্বিমত হচ্ছি না ইন্দ্রভূষণের সঙ্গে। সে বলছে, জীবনে যেমন ঘটে থাকে ঠিক তেমন লিখে আসর মাত করতে হবে আমাকে। ইন্দ্রভূষণ সাজেস্ট করছে, আমি এবার মাধুরীকে নিয়েই লিখি না কেন? এই যে মাধুরীর অসীম ভগবতবিশ্বাস, এই যে সাহিত্যের প্রতি গভীর টান, এই যে স্বামীকে তার কাজ করতে দেবার জন্যে নিজের অপরিসীম ত্যাগ, এইসব দিয়েই তো একটা চমৎকার উপন্যাস হয়ে যায়।

"এই লেখায় তোমাকে তেমন ভাবতে হবে না, ব্রাদার। ভগবান নিজেই উপন্যাসখানা রচনা করে তোমার এবং মাধুরীর বুকের মধ্যে ফিক্সড্ ডিপোজিট রেখেছেন। মাধুরীর বুকে যা আছে তার সবটাই তোমার জানা।"

মন্দ বলছে না ইন্দ্রভূষণ। আমি স্বীকার করছি, ভগবানের রেডিমেড উপন্যাসগুলো স্মৃতি থেকে কাগজে লিখে ফেলা অনেক সহজ। এই জন্যেই তো কথাসাহিত্যের কারখানায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এতো মূল্য।

ইন্দ্রভূষণ বলেই ফেললো, "এই একটা কারণেই এক এক সময় মনে হয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা গল্পলেখকের পক্ষে ভাল নাও হতে পারে। নিজের কলম নিয়ে সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকলে গল্প সম্বন্ধে ধারণা হবে কী করে? বই? সেতো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ব্যবসা হয়ে গেলো, একজনের এঁটো চিন্তাগুলো তুমি চেখে দেখলে, সেখানে ভার্জিন চিন্তা কই, যে-চিন্তা কারও স্পর্শে কলুষিত হয়নি।"

ইন্দ্রভূষণ খুব ব্রাইট কথা বলছে। "তুমি কি ইদানীং কুমারেশ মিত্তির অথবা অমরেশ গাঙ্গুলীর সাহিত্যসন্ধ্যায় ঘন ঘন যাতায়াত করছো?"

"মোটেই নয়, ব্রাদার। তবে এক এক সময় এক একটা অঘটন

ঘটে যায়। আমারও একটা অঘটন ঘটে গিয়েছে হঠাৎ।"

ইন্দ্রভূষণ কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বলতে আগ্রহী নয়। "তোমার বিষয় নয়—এটা অমরেশ গাঙ্গুলীর কাপ অফ টি! তুমি তো মানুষের দার্শনিক অনুভূতির গভীরে যেতে চাও। আর এটা একটা ঘৃণার ঘটনা।"

রিকশ চলছে। আর আমি ইন্দ্রভূষণ সম্বন্ধে আবার আগ্রহী হয়ে উঠছি। ইন্দ্রভূষণ বলছে, "ওই যে আমাদের হেডঅফিস থেকে আসা নরহরি ব্যানার্জি। সমস্ত ডিপার্টমেন্ট যাকে স্যর স্যর করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। যার বিরুদ্ধে কিছু মুখ ফুটে বলার সাহস কারও নেই। আরে বাবা, অফিসের অডিটর কি সবাইকে জেলে পাঠিয়ে অফিস খালি করে ফেলবে!"

"লোকটাকে আমি প্রাণ থেকে পছন্দ করতে পারছিলাম না, যদিও লোকটা আমার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করে। এরপর এই কাণ্ডটা ঘটে গেলো।"

কী ঘটলো ইন্দ্রভূষণের জীবনে? ইন্দ্রভূষণ একটু নিচু গলায় বললে, "এ তো ট্রাম-বাস নয়! রিকশয় বসে ব্যাপারটা তোমাকে বলা যায়, যদিও তোমার গল্পে এসব সাবজেক্ট কোনো কাজে লাগবে না।"

আমি শুনতে চাই ব্যাপারটা। বাইরের জগতের সঙ্গে ইন্দ্রভূষণ আমার অন্যতম যোগসূত্র।

ইন্দ্রভূষণ জানালো, ওই অডিটর নরহরি ব্যানার্জি বলেছিল, শনিবার হাফ-ডে ছুটির পর একটু বেরুবে। হাজার হোক বাইরের লোক, অনেকদিন সরেজমিনে কলকাতা দেখা হয়নি।

ইন্দ্রভূষণ যথারীতি এই রিকশ ভ্রমণের প্রস্তাব দিয়েছিল। ধীরে সুস্থে কলকাতা দেখার এইটাই শ্রেষ্ঠ পথ। একটা স্বাস্থ্যবান রিকশওয়ালা এবং একটা নতুন গাড়ি হলে তো কথাই নেই।

"এই রিকশ চড়তে চড়তে আমরা ব্রাদার সেই দুপুর বেলায় হঠাৎ একটা গলির মধ্যে বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে এসে পড়েছি। তখনই অস্বস্তিকর ব্যাপারটা ঘটলো।"

অডিটর নরহরি বান্যার্জি এই খাবারের দোকান দেখেই জিজ্ঞেস করলেন রাস্তার নাম কী। নাম শুনেই লোকটা মুহূর্তে পাল্টে গেলো। বললো, "এখানেই নামা যাক।"

ইন্দ্রভূষণ বললো, "আমরা তো সেই রিপন লেনের বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে নেমে পড়লাম। বুঝলাম, জায়গাটা দিল্লীর নরহরির

অজানা নয়।”

নরহরি তখন ইঙ্গিতে বললেন, “একটু অ্যাডভেঞ্চার করা যাক!”

“তারপর জানো হে ব্রাদার একটা জীর্ণ মলিন সেকেলে বাড়ির একতলার দরজার সামনে আমরা হাজির। পাকা লোক ওই নরহরি। একবার বেল টিপতেই একটা লুজ গাউন পরা মেয়ে দরজার ওদিক থেকে মুখ বাড়িয়ে দিলো। নরহরি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো, তনিমা। মেয়েটা কী ভীষণ বদ, মুখের ওপর বললো, আপনি কতদিন আসেন না, ভাল থাকবো কী করে? দিল্লী অনেক সুন্দর জায়গা, কলকাতার পথঘাঠ কেন মনে থাকবে?”

“আমার দিকে হঠাৎ নজর পড়ে গেলো তনিমা নামক মহিলার নরহরি পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার ফ্রেণ্ড। মেয়েটা মোটেই খুশি হলো না। বললো, ওঁকে তো আর একদিন আসতে হবে! আপনার চিঠি আমি পেয়েছি, আপনার অ্যাপয়েন্ট রয়েছে। কিন্তু তারপর আমি ভীষণ ব্যস্ত।”

আমি শুনে যাচ্ছি ইন্দ্রভূষণের কথা। “আমার তখন ভাই ভীষণ নার্ভাস অবস্থা। শরীরে যেন পক্ষাঘাত হতে চলেছে। তনিমা তখন বলছে, তা হলে আপনি আর একদিন আসছেন। প্লিজ আসবেন কিন্তু রাগ করবেন না। তবে বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট!”

মেয়েটা ততক্ষণে নরহরিকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। “বেশ লোক আপনি! শুধু শুধু আর একজন লোককে কষ্ট দিলেন।”

আর নির্লজ্জ নরহরি বললেন, “আমি ভেবেছিলুম, আমার চিঠি পৌঁছবে না, তাই সঙ্গে এনেছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না পেলে দু'জনে একটু কলকাতা ঘুরে দেখবো, কিংবা সিনেমায় যাবো।”

এই লুজ ফিটিং গাউনে-জড়ানো রমণী-শরীর ইন্দ্রভূষণকে অবাক করে দিয়েছে। কোথায় চমৎকার একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু দরজাটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেলো ইন্দ্রভূষণের নাকের ওপর।

রিকশ এতক্ষণে ইন্দ্রভূষণ ও আমাকে নিয়ে আমার বাড়ির প্রায় কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ইন্দ্রভূষণ বলছে, “আধুনিক উপন্যাস শুরু হবার পক্ষে চমৎকার একটা সিচুয়েশন। কুমারেশ মিত্র যাকে বলেন, গল্পের হাওয়াই জাহাজের টেক্-অফ্। ওই তনিমা থেকে পিকুলিয়ার একটা ঘটনা হয়তো বুনে ফেলা সম্ভব। আমি শুধু কয়েক মুহূর্ত ওই দেহটাকে এবং দেহের মালিকের চকিত চাহনি দেখছি। কাজের কথা

:লাও শুনেছি। ওই নরহরিও এতদিন শুধু অডিটর ছিলেন, হঠাৎ ামার চোখের সামনে ক্যারেকটার হয়ে উঠলেন। লোকটার লাজলজ্জা ল কিছু নেই। কোন সাহসে উনি আধা-চেনা একটা লোককে নিয়ে ই বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে চরিত্র বিসর্জনের জন্য রিকশ কে নেমে পড়লেন ?"

ইন্দ্রভূষণ ঠিক করেনি। ওইসব জায়গায় না-যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। াব কথাই বন্ধু হিসেবে ওকে আমার বলা উচিত। কিন্তু আমার বন্ধু ান আমাকে একটা নতুন গল্পের ইঙ্গিত দিতে চায়। এখন তো য়-অন্যায় বিচারের সময় নেই।

তবে সমস্ত ব্যাপারটা মাথায় ঢুকবার আগে আমি ইন্দ্রভূষণকে াছি, "তুমি গল্পের শুরুটা এখনই অন্য কাউকে দিও না। আমি ্টু হাত খালি হলে ভেবে দেখবো।"

ইন্দ্রভূষণ তখন বললো, "যদি ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হয় তাহলে াকে আরও জিজ্ঞেস কোরো। আমি যতটা পারি সব ডিটেল দিয়ে বা—এই তনিমা মেয়েটা কেমন দেখতে, কত তার বয়স, কী তার টে, চোখগুলো কেমন, চাহনি কীরকম—যেসব বিবরণ তোমরা ার গোড়াতেই টপাটপ দিয়ে দাও।"

লেখার টেবিলে আমি আবার সাধনা শুরু করেছি। ব্রহ্মবিন্দু এবং তবিন্দু উপনিষৎ থেকে আত্মানুসন্ধান সংক্রান্ত স্তোত্রগুলির প্রতি ী আজই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মন দুই প্রকার—শুদ্ধ অশুদ্ধ। কামসঙ্কল্প মন অশুদ্ধ এবং কামবিবর্জিত মন শুদ্ধ। মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ—বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের হেতু, এবং ষয় মন মুক্তির হেতুরূপে কল্পিত হয়।

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ"—আমার বিনাশ নাই ত্তিও নাই; আমি বদ্ধ নহি সাধকও নহি; আমার মুক্তির ইচ্ছা বং আমি মুক্তও নহি—এইরূপ অনুভূতি হইলেই যথার্থ জ্ঞান হয়। াধুরীই তো আমার সাহিত্যজীবনের প্রযোজক। সে যখন চাইছে, মহৎ কোনো ভাবনায় মানুষকে উদ্দীপ্ত করি, সেরকম কিছু গড়ে াই আমার কর্তব্য।

মাধুরী আমার এই লেখার জায়গাটুকু সাধনাস্থানের মতোই পবিত্র

করে রেখেছে। সেখানে রামকৃষ্ণ, শ্রীমা, বিবেকানন্দর রঙীন ছবি সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে ধূপধুনো জ্বলছে।

আত্মানুসন্ধানের শেষ শ্লোকটিও আমার কানে ভাসছে: সর্বভূতা ধিবাসং যদ্ভূতেষু চ বসত্যপি—যিনি সকল জীবের নিবাসস্থল, সকলের অনুগ্রহকর্তারূপে যিনি নিখিল জীবের মধ্যে বাস করেন, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব—আমি সকল জগতের স্বয়ংপ্রকাশিত আত্মা।

আমি এই পবিত্র পরিবেশেই কল্পনার গভীর সমুদ্রে ডুব দি চাই। হে সৃষ্টির দেবী সরস্বতী, দয়া করো, মুখ তোলো ভক্ত পা চাও। আমাকে নতুন এক উপন্যাসের ইঙ্গিত দাও যা পাঠ করে সম্পাদক পাঠক, সমালোচক সবাই স্বীকার করবে আমার অসীম সম্ভাবনা, য অপ্রত্যাশিত তাও সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য এই লেখকের কলম থে বেরিয়ে আসে।

আমি কত কি ভাবছি। আমি ভগিনী নিবেদিতার বাণীগুলি অতি সাবধানে দাগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি এখন কোনো আলোর সন্ধান পাচ্ছি না। নিবিড় ঘন আঁধারে আ যেন পথভ্রষ্ট পথিকের মতো আকাশে বিজলী রেখার জন্য অপে করছি।

আমি বিনম্র হৃদয়ে ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীকে প্রণাম কর অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু কোনো আলোর ইঙ্গিত আসছে না।

আমি এবার একটু ব্যঙ্গ শুরু করতে চাই। আমি আমার নোট বই ঝটপট কয়েকটা লাইন লিখে ফেলছি। হে দাড়িওয়ালা কাশ্যপগো ক্ষ্যাপাঠাকুর, আমার স্ত্রী মাধুরী আপনাকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমিও সেই ছোটবেলা থেকে আপনার ভ কিন্তু আপনাকে আমি এই সাহিত্যপ্রচেষ্টার অভিভাবক করে তুলি আপনার অবশ্য এখন প্রচণ্ড পসার—ট্রামে-বাসে-ট্যাক্সিতে, পান-বি সিগারেটের দোকানে, সিনেমায়-থিয়েটারে-যাত্রায় সর্বত্র মানুষ আপন স্পেশাল সম্মান দিচ্ছে। লাখ লাখ কোটি কোটি ধূপ আপনার সাম প্রতিমাসে পুড়ছে, চ্যাটার্জি মহাশয়। আমি কিন্তু এখন নিজেই শ্র সিংহাসনে বসে আমার গল্পের চরিত্রদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চ এখন আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করবেন না। আপনি সারাজীবন কমপ্রোমাইজ করেছেন। মিসেস চ্যাটার্জি, আপনিও ভাগ্যব কেত্তনের চাপে পড়ে মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েও আ বিশ্বসংসারের শ্রীমা হয়ে গেলেন। এদেশে সবই হয় কীর্তনের

র আধুনিক নাম বিজ্ঞাপন। মিস্টার এন এন দত্ত, আপনি দুটো কই রক্ষা করেছেন। আপনি ধর্মধর্ম করে আকুল, আবার সমাজকে চাও ডাক তুলতেও ব্যাকুল। কারও স্বামী না হয়েও আপনি যে মীজী তা তো আগেই বলেছি।

হে মহাপুরুষগণ, আমাকে পথের সন্ধান দিন, আমাকে নতুন কটা কাহিনীর সন্ধান দিন, যা আমাকে এই আধুনিক সমাজে প্রতিষ্ঠা বে।

ঘুম সরিয়ে রাত জেগে, কখনও ঘুম তাড়িয়ে ভোরবেলায় আমি গল্পের ট ভেবেই চলেছি। মাধুরী এই পর্যায়ে আমাকে কখনও বিরক্ত রে না, লেখা সম্বন্ধে অকারণ কৌতূহল সে দেখায় না। সে জানে, যে রা দেয় না তাকে ধরবার জন্যেই আমি সারাক্ষণ উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।

দাগ কাটার কথা উঠেছে। কিন্তু হাজার হাজার গল্প-উপন্যাস ড়ে পড়ে অভিজ্ঞপাঠকের বুক পাষাণ হয়ে গিয়েছে, ওখানে দাগ কাটা ড় কঠিন। একবার এই কথা মাধুরীকে আমি বলেছিলাম। কিন্তু সে ত্তর দিয়েছিল, "পাথরে ভয় পাবার কিছু নেই যদি বুকের পাথরের াওলা ফেলবার বিদ্যেটা তোমার জানা থাকে, যেমন জানতেন বেকানন্দ, যেমন জানতেন শরৎচন্দ্র।"

আমি কয়েকদিন ধরে নীরব সাধনা করে চলেছি, টেবিল থেকে ঠ না বললেই হয়, তবুও একলাইন লেখা হচ্ছে না আমার। আমি বেকানন্দর বাণী এবং আধুনিক নিটোল একটি গল্পের সমন্বয় করতে রছি না কিছুতেই। মানুষ কী করে অপ্রত্যাশিত চমকের স্রষ্টা হয় আমার জানা হলো না। অথচ আমি সম্পাদকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ রছি।

মাঝে-মাঝে মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যেই আমি ইন্দ্রভূষণের ওই ভজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেছি। রিপন লেনের প্রাচীন, বিবর্ণ, স্কারবিহীন বাড়িটায় একমাত্র যার রিপেয়ার প্রয়োজন নেই সে তনিমা হিড়ি—নবীনা শরীরটা ঝকঝক করছে।

মহাপুরুষদের মহাভাবনা এবং আধুনিক যুগের সুখসর্বস্বতার সহবস্থান আমার লেখনিতে কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। আমি নোট খছি এবং নোট কাটছি। গল্প-উপন্যাস লেখা থেকে শক্ত কাজ থিবীতে আর নেই। তিন দিন তিন রাত ব্যর্থ চেষ্টার পরে একটু বসর নেবার জন্যেই আমি নোটবইয়ের এক প্রান্তে ইন্দ্রভূষণের

স্মৃতির আলোকে একটা রেখাচিত্র আঁকতে শুরু করেছি। পাঁচফু ছ ইঞ্চি হাইট, একটা মাঝারি আঁটসাঁট রমণী শরীর, একটা ঢলঢলে আলখাল্লা। আমার কল্পনা আর এগোতে পারছে না। আমি সুগঠিত রমণী-শরীরের ওই ঢলঢলে আলখাল্লার একটা রাজকীয় নীল রং কল্পনা করে নিয়েছি। সামান্য একটা রঙের বিবরণের জন্যে ইন্দ্রভূষণকে ডেকে পাঠানোর কোনো মানে হয় না। গল্প লেখক তো ব্যাঙ্কশাল কোর্টের রিপোর্টার নয়। তাকে তার কল্পনার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। আমি রিপন লেনের ওই রমণীকে যে-কোনো রঙের আলখাল্লায় ভূষি করতে পারি। আমি ধরে নিচ্ছি তার দেহের সমস্ত কাপড়া নীল নয়—সাদার ওপর অসংখ্য ছোট ছোট রয়াল ব্লু ফুল—গা যা ফোটে না, কিন্তু সারাক্ষণ মেয়েদের শরীর-জড়ানো কাপড়ে ফুটছে।

আমি ক'দিন ধরেই তনিমার কথা ভাবছি, কোনোরকমে খাঁচা বন্দী করে ওকে একবার গল্পের আসরে টেনে আনলে কী হতো ?

কিন্তু কোথায় যেন আমার মনের ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, তনিমার ফটোটা আমার কল্পনায় ডার্করুমে ওয়াশ করতে গিয়ে কে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমি এখনও মন স্থির করিনি। দেবী সরস্বতী অনুগ্রহ ক আমাকে শেষ পর্যন্ত যা দান করবেন আমি তাই মাথা পেতে নেবো কিন্তু তনিমার ওই প্রাথমিক আবির্ভাব দৃশ্যটাও মন্দ লাগছে না।

কত মানুষ আমার আহ্বানে আমার কল্পনার পর্দায় এসে ধরা দে সৃষ্টির সিংহাসন থেকে আমি তাদের যথাসর্বস্ব দেখতে পাই। কি এবার কী যে হলো! আমি একটা মেয়ের ঢলঢলে গাউনের ছবিটা স্পষ্ট করে আঁকতে পারছি না। আমি শুধু রিপন লেনের ওই বিশু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার পর্যন্ত ভালভাবে দেখতে পারছি। ইন্দ্রভূষণকেও এ সব কথা বলা চলবে না। হয় সে হাসবে, না হয় ভাববে আমার ক্ষমতা শুকিয়ে আসছে। অফিসে ফিরে গিয়ে আবার কেরানিগিরি মন দেওয়াই আমার উচিত ছিল।

এখন দুপুর বেলা। আমার সব সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দি মাধুরী অনেক আগেই অফিস চলে গিয়েছে। ফ্রেমে বাঁধা ঠাকুর, শ্রী ও স্বামীজী আমার ওপর অবিরত কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করছেন, কিন্তু আ হঠাৎ বিপন্ন বোধ করছি। আমি কী সত্যিই শেষ হতে চলেছি ? লেখ হিসেবে আমি কী নতুন পথে মোড় নিতে পারবো না ? অপ্রত্যাশি

কিছু কি ঘটবে না আমার সাহিত্যজীবনে? পুনরাবৃত্তির গহ্বরেই কি আমি শেষ পর্যন্ত চিরবন্দী হয়ে থাকবো?

এতো সাধ্যসাধনার পরেও কোনো মহাপুরুষ তো এখনও পর্যন্ত আমার ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করলেন না। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, আপনি তো সারাক্ষণ অকাতরে আমার ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করে চলেছেন, কিন্তু একটা পছন্দসই গল্পের কাঠামো তো আমায় এবার উপহার দিলেন না।

দিনের পর দিন অবিরাম চিন্তায় ব্যর্থ হয়ে আমি একসময় অস্থির অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাড়ি ফিরতে আমার যত দেরিই হোক মাধুরী ভাববে আমি লাইব্রেরিতে গিয়েছি। ঘরে ঢোকার কোনো অসুবিধে নেই, আমাদের আলাদা-আলাদা চাবি আছে।

আমি বাড়ির সামনে থেকে এই দুপুরে একটা বাসে উঠে পড়েছি। এই বাস আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জেনে আমি এখনও অস্থির বোধ করছি! আমি কি বাসওয়ালাকে বলবো, যে যেখানে যেতে চায় তাকে অবশ্যই সেখানে নিয়ে যাওয়া আপনার কর্তব্য নয়। আপনার নিজেরও কিছু দায়িত্ব আছে! কিন্তু বাসের কণ্ডাক্টরকে কে এই সব কথা বলবে?

বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে আমি একটা রিকশর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি এখন কোথায় যেতে চাই? কী পথ নির্দেশ দেবো রিকশওয়ালাকে? ঠিকানা আমার জানা নেই, কিন্তু রাস্তার নাম আমি জানি। সেই পুরনো বাড়ির লাগোয়া বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারও আমার অজানা নয়।

রিকশওয়ালার এখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়। কিন্তু আমি কোথায় যেতে উৎসুক তার ইঙ্গিত পেয়ে সে একটু উৎসাহী হয়ে উঠলো।

আমি নিজে কী করছি আমি বুঝছি না। অদৃশ্য কোন এক শক্তি আমাকে অবশ করে যেন নিষিদ্ধ কোনো ঠিকানার দিকে টানছে।

আমি রিকশয় বসে তনিমার মুখচোখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখনও কল্পনার চেষ্টা করছি। ইন্দ্রভূষণ আমাকে যে কী বিপদেই ফেললো। রাস্তার নাম, দোকানের নাম এসব কিছু না বললেই সে ভাল করতো। তা হলে আমি হয়তো এমনভাবে এখানে চলে আসতে পারতাম না।

আমি অনেক দূর থেকেই বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নিষ্প্রভ সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি। অনেকদিন সাইনবোর্ড রঙ করা হয় না—চেনা বাউনের বোধ হয় পৈতে লাগে না। দোকান থেকে একটু দূরত্ব রেখেই আমি নেমে পড়ে রিকশওয়ালাকে বিদায় করলাম।

আমার বুকের মধ্যে একটা নিষিদ্ধ উত্তেজনার বাজনা বাজতে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় আমি আগে কখনও পড়িনি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ায় একটা ধোপার ইস্ত্রি কারখানা, একখানা চায়ের স্টল, একটা ফাটা টায়ার সারানোর দোকান আমি কত সহজে পেরিয়ে এলাম। আমি কারও দিকে তাকাচ্ছি না। আমার ভয়, চোখাচোখি হলেই ওদের অনেকেই আমার উদ্দেশ্যটা বুঝে নেবে। আমি এই মুহূর্তে কারও কাছে ধরা পড়তে রাজী নই। আমাকে এখন অভিনব এক প্লটের সন্ধান করতে হবে।

রাস্তার মোড়ে হতশ্রী মিষ্টির দোকানটা আরও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি। দোকানের পিছনেই বাড়িখানা, শতাব্দীর মুখে ছাই দিয়ে কী করে এই সময়ে এখনও টিকে রয়েছে তা ভগবানই জানেন।

মিষ্টির দোকানের কর্তারা বোধ হয় এই সময়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারতে বাড়ি গিয়েছেন। একটা এগারো বারো বছরের হাফ-প্যান্ট পরা ছোকরার চোখের রাডারে আমি কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম।

"মিষ্টি খাবেন?" সে আমার কাছে এসে জানতে চাইলো। মিষ্টির দোকানের সেলসম্যানেরা সাধারণত এতো তৎপর হয় না। আমার মিষ্টিতে আগ্রহ নেই জেনেই যেন তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেলো। আমি তখন দোকানের পিছনে বাড়ির ব্যাপারটা খোঁজ-খবর করছি।

বর্ণনা শুনেই ছেলেটির উৎসাহ ও উদ্যম আরও বেড়ে গেলো। এই দোকানের পিছন দিকটাই যে আমার লক্ষ্যস্থল তা আমি ছেলেটির ইঙ্গিতেই বুঝে গিয়েছি।

ছোকরা এবার সন্ধানী দৃষ্টিতে আমাকে যাচাই করতে চায়। "ওখানে কী দরকার? ওখানে তো কোনো দোকান নেই।"

বাছা, কেন আমায় ছলনা করছো? ওখানেও যে আজব দোকান আছে তা তোমার এবং আমার অজানা নয়। কিন্তু তুমি আমাকে একটু বাজিয়ে নিতে চাইছো—যাতে ওইসব শান্ত জায়গায় অযথা কোনো হৈ-চৈ না বাধে। এ-পৃথিবীতে আমরা সবাই একটু শান্তি চাই। আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম, পানশালার মালিক থেকে

আরম্ভ করে নিকৃষ্টতম পতিতারা পর্যন্ত সবাই নিরন্তর শান্তি চায়। শান্তি না-থাকলেই প্রথম ঝামেলা হয় পথভ্রষ্ট মানুষদের নিয়ে। আমি জেনেছি, কিছু একটা ঘটলেই পথভ্রষ্ট মানুষ নিজের বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মানুষ যখন ঘরে ফেরার জন্যে ব্যগ্র তখন তার বিনোদনে বিন্দুমাত্র রুচি থাকে না।

বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছোকরাকে একটা কিছু সারপ্রাইজ দিতেই হবে। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে আমি এখানে উটকো আগন্তুক নই।

ওই বাড়ির মধ্যে আমার কী প্রয়োজন, কখন প্রয়োজন ইত্যাদি প্রশ্নমালা মুহূর্তে স্তব্ধ হলো। আমি শুধু বললাম, "তনিমা!" এবার মন্ত্রের মতো ফল হলো, সমস্ত প্রশ্নবাণ বন্ধের শেষে এবার বালকের মৃদু ক্ষমাপ্রার্থনা।

ছেলেটি বললো, "লোহার এই গেট পেরিয়ে একটু হেঁটে বাঁদিকে গিয়ে ওই যে বড় দরজা দেখা যাচ্ছে।"

একটু লজ্জা-লজ্জা লাগছে—ওই ছোকরাটি যেন সব বুঝে নিয়েছে। একটু পরেই যথাস্থানে সে গরম চা পাঠিয়ে দিতে পারে আমি যদি লক্ষ্যস্থানে প্রবেশের আগে আগাম ইচ্ছা প্রকাশ করে যাই।

আমি কিন্তু শক্ত হবার চেষ্টা করছি—আমি বালককে বুঝিয়ে দিচ্ছি, গায়ে পড়ে সেবা-প্রস্তাবের কোনো প্রয়োজন নেই। পানীয় সংক্রান্ত যা কিছু নির্দেশ তা যথাসময়ে যথাস্থান থেকেই আসবে!

আমি ধীর পদক্ষেপে সেই বিশাল এবং বিবর্ণ কাঠের দরজার সামনে চলে এসেছি। ইন্দ্রভূষণের বর্ণনা বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে! একসময় এখানে যে আভিজাত্য ছিল তা বর্মা কাঠের এই দরজার আকার ও নকশা দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। কিন্তু অনেকদিন কোনো যত্ন হয়নি। তনিমা লাহিড়ির মতো রমণীরা যে কোনোদিন এখানে বসবাস করবেন তা এ-বাড়ির নির্মাতা নিশ্চয় কল্পনাও করেননি। মানুষের মতো প্রত্যেক বাড়িরও একটা জন্মপত্র থাকা প্রয়োজন। কোন বাড়ির জন্যে কী ভবিষ্যৎ তোলা আছে তা কেউ জানে না।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি দরজার বেল বাজিয়ে বসে আছি। উত্তর আসতে একটু বেশী সময়ই যেন লাগছে। লাগতেই পারে—আমি তো আগাম কোনো খবর না দিয়েই অনাহূতের মতো এখানে এসেছি।

এবার কে যেন দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার অনভিজ্ঞ

বুকটা এবার ধকধক করছে।

ভিতর থেকে দরজার খিল খোলা হলো। একটা রমণী-মুখ বেরিয়ে এলো। সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ। এই কি তনিমা! আমার এখানে আসবার সমস্ত উদ্দেশ্যই বিফল হতে চলেছে। আমার মনের ডার্করুমে তনিমার যে-ছবিটা সযতনে লালিত হচ্ছিল তার ওপর অযথা আলোর ঝলকানি পড়ে সব মুছে গেলো!

তবু ছবির ফ্রেমটা ভারি সুন্দর—কোনো বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকারের একখানা স্মরণীয় কমপোজিসনের মতো। প্লাস্টারবিহীন দেওয়ালের বুকে একটা দামী বিশাল দরজা। বাইরে এক অপরিচিত কিন্তু সলজ্জ আগন্তুক। আর অন্যদিকে দুটি দরজার ফাঁক দিয়ে একটি রমণীর মুখ। মুখটি রমণীয় হলে আমি যে-দৃশ্যটা ক'দিন ধরে কল্পনা করছিলাম তার সঙ্গে মিলে যেতো। কিন্তু এখানে কেবল রুচিহীন বসন্তের নির্দয় ধ্বংসচিহ্ন।

"কী চাই? কেন দরজার বেল টিপেছেন?" রমণীর প্রশ্নে বেশ বিরক্তি।

বিরক্তি অবশ্যই হতে পারে, আমিও মনে-মনে বুঝি। আমি এই মিষ্টি শীতের দুপুরে অর্গলবদ্ধ গৃহকোণে আমার ইচ্ছামতো বিশ্রাম সুখ লাভ করতে চাই, সেই সময় তুমি কে বটে যে দরজার বৈদ্যুতিক বেল বাজাবার স্পর্ধা রাখো?

আমি জানি, গৃহবাসী তো দূরের কথা, দোকানদারেরও এই অলস সময় নিজেকে ব্যবসা থেকে গুটিয়ে নেবার স্বাধীনতা আছে।

আমি বললাম, একটু চাপা গলায়, "তনিমা!"

"কে?" বসন্ত-মুখের অধিশ্বরী খ্যাঁক করে উঠলো।

যথেষ্ট সাহস নিয়ে আমাকে নামটা আবার উচ্চারণ করতে হলো।

এবার একটু ফল হলো। রমণীর প্রশ্ন: "আপনার সঙ্গে আগে থেকে কোনো কথা হয়েছিল?"

কথা তো কিছুই হয়নি। হঠাৎ বোকার মতো বলতে গেলাম, ব্যাপারটা একটু আরজেন্ট।

তারপর বুঝলাম, কথাটা একটু লোকহাসানো হবে—তনিমা যে-কাজেকর্মে লিপ্ত সেখানে কোনো আরজেন্সি নেই। সম্পাদক হরিহর দে গত বছরে তাঁর বিনোদন সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, "সমস্ত সৃষ্টির মূলেই আনন্দের উপস্থিতি, কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যস্ততার সঙ্গে আনন্দের অহিনকুল সম্পর্ক। বিদেশে আজকাল ফাস্টফুড চেনের রমরমা, কিন্তু ইহা বোধহয় পশ্চিমী সভ্যতার পরস্পর বিরোধিতার আর একটি

অনিবার্য প্রকাশ।"

আমি বুঝছি, তনিমার সঙ্গে এইভাবে আমার খুশিমতো সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না। ঐ বসন্তের দাগভরা মুখ আমাকে স্রেফ বলে দিয়েছে—এটা চায়ের দোকান নয় যে যে যখন খুশি হুট করে ঢুকে পড়বেন। বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এখানে কারও সঙ্গে দেখা হয় না।

এই ব্যবহারই বোধ হয় আমার প্রাপ্য। আমি তাতেও অসন্তুষ্ট হতাম না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম, মুহূর্তের জন্য সেই মানুষটিকে দেখতে যে ক'দিন আগে ইন্দ্রভূষণের চোখের সামনে এই দ্বারপ্রান্ত থেকেই একজন প্রত্যাশিত অতিথিকে পরম সমাদরে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল।

আমার বলার কিছু নেই। খাবারের দোকানের সেই প্রহরী ছেলেটি এবার আমাকে বিতাড়িত হতে দেখে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় খারাপ ধারণা করবে। ভাববে, পৃথিবীটা বাজে লোকে বোঝাই!

আমি কিন্তু খালি হাতে ফিরতে আগ্রহী নই। বললাম, "ওঁকে এখন জ্বালাতন নয়। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট..."

আমার সম্বন্ধে আবার বোধ হয় নতুন করে চিন্তা শুরু হয়েছে। আমার একটা নাম আমি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি, যে-নামটা আমি এই উপন্যাসে ব্যবহার করতে চাই। অনিবার্য চৌধুরী। এই চৌধুরী টাইটেলটা সমস্ত ভারতবর্ষের লেখকদের বড় প্রিয়। আসমুদ্রহিমাচলে সার্কুলেশনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—সমস্ত ধর্ম এবং কাস্ট-এ চৌধুরীর বিপুল জনপ্রিয়তা।

আমি ভুল করেছি, বুঝতে পারলাম। মুহূর্তের মধ্যে রমণী ফিরে এলো—"আপনি কে? আপনাকে তো চিনি না। আপনি কেন এই অসময়ে জ্বালাতন করতে এসেছেন?"

অনিবার্য চৌধুরীর একটা নির্ভরযোগ্য পরিচয় প্রয়োজন—"নরহরিবাবুর কাছ থেকে একটা মেসেজ!"

এখানেও তাহলে ইনট্রোডাকসন লাগে, যেমন ব্যাঙ্কে আজকাল অপর একজনের পরিচিতি ছাড়া অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না!

"নরহরিবাবু খবর পাঠিয়েছেন! কোনো চিঠি আছে?" জানতে চাইছে বসন্তমুখী দূতী!

চিঠি নেই। সুতরাং চলেই যেতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভিতর থেকে বোধহয় নতুন কোনো নির্দেশ এলো!

"ভেতরে আসুন। বসুন। দিদি খেতে বসেছেন। একটু অপেক্ষা

করুন

আমি ভিতরে ঢুকে পড়েছি এবং দরজায় সঙ্গে-সঙ্গে একটা তালা লেগেছে। আমি এখন সাময়িকভাবে বন্দী। আমার একটু অস্বস্তি লাগছে। হঠাৎ কোন দুর্মতিতে এই অস্থানে তনিমার সন্ধানে ছুটে এসে নিজেকে এমন ভাবে ছোট করলাম? ইচ্ছে থাকলেও এখন আমার বেরিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। অলঙ্কারের দোকান ছাড়া আর কোথাও এইভাবে তালাবন্ধ হইনি।

আমি একটা অস্বস্তিকর চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে আছি। ওধারে পর্দার আড়ালে কোনো মহিলার খাবার আওয়াজ পাচ্ছি—দু'একবার চুড়ির টুং টাং শব্দও কানে এলো।

তারপর কামিনী নাম্নী রমণীর ডাক পড়েছে সুরেলা মিষ্টি গলায়। আমি ঐ কুৎসিৎমুখ রমণীর একটা নাম আন্দাজ করে নিয়েছিলাম—ভামিনী। ভামিনী সমস্ত এঁটো ডিশপত্র সরিয়ে ঘরের বাইরে বোধ হয় চলে গেলো ভিতরের এক দরজা দিয়ে।

নায়িকা এবার পর্দার আড়াল থেকে আচমকা মুখ বাড়িয়ে আমাকে বললেন, "আসছি, একমিনিট, হাতটা ধুয়ে।"

তারপর! তনিমার সগৌরব আবির্ভাবের জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি।

"নমস্কার।" তনিমা এখন আমারই সামনে। পাদপ্রদীপের সামনে শিল্পীরা প্রথম আবির্ভাবের সময় যেমন প্রথমবার বিনম্র নমস্কার জানিয়ে দুটি হাত বুকের কাছে টেনে আনে সেইভাবেই তনিমা উপস্থিত হয়েছে আমার সামনে।

আমি ঠকিনি। সেই ঢলঢলে আলখাল্লার মধ্যেই তনিমার শরীর এখনও জড়ানো রয়েছে। আমার কল্পনায় একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। রাজকীয় নীল নয়, তনিমা লাহিড়ির গাউনের রং হাল্কা পিংক। ফুল নয়—তারায়-তারায় বোঝাই হয়ে রয়েছে তনিমার দেহ-আকাশ।

তনিমার দেহের ঐশ্বর্যগুলি আমি প্রফেশনাল ধারাবিবরকের মতো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নেবার প্রয়োজন বোধ করছি। তনিমা অবশ্যই গৌরী নয়, কিন্তু তার ত্বকের লাবণ্য দেহের ব্রাউনকে বিশেষ সুষমা

দিয়েছে।

তনিমা এবার আমার খুব কাছে এসে বসেছে। তার পায়ে একটা হাওয়াই স্লিপার। এই অবস্থায় অতিথির সঙ্গে সে যে সাক্ষাতে অভ্যস্ত নয় তা তার কথা থেকেই বুঝতে পারছি।

আমি এখনও পরীক্ষাধীন রয়েছি। "আপনি নরহরিবাবুর বন্ধু?" প্রশ্ন করছে তনিমা।

নির্ভেজাল মিথ্যেকথাটা মুখে ঠিক এলো না। "সত্যিকথা বলতে কি আমি ওঁর বন্ধুর বন্ধু।"

তনিমার মুখে কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা গর্বের হাসি। "ওমা! নরহরিবাবু কি বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে আমার গল্প বলে বেড়াচ্ছেন!"

তনিমার মধ্যে এখন আমি সেই গরিমা লক্ষ্য করছি যা সাফল্য থেকে আসে, যে-সাফল্যের রঙীন আভায় লেখক, শিল্পী, ডাক্তার, উকিল, গাইয়ে সবাই উচ্ছল হয়ে ওঠেন যখন শোনেন কেউ অযাচিতভাবে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছে।

"কী শুনেছেন?" তনিমা এখনও আমাকে জেরা চালাচ্ছে।

"আপনার প্রশংসা।" আর বোধ হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। একটা মানুষ কেন এই কাজের দিনে মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে দুপুরে ছুটে এসেছে তা নিশ্চয় তনিমা বুঝতে পারছে। তনিমা যে অশিক্ষিতা নয় তাও আন্দাজ করতে পারছি—ঘরের কোণে শরৎ চাটুজ্যের গ্রন্থাবলীর কয়েকটা খণ্ড দেখা যাচ্ছে।

তনিমা বলছে, "যখন শুনেছেন তখন ভাল করেই জানা উচিত ছিল যে বেলা দুটোর সময় আমি কখনও রেডি থাকি না।"

"বিশ্বাস করুন, আমি ওসব আলোচনার সুযোগই পাইনি। আমি শুধু আপনার কথা শুনেছি।"

"উঃ! নরহরিবাবুকে বলবেন, এইভাবে যেখানে-সেখানে যেন আমার সম্বন্ধে বলে না বেড়ান। এতে আমাদের বিপদ হতে পারে। এটা চায়ের দোকান নয়। এখানে আমি একটু শান্তিতে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে চাই।"

আমি তনিমার তনুদেহটা যথাসম্ভব দেখে নেবার চেষ্টা করছি। তনিমা ততক্ষণ বললো, "বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখা-সাক্ষাৎ না হলে মানুষ বড্ড মাথায় চড়ে বসে, জানেন।"

"আমি সব বলবো, নরহরিবাবুর বন্ধুকে যিনি সেবার ওঁর সঙ্গে এসেছিলেন। আপনি তাঁকে বলেছিলেন, আবার আসতে। নরহরি-

বাবুকেও খবর দেবো উনি যখন কলকাতায় ফিরবেন। আপনি তো জানেনই উনি আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরেই দিল্লি ফিরে গিয়েছেন।"

"নরহরিবাবু আমার সম্মান বোঝেন। কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট না-করে আসেন না। আগাম চিঠি লেখেন। এক একজন গেস্ট বড্ড বেপরোয়া থাকেন—পোস্টকার্ডে যা তা লিখে বসেন, যেন পোস্টকার্ডের মতো আমাদেরও কোনো প্রাইভেসি বা লাজলজ্জা নেই। নরহরিবাবু অতি ভদ্র। কবে আসছেন এবং কখন আসছেন সেই সময়টা জানিয়ে দেন। কোনো অন্যায় দাবি থাকে না ওঁর। বাইরের লোক, কনফার্মেশন না-পেয়েই চলে আসেন। এবং বাইরের লোক বলেই ওঁকে আমি অ্যাকমডেট করি, দরকার হলে লোকাল কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট এগিয়ে-পিছিয়ে দিয়ে।"

আমি এখনও নির্বাক। তনিমা বলছে, "আমার আজ সিনেমার টিকিট কাটা। অনেকদিন পরে আমি ও কামিনী দুজনেই যাবো। এখনই বেরুবার জন্যে রেডি হচ্ছি আমরা।"

অনেকদিন পরে শখ করে সিনেমা যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে যে তাকে বিনা নোটিশে এইভাবে হয়রানি করার কী অধিকার আছে আমার?

আমি আর-একবার তনিমার শরীরটার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি স্প্রে করে দিয়েছি। তনিমা এখনও সাজগোজের দিক থেকে বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায়।

তনিমাই মুখ খুললো। "অমন গম্ভীর মুখ কেন? নরহরিবাবু আমার সম্বন্ধে বন্ধুকে কী রিপোর্ট দিয়েছেন?"

নিজের কাজে যে তনিমার প্রবল আত্মবিশ্বাস রয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি। যে-ডাক্তার অকাতরে রোগীর প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়ান, যে-লেখক সারাক্ষণ পাঠকের জয়মাল্য পান তাঁদেরও এমন আত্মবিশ্বাস থাকে।

"নরহরিবাবু অবশ্যই আপনাকে সম্মান করেন!" আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি। নরহরিবাবুর উচ্চ প্রশংসা না থাকলে আমার এখানে এইভাবে চলে আসার যুক্তি থাকে না।

"সম্মান!" এবার খুব হেসেছিল তনিমা। "আপনি বাংলা শব্দগুলোর মানে বোঝেন না!"

তনিমা তুমি জানো না কার সম্বন্ধে তুমি কী বলছো! বাংলার প্রিয়

লেখক শব্দের প্রয়োগ জানে না! তনিমা কি এখনও ভাবছে, আমার জেনুইন কোনো ইনট্রোডাকশন নেই?

দরকার নেই আমার নতুন গল্পের। তনিমা যদি সিনেমায় যেতে চায় যাক। আমি এই পৃথিবীতে কারও অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিখিরি হয়ে থাকতে চাই না।

আমি এবার খুব ভদ্র হবার চেষ্টা করলাম। বললাম, "সিনেমাটা সেরেই আসুন। আপনাকে অযথা জ্বালাতনের জন্যে আমি দুঃখিত।"

আড়চোখে আমার দিকে তাকালো তনিমা। মিষ্টি হাসলো। "কথায়-কথায় অত দুঃখ পেলে চলবে কী করে?" ভারী মিষ্টি ব্যঙ্গ করছে সে। আমার মনের ভাবটা সে মুহূর্তে বুঝে নিয়েছে।

এবার কামিনীকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো তনিমা। তাকে কী সব নির্দেশ দিলো। তারপর আমার সামনে এসে সে বললো, "কামিনী একলাই সিনেমা দেখে আসুক। আমার টিকিটটা নষ্ট হবে, পরে কোনোদিন আপনি একটা ভাল ছবি দেখিয়ে দেবেন।"

"অবশ্যই, অবশ্যই। খুব ভাল একটা ছবি, ঠাণ্ডা ঘরে দেখিয়ে আনবো!"

আমার কথা শুনেই তনিমা হেসে গড়িয়ে পড়লো। "আমাকে নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে সিনেমায় যেতে কেউ রাজী নন! নরহরিবাবুও নন। কোনো চেনাজানা লোকের সঙ্গে যদি আপনাদের দেখা হয়ে যায়! সঙ্গ দিতে পারবেন না, সিনেমার টিকিট কিনে দিলেই আমি সন্তুষ্ট। বুঝলেন মশাই। একি ঘরের বউ যে পাশে বসিয়ে ছবি দেখিয়ে আনন্দ পাবেন!"

কামিনী নামক রমণী আর সময় নষ্ট না করে তখনই সিনেমা দেখতে চলে গেলো। আমি ক্রমশ অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছি। এখান থেকে পালাবার একটা সুযোগ পেলেই যেন ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতাম। চলে যাবার একটা সুযোগ এতো কাছে এসেও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আমার এখন বেরুবার কোনো উপায় নেই। ঘরের দরজার ভিতর থেকে আবার তালা পড়েছে। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে তনিমা আবার উধাও হলো।

আমি ভাবছি, এই সময় টুপ করে সরে পড়লে খুব ভাল হতো? কিন্তু তা তো সম্ভব হবে না। ঘরের ভিতর থেকে তালা লাগানো রয়েছে। লক-আউট অনেক শুনেছি, কিন্তু এখানে নিজের দোষেই আমি লক-ইন হয়ে বসে আছি।

কেন এরা এইভাবে সারাক্ষণ তালা লাগায়? নিশ্চয় নিরাপত্তার কোনো প্রশ্ন আছে। অথবা যিনি এসেছেন তাঁকে সুরক্ষা দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা যাতে অন্য কেউ হুট করে জ্বালাতন না করে।

আমি নিজের চোখে তনিমার সাম্রাজ্য দেখে নিচ্ছি। তার দেহটা সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। এবার বোধহয় আমার কল্পনার অস্পষ্টতা কেটে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে সুদেহিনী তনিমাকে এখন আমি নায়িকার সিংহাসনেও বসাতে পারি।

আমার মনে পড়ছে, কোথায় যেন শুনেছিলাম, অতিমাত্রায় ডিটেলের দিকে নজর দিতে গিয়েই একালের কথা-সাহিত্য পাঠকেরা বিরক্তি উৎপাদন করছে। উপন্যাস ইজ উপন্যাস—ডকুমেণ্টারি ছবি নয় যে প্রত্যেক চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে। মনে করে, তনিমা নামে এক কলগার্লের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট। সে চুপচাপ থেকে খুব সাবধানে পরিচিত পুরুষদের মধ্যে প্র্যাকটিশ করে। সে নিজের গৃহকোণকে কোনোক্রমেই চায়ের দোকানের মতো পাবলিক প্লেসে পর্যবসিত করেনি যে খরিদ্দার যখন খুশি ঢুকে পড়বে এবং হুকুম করবে। সময় এবং অতিথি দুই সম্বন্ধেই তার খুঁতখুঁতুনি আছে।

এই খুঁতখুঁতুনির নিশ্চয় অনেক কারণ আছে—হয়তো তনিমার ঔদ্ধত্য। সে মার্কামারা হতে চায় না, হৈ-চৈ এড়িয়ে চলতে চায় সে। পুলিশ ইত্যাদির গোলমালে না পড়বার জন্যেই সে ঘরের ভিতর থেকেও তালার ব্যবস্থা রেখেছে। হয়তো তনিমার অতিথিরাও এই রকম প্রত্যাশা করেন—তাঁরা হট্টগোল পছন্দ করেন না।

লেখক হিসেবে আমার যা জানবার—যেহেতু গল্প-উপন্যাসের বাইরে আমি কোনো কলগার্লের সঙ্গে কখনও পরিচিত হইনি—তা জানা হয়ে গেলো। এই তো যথেষ্ট। আমি বুঝলাম, এই সব মেয়েরা সবাই নোংরা কথা বলে না, তাদের মুখের গোড়ায় সারাক্ষণ সিগারেট এবং মদের গেলাশ থাকে না। তনিমারা সুশিক্ষিতা মধ্যবিত্ত রমণীর মতো সুভাষিণী এবং সুরুচিসম্পন্না হতে পারেন।

তনিমা সম্পর্কে আর কোনো বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমি ব্যস্ত নই। কিন্তু আমি তালাচাবির আওতায় পড়ে গিয়েছি। এই রমণীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে এখনই চলে যাবার পথও বোধহয় বন্ধ। তনিমা নিশ্চয় অন্য কিছু গুরুতর সন্দেহ করে বসবে।

সন্দেহর কত কি সম্ভাবনা রয়েছে। থানার লোক, ডিটেকটিভ, এনফোর্সমেণ্ট ইনস্‌পেকটর। মায় আজকাল কাস্টম, একসাইজ,

ইনকামট্যাক্স। সবাই এখন কাজের লোক হয়ে উঠছেন—শিকার সন্ধানে সবাই এইসব মার্কামারা জায়গায় এসে পড়েন।

"দেরী হয়ে গেলো," তনিমা করজোড়ে একটু ক্ষমাপ্রার্থনা করে আবার এই ঘরে ঢুকলো। আমি মুখ তুলে তাকিয়েছি। তনিমা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সুনিপুণা অভিনেত্রীর মতো সে এই ক'মিনিটে নিজের বেশবাস সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছে।

"আসুন," তনিমা আমাকে পর্দার ওধারে সাদর নিমন্ত্রণ করছে। সেখানে কোণের দিকে আর একটা খাট আমি দেখতে পাচ্ছি।

তনিমা মুহূর্তে তার স্বভাব পাল্টে ফেলেছে। যে এতোক্ষণ কাটাকাটা কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল শয়ন মন্দিরে সেই এখন মধুরভাষিণী।

আমি এ-অবস্থায় কী করবো তা ঠিক করবার আগেই সে আমাকে আচমকা একটি দীর্ঘ চুম্বন উপহার দিয়েছে। আমি মুহূর্তে তার আলিঙ্গন-শৃঙ্খলে বন্দী।

আমি সত্যিই বিপর্যস্ত। আমি সভয়ে কখন নিজের মুখটা সরিয়ে নিয়েছি তা তনিমা লক্ষ্য করে ফেলেছে। তার কণ্ঠে রসিকতা। "ভয় হচ্ছে বুঝি? কোনো ভয় নেই! আমি লিপস্টিক মাখি না, কেউ কেউ ভীষণ ভয় পায় বাড়িতে গিয়ে ধরা পড়ার।"

আমি নিজেই একটু ঘামছি এই অসময়ে। আমি কখনও এই ভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোনো রমণীর অঙ্কশায়ী হইনি। মাধুরী ছাড়া আর কোনো রমণীর সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় নেই। এখন ভাগ্যের পরিহাসে একই শয্যার একটিমাত্র উপাধান ভাগ করে তনিমা ও আমি অপরিচয়ের প্রথম বাধাগুলি অতিক্রমের চেষ্টা করছি।

তনিমা আমাকে অধঃপতনের গহন অন্ধকারে টেনে নেবে নাকি? সে কী বুঝছে আমি অভিজ্ঞ অতিথি নই?

আমি কী করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। প্রবল অন্যায়বোধ আমাকে এই সুলভ রমণীশরীর থেকে দূরে ছিটকে ফেলার চেষ্টা করলো। আমি সিংগল বালিশ ছেড়ে বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। শয্যাবিলাসিনী তনিমা ইতিমধ্যেই আমার দেহের নানা প্রান্তে স্নিগ্ধ চুম্বন উপহার দিয়েছে।

আমি উঠে পড়তেই, সে জিজ্ঞেস করলো, "কোনো অসুবিধে হচ্ছে?"

আমি কী বলি? "বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে আপনার সমস্ত প্রোগ্রাম…"

"নষ্ট করেছেন। তাই তো শাস্তি দেবো! আমি সব জায়গায় লিপস্টিকের ছাপ দিয়ে দেবো, জামাতেও!" তনিমার মধ্যে রসবোধের অভাব নেই।

"আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না তো, তনিমা।"

"আপনি না বললে, আমি কেন জানতে চাইবো? তাছাড়া, এখানে কে আর সত্যি নাম বলতে চায়?"

তনিমা আমার পায়ের মোজাটা খুলে ফেলবার পরামর্শ দিলো। "এতোক্ষণে অপরিচয়ের অস্বস্তি কেটে যাবার কথা। এখন সহজ হয়ে বিশ্রাম নিন। আপনারা কাজের মানুষ, একটু অবসর সুখ তো প্রয়োজন।"

অবশেষে আমার বানানো নামটাই উপহার দিলাম তনিমা লাহিড়িকে।

"অনিবার্য! ভারি সুন্দর নাম তো। খুব মডার্ন।" তনিমা লাহিড়ি জানে কোন নাম আধুনিক, কোনটা বস্তাপচা!

না, পৌষের এই বিভ্রান্তিকর অপরাহ্নে তনিমা ও অনিবার্যর গোপনবিহারে যথেচ্ছ অংশ নেবার জন্য আমি একটুও উৎসুক নই। আমি লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতে এখানে এসেছি। লেখার তাগিদ না থাকলে আমি মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে এখানে এইভাবে উপস্থিত হতাম না। কিন্তু তবু আমি বুঝছি আমার লজ্জার কথা। আমি ক্রমশ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়ছি। অথচ আমি চাই কেবল বিবরণ সংগ্রহ করতে—সেইসব বিবরণ যা আমাকে উপন্যাস লেখায় সাহায্য করবে।

বুদ্ধিমতী তনিমা বুঝেছে আমার লজ্জার কথা। আমার অনভ্যস্ত শরীরের ভাষাও সে অতি সহজে আয়ত্ত করে নিয়েছে। আমার মুখের কথার জন্যে সে অপেক্ষা করছে না। নিশ্চিন্তমনে সে নিজের খেলা খেলে চলেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় আমি যে এখনও উন্মত্ত নই তাও সে বুঝে নিয়েছে। একটা পরিচ্ছন্ন রঙীন চাদরে সে দুজনের দেহই ঢেকে দিয়েছে। তার ঊর্ধ্বদেহ কিছুটা উন্মুক্ত—আমাকে কানে কানে শরীরের সমস্ত স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে সে।

এই অবস্থাতেও আমাকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে তনিমা রসিকতা

লো, "নিশ্চয় অফিসের কাজ ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছেন, তাই নেই। কাজের মানুষদের কখন যে কী হয়!"

শরীরের এই শীর্ষ সম্মেলন আমাকে অস্বস্তিতে ফেলছে। আমি ন কেবল শুনতে চাই তনিমার কথা। কেমন করে সে এই বাড়িতে না? কে তাকে নিয়ে এলো? কারা এখানে আসে? সংসারজীবনে দের কথা তার মনে আছে?

নিভৃত সুখশয়নে সুতনুকা তনিমা সেসব কিছুই চেপে রাখছে না। ভারি সুন্দর গল্প করে, আপ্যায়নের সঙ্গে। তার ব্যবহারে এবং রের কোথাও অশোভন ব্যস্ততা নেই।

সম্ভব হলে আমি নিজের নোটবইটা বের করে এইসময় দু একটা দ্রুত লিখে নিতাম। স্মৃতি মোটেই বিশ্বাসজনক নয় আজকাল। ওপর নির্ভর করে অনেক সময় ঠকেছি। কিন্তু লেখার প্রচেষ্টা এখন টেই নিরাপদ হবে না।

তনিমার সন্দেহ দূর করবার জন্যে আমি নিজেই তার শরীরের ঈষৎ খেলায় নামতে আপত্তি করিনি। তার ঊর্ধ্বদেহের বিপুল য করায়ত্ত করার জন্যে তনিমা এখন আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দ্ব আছে তনিমার—এই নিবেদনের মধ্যে নক্কারজনক অপরিচ্ছন্নতা। যেন শীতের শান্ত দুপুরে রিপন লেনের এই নির্জন কক্ষে তনিমা ক বিনোদিনীর এইটাই প্রাথমিক কর্তব্য।

কিন্তু ধীরে ধীরে রমণীশরীরের অতল পঙ্কে ডুবে যাবার জন্যে আমি নে আসিনি। আমাকে এখন তনিমার কাছ থেকে তার নিজের শুনতে হবে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার।

তনিমা এক ফাঁকে আমাকে বলেছে, "আপনার যখন খুশি তখন আসবেন, অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোনো দরকার নেই।"

"দুপুর একটার সময়?" আমি এবার মৃদু রসিকতা করেছি। মা আমার ডান হাতের আঙুলগুলোয় মৃদু চাপ দিয়ে উত্তর দিয়েছে, লছি তো, যখন খুশি।" এই ডান হাতটা পবিত্র থাকা বিশেষ য়োজন, এই হাতেই আমি সরস্বতীর সেবা করি। আমি অস্বস্তিতে লেও কিছু বলতে পারলাম না।

তনিমা তার বিশিষ্ট অতিথিদের গল্পও করছে কিছু-কিছু। কিন্তু চয় না দিয়েই। "আমাদেরও কিছু দায়িত্ববোধ আছে, অনিবার্য মানুষ এখানে প্রয়োজনেই আসে, দু'দণ্ডের মুক্তি পেতে।

তাদের সম্বন্ধে অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করা অথবা অকারণে তা
বিপদে ফেলা নিশ্চয় আমার কাজ নয়।"

মুক্তি কথাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। তনিমার চিন্তায়
অভিনবত্ব আছে তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।

"দেখুন অনিবার্যবাবু, মানুষ এই সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়
বন্ধনজ্বালা সহ্য করতে না পেরে কেউ মন্দিরে যাচ্ছে, কেউ হঠাৎ ছু
আসছে আমার এই ছোট্ট আশ্রয়ে। যারা আসে তারা বড্ড ব
লোক, অনিবার্যবাবু। আমি তাদের কখনও ছোট করি না। ছু
বাড়তি পয়সার লোভে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়িৎগতিতে বিদায় ক
দিই না। আমি জানি, ব্যস্ত লোকরা যে বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আ
কাছে আদৌ আসতে পেরেছেন এই যথেষ্ট।"

এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। রমণীর বাণিজ্যিক দেহখানি এব
মেনুকার্ডের মতো আমার সামনে ছড়ানো রয়েছে। যে কোনো ই
পূরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে আমার এই মুহূর্তে, কিন্তু শরীরের
বাণিজ্যিক বিস্তারে কোথাও নির্লজ্জ অশোভনতা নেই। বিপণন
বিলাসের মধ্যে তনিমা এক অসামান্য সম্ভ্রমের সেতুবন্ধ রচনা করে
তার সমস্ত শরীরের বিনম্র ভাষা দিয়ে।

সেই শরীরের মেনুকার্ডখানা আমার হাতে দিয়েই মাঝে-মা
আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে তনিমা বলছে
অতিথিদের কথা। সেই সেবার কার যেন অতিথি হয়ে তা
তিনদিনের জন্যে কলকাতা থেকে দিল্লি গিয়েছিল।

"ডিফেন্স কলোনির কাছে এক গেস্ট হাউসে ছিলাম। কোনো
নেই বললেই হয়। যাঁর জন্যে এতোদূর থেকে ছুটে যাওয়া তি
এলেন না, হঠাৎ জরুরি কাজে কোথায় বাইরে চলে গিয়েছেন।
আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এখান থেকে, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে
কারও কোনো ক্ষতি হলে তনিমারও যে খুব খারাপ লাগে তা আ
বেশ বুঝতে পারছি।

"দোষ তো আপনার নয়। আপনি কী করবেন?"
তনিমাকে সাহস জোগাই।

তনিমা আমার হাতের আঙুলগুলোতে মৃদু চাপ দিতে

লা, "যে-সম্পর্কে দু'পক্ষের লাভ হয় না, সে-সম্পর্ক কখনও ক না।"

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, নোট বই বের করে সব কথা লিখে নিই। । কথা কী মনে থাকবে?

তনিমা এবার আমাকে একটু কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলো। মাসে ভুবনেশ্বরে গেলাম, দুই বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। ফার্স্টক্লাস । পরের খরচায় ভুবনেশ্বরে। হোটেলে আলাদা ঘর। কিন্তু ট্রেনে ই দু'জনে হঠাৎ কী যে ঝগড়া আরম্ভ করলেন, আমার দিকে কেউ রও তাকালেন না। অথচ কুপের স্পেশাল ব্যবস্থা ছিল। পুরো দিন ব্যবসা'র হিসেব নিয়ে নিজেদের মধ্যে সে কি খেয়ো-খেয়ি!"

তনিমা জিজ্ঞেস করেছে, "এতো পয়সা নষ্ট করে শুধু শুধু আমাকে । আসা কেন?"

বড় বন্ধু বলেছেন, "আপনার চিন্তা কি? আপনার পেমেণ্ট, নার রিটার্ন টিকিট, আপনার হোটেল বিল এসব তো কাটা ছ না।"

আমি বোঝাতে পারলাম না, "আমারও একটা নীতি আছে। । খরচের পরও যখন কোনো কাজে এলাম না তখন চিন্তা হয়। জদের মধ্যে যখন ঝগড়াই করবেন তখন শুধু শুধু আমাকে টানি কেন?"

তনিমাকে যতই আমি আবিষ্কার করছি, ততই আমি মুগ্ধ হচ্ছি। ষের নতুন একটা ছবি আমার সামনে উন্মোচিত হচ্ছে, এই ছবি ার অজানা ছিল।

কিন্তু আমি কি সেই সঙ্গে নিজেও অন্যায়ের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি?

তনিমার কাছে-কাছে থেকে, তার বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠে তার ্কে উদ্ধার করে আনছি তার বুকের মধ্য থেকে। তার শরীরও র কাছে প্রকাশিত হবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু এই প্রকাশের াহিকতায় আমি আচ্ছন্ন হতে প্রস্তুত নই। আমি কোনো কদর্যতা পঙ্কিলতায় নামতে চাই না। তনিমাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রেখেই আমার উপাদান সংগ্রহের কাজ শেষ করতে চাই।

টনার সন্ধানে আমি অনিবার্য চৌধুরী যে সময়ের প্রান্তকে ই টেনে লম্বা করে চলেছি তা বুঝে একটু ভয় হচ্ছিল।

কিন্তু তনিমা বিন্দুমাত্র অধৈর্য প্রকাশ করলো না। "আমি তো ; কাউকে জোর করে চলে যেতে বলা আমার কাজ নয়। আর

আজ তো কোনো চাপ নেই।"

আমিও এবার হিসাব করে দেখলাম এই সময়ে সিনেমা দে
তনিমা বাড়ি ফিরতে পারতো না।

স্বার্থপরের মতো তনিমার শরীরের ভেলায় ভর করে আমি ন
এক অভিজ্ঞতার নদী পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কত বি
মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়। কি তার অভিজ্ঞতার পরিধি!

কিন্তু কোথায় তনিমার দুঃখ? বুকের কোথায় সে সমস্ত কা
ব্ল্যাকবক্সটা লুকিয়ে রেখেছে? আমি তনিমার উন্মিলিত বক্ষের ঐ
উপলব্ধির উৎসাহ এখনও প্রকাশ করিনি। আমি প্রাথমিক দি
কাটিয়ে যতটা পারি তার সঙ্গে কথা বলে চলেছি। কে বলবে
প্রথম আমি বারাঙ্গনার সান্নিধ্যসময় ক্রয় করেছি!

তনিমার নিজের কষ্টের সেই রহস্যময় ব্ল্যাকবক্স আমি এখনও খুঁ
পেলাম না। সে শুধু বলে, "আমার মনে কোনো কষ্ট নেই। মা
কত গভীর দুঃখ নিয়ে এখানে আসে।"

এক সময় আমাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিয়ে তনিমা বিছ
থেকে উঠে পড়েছে। আমি ভাবলাম, সময় হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তনিমা আমাকে অবাক করে দিলো। "অফিস থেকে সো
যদি পালিয়ে এসে থাকেন তা হলে নিশ্চয় চা খাওয়া হয়নি।"

খাবারের দোকানের সেই কমবয়সী ছোঁড়াটার কথা আমার ম
পড়ে গিয়েছে। তনিমার জন্যে পকেটের মানি ব্যাগটা আমি বে
করতে চলেছি, তনিমা তখন হেসেছে। "গরম জল করতে কতটু
সময় লাগবে? এই সময় একটু চা না খেলে আমার নিজেরই ভা
লাগে না—কামিনী থাকলে কোনো অসুবিধাই হয় না।"

তনিমাকে আমারই চা-পানে আপ্যায়িত করা শোভন। এইটা
তো বাণিজ্যিক নিয়ম। খাবারের দোকানের ছোঁড়াটা সেইরক
ইঙ্গিতই তো দিয়েছিল। কিন্তু তনিমা হাসলো। "আমাকে সিনেম
নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তো আপনি ভুলছেন না! সেটাই হ
আপনার অগ্নি পরীক্ষা!"

আবার হাসছে তনিমা। "সেদিন নিশ্চয় ভাল করে চা খাই
দেবেন! সিনেমা দেখার পর লোকে বউকে চা খাওয়ায় না?"

আমিও ওর সঙ্গে হাসবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।

তনিমা রসিকতা করলো, "আপনারা মানী লোক। আপনারা কোন দুঃখে আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবেন?" তনিমা এবার আমার কাছে সরে এলো। "এমনি মজা করছি। বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোনোদিন আবদার করবো না।"

আরও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমার মনে হলো, তনিমা তার সমস্ত কাজটা প্রফেশনাল দক্ষতার সঙ্গে মেনে নিয়েছে। সে আমাকে শুনিয়ে দিয়েছে, "আমরা একজনের কথা আর একজনকে বলি না। একজনের পরিচয় আরেকজনকে দিই না। আমরা অতিথিদের কোনো ক্ষতি হতে দিই না তাতে নিজের ক্ষতি হলেও। আর সবচেয়ে মজার," এবার তনিমা আমাকে অবাক করে দিলো, "এই যে এতো ভাব হলো, এতো জানা হলো, বাইরে আমরা আপনাকে চিনতেই পারবো না। এই আমাদের শিক্ষা।"

আরও অনেক সময় বয়ে গিয়েছে, আমি একটা পরিষ্কার ছবি পাচ্ছি, সেই সঙ্গে নতুন গল্পের ইঙ্গিত—আনন্দসঙ্গিনীর মধ্যেও প্রফেশনের গর্ব থাকতে পারে। কর্মের উত্তেজনাই কঠিন পরিবেশের মধ্যে মানুষকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখে। আমার কাছে তনিমা সানন্দে বলেছে, কোনো হীনতা তাকে স্পর্শ করে না, কারণ সে জানে সেও একটা কাজ করে। কাজটা কঠিন, কিন্তু তনিমার তা অসাধ্য নয়।

বাইরে বেল বাজছে। হয়তো নতুন কোনো অতিথির আগমন সঙ্কেত। তনিমা কিন্তু ব্যস্ত হচ্ছে না, কারণ কারও সঙ্গে তার আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। "আসলে কামিনী ফিরলো।"

সিনেমা হাউস থেকে স্বর্গের দেব-দেবী সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে কামিনী চলে এসেছে। "দিদি তুমি গেলে না, ভুল করলে। নারায়ণের যা লীলা! চোখ জুড়িয়ে যায়।"

অনেক উত্থান পতনের শেষে, অনেক অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের শেষপর্বে তনিমা আমাকে বিদায় দিচ্ছে। তনিমা জানে না, আমি তাকে মনে মনে লুণ্ঠন করে উপন্যাসের অমূল্যসম্পদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। বিদায় মুহূর্তে সে নিজের আভিজাত্য হারায়নি। পুনরাগমন প্রার্থনা না করে সে শুধু বলছে, "বিদায় মুহূর্তেও কাজের লোকদের কাজ ছেড়ে কোথাও আবার আসতে বলতে সাহস হয় না।" কিন্তু তনিমা আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করলো না, কী আমার কাজ? কেন এইভাবে শীতের দুপুরে

আমি আচমকা এখানে উপস্থিত হলাম?

ওর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। একটা বেয়াড়া ভয় বুকের মধ্যে পাথরচাপা হয়েছিল, যদি বেরুবার সময় কোনো গুণ্ডার খপ্পরে পড়ি, অথবা চেনা-জানা কেউ দেখে ফেলে আমি তনিমা লাহিড়ির ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসছি।

অনেক অভিজ্ঞতাধনী হয়ে আমি বাণিজ্যিক শয়ন মন্দির থেকে পশ্চাদপসরণ করছি। না, কেউ আমাকে এই অবস্থায় লক্ষ্য করেনি। খাবারের দোকানের ছোঁড়াটা দূর থেকে মাথায় হাত ঠেকিয়ে আমাকে নমস্কার করেছে, কিন্তু কোনো পুরস্কারের লোভে কাছে ছুটে আসেনি। মহানগরীর মানুষেরা নিজেদের হাজার কাজে ব্যস্ত, একজন তনিমা, একজন মাধুরীর অথবা একজন লেখকের জীবনে সামান্য কী ঘটলো তা নিয়ে অপচয় করার মতো সময় কারও হাতে নেই।

সন্ধ্যের একটু পরে আমি ও মাধুরী মুখোমুখি হয়েছিলাম। বাড়ি ফিরবার আগে আমি কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এধার-ওধার ঘুরেছি। নতুন সৃষ্টির লোভে আমি আজ কী করে বসলাম!

খাবার টেবিলে বসে মাধুরী আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছে, আর আমার চোখ দুটো শত চেষ্টা সত্ত্বেও যেন একটু নেমে আসছে। আমি কিছুতেই ওর মুখোমুখি হতে পারছি না।

মাধুরী বললো, "আমি তো অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেই অবাক! খাঁচার পাখি কোথায় ফুড়ুৎ করে পালিয়েছে!" মাধুরী জানে আমি এইরকম করি না। যখন আমার নতুন চিন্তা আসে না তখন আমি বড় জোর নতুন বই পড়ি, কিংবা কথামৃতর পাতা উল্টোই। খুব প্রয়োজন হলে আমি উপনিষদ গ্রন্থাবলীর স্মরণ নিই।

আজ মাধুরীকে একটা কিছু উত্তর দেবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, আমি কিন্তু পারছি না।

একটা চোরের গল্প লিখেছিলাম একবার। ভোরবেলায় সবে চুরি করে সোনার গহনা পকেটে নিয়ে একটা চোর বড রাস্তায় এসে নেমেছে এমন সময় পাহারাদারের সঙ্গে দেখা। "এই যে ভায়া," পুলিশ ডাকছে। আর চোরের বুক তখন ঢিব ঢিব করছে। কোন পথে পালাবে

ভাবছে। হঠাৎ ছুট দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা বিবেচনা করছে। ইতিমধ্যে পাহারাদারের ডাক সে যেন কানেই শুনতে পাচ্ছে না। পাহারাদার খুব কাছে এসে গিয়েছে, হাতটা পাকড়াও করবে নাকি? এমন সময় সিপাইজী জিজ্ঞেস করলো, "ক'টা বাজলো ভাই? ঘড়িটা ঘোড়া হয়ে রয়েছে।"

সময়টা বলে দিলো চোর। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রসিকতার সুযোগ ছাড়লো না, "বিয়ের সময়ে শ্বশুরের দেওয়া ঘড়ি আর কতদিন চলবে সিপাইজী? এবার ভাবিজীকে বলে একটা নতুন ঘড়ি স্যাংশন হোক!"

রিটায়ারমেন্টের দরজায় পৌঁছনো সিপাইজী খুব হাসলো এবং সেই সুযোগে চোরও খুব হাসতে-হাসতে পকেটে চাপ দিয়ে দেখে নিলো সোনার গহনাগুলো ঠিক আছে কিনা।

মাধুরীর চোখ দুটো আজ যেন নতুন ব্যাটারি ভর্তি টর্চের আলোর মতো! বড্ড বেশী জ্বল জ্বল করছে। মাধুরী এইভাবে চোখের আলোয় স্বামীকে সার্চ করলে আমার খুব কষ্ট হয়।

মাধুরীর কিন্তু অসীম দয়া। সে বললো, "ইন্দ্রভূষণ দাদা এসেছিলেন। বলে গিয়েছেন, কী ব্যাপার? এমন আচমকা উধাও তো সে হয় না। ব্রাদার গেলো কোথায়? আমি ভাবলাম নতুন সৃষ্টির কামনায় সে সারাক্ষণ তোমার সঙ্গেই প্রেমালাপে ব্যস্ত!"

মাধুরী কী বলেছে তা আমার জানা দরকার। ইন্দ্রভূষণ রসিকতা করে গিয়েছে, "দুপুরে একটু বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব এলো, আমি ভাবলাম ভায়ার কবি মনে একটু স্পেশাল রোমান্স জেগে উঠবে এবং তরতরিয়ে লেখা এগিয়ে যাবে।"

আমি এখনও মাধুরীর চোখের টর্চের তীব্র আলো সহ্য করতে পারছি না।

মাধুরী এবার মৃদু হেসে বললো, "আমি দাদাকে শুনিয়ে দিয়েছি, ক'দিন ধরে গল্পের ক্যারাকটারদের নিয়ে লেখকমশাই মশগুল হয়ে রয়েছেন। ঘরসংসার কোনো কিছুতেই মন টিকছে না। নতুন কিছু করার নেশায় পাগল হয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।"

"তাহলে তো লেখক মশাই নিজের দাঁড়েই বসে থাকবেন, হঠাৎ দাঁড়ের তার কেটে কোথায় পালালেন?" ইন্দ্রভূষণের এই মন্তব্যে একটু চিন্তা হয়েছিল মাধুরীর।

তারপরেই ইন্দ্রভূষণ সহজ হবার চেষ্টা করেছে। "কোনো চিন্তা

কোরো না. মাধুরী। আমাদের লেখক তো নর্মাল মানুষ—আমাদের কোনো স্পেশাল ট্রাব্‌ল্‌ দেয় না। কুমারেশ মিত্তির হোলনাইট ধরে নিজের ক্যারাকটারদের সঙ্গে কথা বলেন, ঝগড়া করেন, তর্ক করেন, কখনও কখনও দূর হয়ে যেতে বলেন। তখন কাল্পনিক হাতাহাতি লেগে যাবার অবস্থা! বেচারী, মিসেস মিত্তির! বড় উপন্যাস লেখার সময় স্বামীর সঙ্গে তিনিও রাত জেগে থাকেন। ভদ্রমহিলার কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না।"

মাধুরী বলেছে, "ক'দিন থেকে আপনার বন্ধুও ভাল করে ঘুমোচ্ছে না। নতুন গল্পের খোঁজে সারাক্ষণ ছটফট করছে।"

রাত হয়েছে। মাধুরী আমার কপালে হাত দিলো। "কেমন আছো! তোমার শরীর খারাপ করেনি তো? তোমাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।"

আমার শরীরে এইভাবে স্নেহের স্পর্শ ছড়িয়ে না-দিলেই পারতে মাধুরী, আমার মনের ভিতর থেকে কে যেন করুণভাবে বলে উঠলো।

কিন্তু এই উদ্বিগ্ন হবার বিষয়ে কী উত্তর দেবার আছে আমার? আমার উপন্যাস জমা দেবার সময় এগিয়ে আসছে। আমি এখনও একলাইন লিখিনি। আমি এখনও গল্পের সোনার হরিণের পিছনে অসহায়ভাবে ছুটছি।

ভাগ্যক্রমে তার প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করলো না মাধুরী। সে আন্দাজ করে নিয়েছে, বৃহৎ কোনো সৃষ্টির প্রারম্ভে এমনই অবস্থা হয়। লেখকের জটিল মস্তিষ্কের মধ্যে শতসহস্র ঘটনার টুকরো বহুক্ষণ ধরে আন্দোলিত হয়ে এক বিচিত্র মণ্ডে পর্যবসিত হয়। তারপর সেই মণ্ডই পরিশীলিত এক মানসিকতার ক্যালেণ্ডার যন্ত্র থেকে রোলকরা কাগজের মতো বেরিয়ে আসে। এমন অভিজ্ঞতা মাধুরীর আছে, তার খুড়তুতো ভাই খুদে এক কাগজকলে কাজ করে। সেখানে মাধুরী নিজের চোখে দেখে এসেছে—ছেঁড়া এবং ময়লা কাগজের টুকরো থেকে কেমন করে আবার নতুন ঝকঝকে কাগজের সৃষ্টি হয় সাহিত্যসৃষ্টির জগতেও তাই হচ্ছে—পুরনো ঘটনাগুলোই পুনরাবৃত্ত হয়ে নতুন কাহিনীর রূপ নিচ্ছে।

মাধুরী হঠাৎ বললো, "আমার মনে হচ্ছে, এবার তুমি যা চাইছে তা পেয়ে গিয়েছো।"

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। মাধুরীদের বিশ্বাস নেই। বাড়ির

এই সব চির পবিত্র বধূরা অনেকসময় সাধিকার দিব্য দৃষ্টি লাভ করে, তাদের কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না।

মাধুরী অনুগ্রহ করে এবার আমাকে জেরা থেকে মুক্তি দিলো। সে বললো, "তোমার এই যন্ত্রণা দেখে আমার কষ্টও হয়, আবার ভালও লাগে। সাধনা এবং সৃষ্টির যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় সহ্য করছো তুমি, এ তো আমার গর্বের।"

আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম। আমি আর অভিনয় করতে পারছি না। যে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বসে আছে তার সামনে অভিনয়ে আমার খুব কষ্ট হয়।

কিন্তু ধরা পড়ার সম্ভাবনা থেকেও আমি অনেক দূরে সরে যেতে চাই।

আমার দুই দুর্বলতা আমাকে এখন সাহায্য করছে। মাধুরী জানে, আমি অধৈর্য এবং অসহিষ্ণু। কষ্টের জ্বালা সহ্য করবার শক্তি আমার কম। অন্য স্ত্রীরা হয়তো এই দোষের নানা ব্যাখ্যা গাইতে বসতো, কিন্তু মাধুরী এর অন্য যুক্তি খুঁজে নিয়েছে। সে বলে, "যারা লেখে, যারা কলমের টানে নিজের খেয়ালখুশিমতো নতুন বিশ্ব-সংসার তৈরি করতে পারে তারা অতিমাত্রায় অনুভবশীল হয়—তারা তো অল্পে বিচলিত হবেই। অল্পে বিচলিত হওয়া সংসারী মানুষের পক্ষে দোষ, কিন্তু যাকে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ তিলে-তিলে লিপিবদ্ধ করতে হবে তার গ্রহণযন্ত্র অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে। তার রিসিভার সেনসিটিভ না হলে কাজ হবে কী করে?"

এইসব মানুষ সম্বন্ধে মাধুরীর যে যথেষ্ট মায়া আছে আমার জীবনই তার প্রমাণ। মাধুরী জানে, এইসব সেনসিটিভ রিসিভিং যন্ত্রকে সযত্নে ঢেকে রাখতে হয়, সংসারের সবরকম দুর্যোগের মধ্যে ঝপ করে এদের ফেলে দিতে নেই। "সেই যে জাপান থেকে একবার একটা উপহার প্যাকিং এসেছিল। বাইরে লেখা ছিল—গ্লাশ—হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার—কাঁচ! সাবধানে নাড়াচাড়া করুন! সৃষ্টির নেশায় মত্ত মানুষগুলো ওইরকম," মাধুরী এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

আমি আজ অল্পে ছাড়া পেয়ে গেলাম। মাধুরী বলেছে, "সারাদিন অনেক কষ্ট হয়েছে, এখন মাথায় একটু জল দিয়ে কিছু খেয়ে, চুপচাপ রেডিওতে গান শোনোগে যাও।" মাধুরী বিশ্বাস করে, সৃষ্টির যন্ত্রকে বেশীক্ষণ চালাতে নেই। ওভারটাইম করালে এসব যন্ত্রের কিছু থাকে না।

আমি যেন বিরাট একটা অপরাধ করেও অল্পের জন্য এখনও ধরা পড়িনি। অথচ অনুসন্ধানীরা আমার খুব কাছাকাছি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি হাল্কা কিছু খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি, কত বিনিদ্ররজনী আমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে।

মাধুরী বলেছে, "একসময় ডাক্তারের কাছে রক্তচাপটাও দেখিয়ে নিও। যারা মাথার কাজ করে অথচ শরীরকে বেশী খাটায় না তাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়। এর কোনো বয়স নেই। কুমারেশ মিত্রর স্ত্রী তো সেদিন এক বেতার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, হাই ব্লাডপ্রেসারের হাঙ্গামা না থাকলে উনি আরও অনেক বড় লেখক হতে পারতেন। অনেক দিন ধরে চরিত্রগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করে-করে চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত ফ্রিজ হয়ে যায়, তারা আর নড়তে চায় না, আর বড় হতে চায় না। তখন মস্তিষ্ক থেকে তাদের পত্রস্থ না-করা ছাড়া উপায় থাকে না। অথচ স্রষ্টার গর্ভে আরও কিছুটা বড় হলে ভাল হতো।"

রাতের সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব শেষ করে বেচারা মাধুরী যখন ক্লান্ত দেহে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছে তখন প্রায় রাত পৌনে এগারোটা।

মাধুরী ঘরে ঢুকে বিছানায় বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্প্রিং-এর মতো তড়াং করে লাফিয়ে উঠে বসলাম।

মাধুরী আমাকে ভুল বুঝলো। ভাবলো, হঠাৎ ঘরের একশপাওয়ারের আলো জ্বলতেই আমার পাতলা ঘুম চমকে গিয়েছে। কিন্তু আমি ততক্ষণে নিজের পড়ার চেয়ারে এসে বসেছি। মাধুরীর আবেদন নিবেদনে কান দিয়ে আমি আর শয্যায় ফিরে যাইনি। আমি এখনই লেখার সাধনা শুরু করতে চাই।

আমি মনকে সেই কথা বলছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মাধুরীর সান্নিধ্যসৌভাগ্যের অযোগ্য বলেও ভীষণ ভয় হচ্ছে আমার। আমার সাহিত্যজীবন এবং ব্যক্তিজীবন কোথায় যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

মাধুরী আপত্তি করেনি—সাধনার পথে সে বাধা হতে চায় না। রুটিন মাফিক কিছুক্ষণ পরিশ্রম করে কোনো বড় সাধনার সিদ্ধি যে হয় না তা সে জানে। তবে তার চিন্তা রয়েছে স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। এই কঠোর সাধনা প্রায়ই কোনো পুরস্কার বহন করে আনে না, অথচ মানুষের দেহমন গ্রাস করতে চায়। গল্প-উপন্যাস লেখাটা শরীরের

ওপর কী দুর্বিষহ চাপ সৃষ্টি করে তা যদি পাঠকরা জানতেন !

মাধুরীর সুবিবেচনায় আমি উল্লাস বোধ করেছি। সে আমাকে শয্যাসান্নিধ্যের যন্ত্রণা থেকে আজকের মতো নিষ্কৃতি দিয়েছে।

আমি ঘরের প্রধান আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আমার চারদিকে অন্ধকারের সীমাহীন এক শূন্যতা সৃষ্টি করে নিয়েছি কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর আমার লেখার জায়গায় ছোট্ট একটা টেবিল-ল্যাম্প, যা আমাকে ছাড়া কাউকে আলো দেয় না, জ্বেলে দিয়েছি।

আমি এবার কাজের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে চাই; শুধু কাজকে ভালবেসেই আমি এমন করছি না বোধ হয়। মানুষ অনেক সময় জ্বলন্ত রেলের কামরায় আগুনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেও বাইরে ঝাঁপ দেয়, বৃহত্তর বিপদ সেখানে অপেক্ষা করছে জেনেও। আমি অতশত হিসেবের জটিল আবর্তে প্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি সাহিত্যের আনন্দলোকে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

আমি জানি অদূরে অন্ধকারে আমার সমস্ত যন্ত্রণার শান্ত সেবিকা, আমার সাধ্বী স্ত্রী মাধুরী, ক্লান্ত দেহে অথচ কেমন নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করছে। কিন্তু আমার যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। আমার দেহ অবশ হচ্ছে। আমি এখনই কলম ধরবো। আমি যাকে এই মুহূর্তে বহুমানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে আমার উপন্যাসের পৃথিবীতে আহ্বান করব তার নাম তনিমা। অভিনবত্বের অগ্নিপরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে, অপ্রত্যাশিত বিষয়ের চমকে পাঠকদের মুগ্ধ করতে হবে আমাকে।

টেলিভিশনের বোতাম টেপার মতোই তনিমা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠেছে। রঙীন চলচ্চিত্রের গরবিনী নায়িকার মতো আমি তার মনোহারিণী ক্লোজ-আপ দেখতে পাচ্ছি। তনিমা আছে খুব কাছে, আবার বহু দূরে। এই ভাবেই চলচ্চিত্রের পারদর্শী নায়ক-নায়িকারা অসাধ্য সাধন করতে পারেন, বহু দূরে থেকেও তাঁরা নৈকট্যের মোহজাল সৃষ্টিতে সক্ষম।

তনিমা আমার মনের টেলিভিশনে ভেসে উঠেছে সেই লুজ ফিটিং আলখাল্লায় যার সর্বত্র হাল্কা পিঙ্ক রঙের তারকার সমারোহ। তনিমা এতো কাছে, কিন্তু সে নির্বাক। নিস্তব্ধতাই এখন প্রয়োজন। মাধুরী কী

আমাদের এই সাক্ষাৎকার শুনতে পাবে ?

তনিমা লাহিড়ি নিস্তব্ধ হয়ে একই ক্লোজ-আপে আমার মনের পর্দায় জ্বল জ্বল করছে। কথা বলার জন্যে সে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তনিমা বোধহয় বুঝতে পারছে না, কেন আমি তাকে এখনও কথা বলতে অনুমতি দিচ্ছি না। আমার হঠাৎ খেয়াল হলো, কাগজে পড়েছি, এখন বিদেশে সর্বত্র টিভিতে, রেডিওতে, টেপ রেকর্ডারে হেডফোনের ব্যবস্থা হয়েছে, যার অর্থ শব্দ তোমাকে ছাড়া কাউকে বিরক্ত করবে না। একমাত্র তুমিই সব কথা শুনতে পাবে, যদি-না তুমি শব্দের অবাধ প্রসারণ চাও।

তনিমা, তোমার কথা শোনবার অভিলাষেই আমার জন্যে এই মুহূর্তে চুপি চুপি একটা হেডফোনের ব্যবস্থা করেছি। তোমার নিজের ছবিটা, বিশেষ করে ওই আলখাল্লা পরা উর্দ্ধদেহটা আমার বুকের ভি-সি-আর-এ জ্বল জ্বল করছে।

আমি কতক্ষণ স্থিরভাবে কলম হাতে বসেছিলাম, তা আমার খেয়াল নেই। আমার মনে আছে, তনিমাই যেন বললো, "নাম দিন গরিমা, যদিও আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন। আপনি অনিবার্য চৌধুরী বলে যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা যে মিথ্যা তা জানতে পারলে অনেক কথাই হতো না। আমার অতিথিরা কোন দুঃখে গল্পের বিষয়বস্তু হতে যাবেন ?"

গরিমা লাহিড়ি। লাহিড়িটা অক্ষুণ্ণ থাক। কোথাও সত্যের সঙ্গে একটুকু সম্পর্ক থেকে গেলে বানানো গল্পও মূল্যবান হয়ে ওঠে। যারা কাহিনী পড়বে তারা হয়তো কিছুই জানতে পারবে না।

কিন্তু আজকাল বিদেশে লেখকের জীবনের প্রতিটি ঘটনা তিলে তিলে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, যাতে মানুষটার প্রতিটি রচনা নতুন অর্থবহ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক লেখক নাকি সমস্ত জীবন ধরে একটা মাত্রই গল্প লিখতে সক্ষম—সেটা তাঁর নিজের গল্প। সারা জীবন ধরে মানুষটা যা লেখে তার প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি পরিণতিতে একমাত্র লেখক নিজেই আছেন, আর কেউ নয়।

এই কথাই একটু আলাদাভাবে এক সন্ন্যাসীও একবার কোন মিটিংয়ে বলেছিলেন। কিন্তু ভক্তরা বিস্ময় বোধ করলো না। গৃহ-পালিত পশুর মতো তারা সব কথা মেনে নিলো। সন্ন্যাসী বলেছিলেন,

ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের ছায়া আছে—অর্থাৎ তিনিই তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র অহরহ বিরাজ করছেন।" কী আশ্চর্য কথা, কী পরম আনন্দের কথা, ভরসার কথা, কিন্তু একটু অবিশ্বাসের চাটনি অনুপস্থিত থাকায় এমন সংবাদও স্বাদহীন হয়ে ওঠে।

গরিমা লাহিড়ি, আমি একজন সাধারণ লেখক। আমার অনেক লেখা প্রকাশিত হলেও, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকের হৃদয়সাম্রাজ্য আমি চিরতরে জয় করিনি। আমার বুকের মধ্যে বিজয়ী হবার স্বপ্ন রয়েছে—পাঠকহৃদয়ের সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চাই আমি। আজ আমি তোমাকে ব্যবহার করবো আমার বিজয় অভিযানে। আমি তোমাকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে নিয়ে পাঠকের দরবারে উপস্থিত করবো। কুমারেশ মিত্র, অমরেশ গাঙ্গুলী, বিমল মিত্র তোমাকে হয়তো সৃষ্টির বিপুল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, কিন্তু ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়। এই মুহূর্তে তোমার একমাত্র ভাগ্যদেবতা আমিই।

গরিমা, তুমি আমাকে বিচিত্র অনুভূতির অভিজ্ঞতা দান করেছো। নিত্যদিনের দীনতা, কলুষতা, অসম্পূর্ণতা তোমাকে স্পর্শ করেও করেনি। তোমার ঈশ্বর হয়েও আমি বিস্মিত।

গরিমা, তুমি এখনই তোমার ঐ লুজ ফিটিং গাউন ছেড়ে একটা জরির বুটি দেওয়া সবুজ শাড়ি পরে অতিথির সামনে উপস্থিত হবার মতলব করছো। কিন্তু আমি ভাবছি তোমাকে সে সুযোগ দেবো না। তুমি বরং আমার কাছে মুহূর্তের ছুটি নিয়ে একটা মিলের পলিয়েস্টার শাড়ি জড়িয়ে এসো।

কিংবা, আমি ভাবছি, তোমাকে আরও একটু নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করি। তুমি অনেকদিন পরে বাইরের একটু আলোবাতাস উপভোগের লোভে কামিনীর সান্নিধ্যে সাজগোজ করে বেরুচ্ছো সিনেমার জন্যে। সিনেমার নায়ক স্বয়ং নারায়ণ। নারায়ণের অনেক দৌরাত্ম্যের কথা তুমি শুনেছো, কিন্তু আজ বদ্ধ ঘরে বসে তাঁকে চোখে দেখতে চাও তুমি।

তুমি নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়েছো। কামিনী একটা কিছু হাল্কা মন্তব্য করুক তোমার সাজগোজ সম্পর্কে।

"আজ অনেকের ঠাকুর দেখা মাথায় উঠবে গো, দিদিমণি। তারা নারায়ণীকে দেখবে!"

তুমি একটা প্লাসটিকের লেডিজ ব্যাগ হাতে নিয়েছো। তুমি কামিনীকে (না, ওর নামটা পাল্টে দিয়ে ভামিনী করি) বকবে।

"ঠাকুরদেবতার ছবি নিয়ে নোংরামি করিসনি ভামিনী। মনে ভক্তি নিয়ে মানুষ আসে ওইসব ছবি দেখতে।"

আরও এক পা এগিয়েছো তুমি, ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের আবির্ভাব। তরুণ যুবক অনিবার্য চৌধুরী। নিষিদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় অফিস থেকে সোজা পালিয়ে এসেছে অনিবার্য। সে জানে না, পৃথিবীর সব ভাল জিনিসেরই ওয়েটিং লিস্ট আছে—রান্নার গ্যাস থেকে নটীর ক্ষণকালের প্রশ্রয় পর্যন্ত।

অনিবার্য! নামটা ভারি সুন্দর। যা নিবারণ করা যায় না তাই যেন হঠাৎ এসে পড়েছে অমোঘ নিয়তির ইচ্ছায়। কিংবা, যখন আরও বিস্তারিতভাবে দেখাবো অনিবার্য নিজেকে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পরিচয়ের মধ্যে পতনের দীনতা নেই, ঘৃণা নেই। আবার ক্ষমাও নেই! কৃতকর্মের ফলশ্রুতি যেন অনিবার্য—তা অনিবার্য কেন বুঝছে না? নাম থেকে এইরকম একটা অনুভূতি পাঠকের মনে আসা প্রয়োজন।

কিন্তু অনিবার্য নামটা তো ব্যবহার করা চলবে না। গরিমা তোমার ঘরেই লাল রেক্সিনে বাঁধানো সযত্নে আশ্রিত শরৎচন্দ্রকে দেখে এসেছি। যদি কখনও কোনো অনিবার্য পথে আমার এই অনিবার্যর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে যায়, তখন তুমি ভাবতে শুরু করবে। হয়তো একদিন কোনো অতিথিকে তুমি বলেই বসবে, "অনিবার্য একদিন এসেছিল অনাহুতের মতো। অনিবার্যকে আমিও আবিষ্কারের সুযোগ পেয়েছি অনেকক্ষণ ধরে, যদিও সে আমাকে বিশ্বাস করেনি।"

ধরা যাক, ভামিনী এখনই রূপালি পর্দায় নারায়ণকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। সে এখনই অনিবার্যকে অপ্রিয় কিছু কথা বলে বিদায় দিতে উৎসাহী। তুমি তখন তাকে সংযত করলে। অনিবার্যর সলজ্জভাব দেখেই তুমি বুঝে নিলে সে এই পথের নিত্যযাত্রী নয়, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্রশ্রয়ের দাবি রাখে।

আমি এখনই বলে রাখছি, অনিবার্যকে আমি অনিন্দিত চৌধুরী করবো। অদৃশ্য একটু যোগসূত্র ঐ চৌধুরীর মধ্যে থেকে যাক। যদি তুমি কখনও লেখাটার মধ্যে অনিন্দিত বলে কারও সঙ্গে পরিচিত হও, তুমি ভাববে—কী আশ্চর্য মিল! তনিমা ও গরিমা লাহিড়ির, অনিবার্য ও অনিন্দিত চৌধুরীর।

একটু অসুবিধে হবে। পাঠিকারা কিছুটা বিরক্ত বোধ করবেন। মধ্যদিনে যে বিবাহিত পুরুষ নিজের মস্ত দায়িত্ব পালন না করে

হাজির হয় ইঙ্গবঙ্গ পল্লীতে আনন্দসঙ্গিনীর সন্ধানে সে অবশ্যই অনিন্দিত নয়। নিন্দার বোঝা বেশী ভারি হলে, অনিন্দিত আমার কাজেকর্মে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। যাকে পছন্দ হয় না তাকে কিছুতেই আদর্শ দর্শক হিসেবে মেনে নেয়নি কোনো যুগের পাঠক-পাঠিকা। সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে মোস্ট অর্ডিনারি লেখকরাও এই অপ্রিয় সত্যটুকু সম্বন্ধে সচেতন।

আমি ভাবছি, অনিন্দিতকে আমি একজন দ্রষ্টা করে তুলবো। সে সব কিছু দেখবে প্রখর দৃষ্টি দিয়ে—যেমনভাবে ক্যামেরা ছাখে মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে। অনিন্দিত দ্রষ্টা হলে তোমার প্রতিফলনটা ভাল হবে। তোমার শরীর-মহিমা, তোমার যৌবন-গরিমা, পুরুষবক্ষের অগ্নিশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করার সুচারু শিল্প আমার পক্ষে বর্ণনা করা অনেক সহজ হবে। আমি তাই অনেক ভেবে স্থির করলাম অনিন্দিত চৌধুরী অবিবাহিত হোক।

তোমার মুখে যেন একটু বাঁকা হাসি। কুমার কিশোর এই রকম ভাবে অনিন্দিতকে উপস্থাপিত হতে দেখলে তোমার সমস্যা বাড়বে, যদিও তুমি জানো এ-বিষয়ে তোমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তুমিই আমাকে আজ বলেছো, "যারা আসে তাদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশা কী জানতে চাইছেন? কিন্তু কে আসবে তা ঠিক করার শক্তি কোথায় আমার? সুতরাং আমার প্রত্যাশার কোনো মূল্য নেই।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার স্বাধীনতা তো আপনারই," আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমাকে। তুমি বলেছিলে, "হ্যাঁ, একটা এমারজেন্সি ফিউজের মতো শেষ উপায়। একবার একটা লোক মস্ত ধনী ফিল্ম-টিল্মের নাম করে মত্ত অবস্থায় হাজির হয়েছিলেন। ধনী লোক, হয়তো অনেক নামটামও করেছেন, কিন্তু আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে বলেছিলাম। মানুষের পশুত্বের সঙ্গে যখন মানুষের ঔদ্ধত্যের যোগসাজস হয় তখন ফল খুব খারাপ হয়।"

শেষ লাইনটা ভীষণ দামী। আমি এমন একখানা মুক্তো নিজের রচনার হারে না-লাগিয়ে থাকতে পারবো না, গরিমা। তুমি হয়তো খুব ভেবে-চিন্তে কথাটা বলোনি, কিন্তু মহামূল্যবান কথা, যা আমার পক্ষে তৈরি করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো। আমি রিস্ক নেবো। তুমি যদি বইটা পড়ো, হয়তো ভাববে, এমনি হয়—"লেখকরা চিরন্তন সত্যগুলোই সাধারণ মানুষের মুখ দিয়ে প্রকাশ করিয়ে দেন সহজভাবে। আমি এতোদিন যা ভেবেছি, লেখক তার ওপরেই সত্যের শিলমোহর

দিয়েছেন।"

গরিমার বাঁকা হাসির আলোয় আমি আবার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখলাম। অনিন্দিতকে কিশোর না হোক, কুমার করতেই হবে। এ-পৃথিবীতে যারা একা, যারা সামনে পুরুত এবং আগুন (অথবা সরকারি রেজিস্ট্রারকে) রেখে অন্য কারুর সঙ্গে যুগলজীবন যাপনের অঙ্গীকার করেনি, তাদের সামাজিক দায়িত্ব অনেক কম। পাঠিকারা তাদের সহজে গ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

তুমি আবার হাসছো, গরিমা! কিন্তু অনিন্দিত নিঃসঙ্গ না হলে, গল্পটা কিছুতেই জমে না। আমি তোমার স্বার্থেই বলছি, গরিমা। তুমি ব্যাপারটা বোঝো, একটু ভেবে দেখো। প্রত্যেক কাহিনীর একটা ফোকাস থাকবে। কোথায় ফোকাস করতে চাও তার ওপর গল্পের বিন্যাস সম্পুর্ণ নির্ভর করে। সাজানো-গোছানো ভুল হলেই গল্পের সর্বনাশ হয়ে যায়। তুমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করে দেখো, ভুল লোকের ওপর যদি ফোকাস হয়ে যায় তাহলে গল্প আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, সে-গল্পকে কিছুতেই বাঁচানো যায় না।

তবু তুমি হাসছো, গরিমা।

বেশ, তোমাকে একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। আমার এই গল্পের উদ্দেশ্য কী? কী আমি করতে চাই? আমি একটা আনইউজুয়াল প্রফেসনের একজন আনইউজুয়াল রমণীকে জানা-অজানার আলো-আঁধারিতে রেখে পাঠককে এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব উপহার দিতে চাই। নিষিদ্ধ অঞ্চল সম্বন্ধে পাঠকের অবচেতন মনে যে অনন্ত কৌতূহল রয়েছে আমি শুরুর সময় তার সামান্য সাহায্য চাই, কিন্তু আমি কিছুতেই ওই নোংরা পটভূমির ওপর সম্পুর্ণ নির্ভরশীল হতে চাই না।

অর্থাৎ তনিমা·· না তোমাকে সবসময় গরিমা বলে বর্ণনা করতে অসুবিধে হচ্ছে। ওটা লেখা সংশোধনের সময় পাল্টে দিতে হবে। একবার তো আরও ভীষণ অসুবিধে হয়েছিল। যতবার মেয়েটার আসল নাম পাল্টে বানানো নামটা লিখতে যাই, ততবার গল্পটা আটকে যায়। মেয়েটা এখানকার এক নার্সিং হোমের সেবিকা ছিল। একটু ওষুধের নেশা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নামটা কিছুতেই পাল্টাতে পারি না। অথচ যে নামে জীবনে ঘটনা ঘটেছে তাই যদি লিখে গেলাম, ঘটনাটাও হুবহু রইলো, তাহলে আমি তো খবরের কাগজের রিপোর্টার, আমি সাহিত্যিক নই। শেষে এক কাণ্ড করলাম। টানা লেখাটাই আসল নামে লিখে গেলাম—নার্স অসীমা হালদার। অসীমা নামটা

লিখলেই ছবিটা বেশ জীবন্ত হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি মানুষের কাছে সে মানুষের সুখদুঃখের কথা লিখছি। অসীমা হালদারের অনেক দুঃখ। রোগিণীদের ঘুমের ইঞ্জেকশন থেকে একটু-একটু ভাগ নিয়ে রাতে নিজেকে একটা ইঞ্জেকশন দেয়, ভীষণ ভয় কারুর হাতে না চুরির দায়ে ধরা পড়ে যায়। তা যা বলছিলাম। অসীমা হালদার লিখে-লিখে গল্পটা জীবন্ত হলো—জীবনে যেমন ঘটেছে তেমন, কোথাও কোনো বানানো কল্পনা নেই। ঘটনার খাঁটি দুধে খুব চালাক গোয়ালাই গল্পের জল মেশাতে পারে। আমি যা বলছিলাম, লেখা হয়ে গেলে, আমি মাধুরীকে বললাম, "এবার বসে-বসে যেখানে-যেখানে অসীমা হালদার আছে সেখানে-সেখানে কেটে সুশীলা ঘোষাল বসাও।"

মাধুরীর সে কি বিরক্তি! সে বলেছে, "এটা স্রেফ তোমার পাগলামো। সুশীলা ঘোষাল নামটাই যখন তোমার পছন্দ তখন গোড়া থেকেই অসীমা হালদারকে ড্রপ করতে পারতে।"

আই মাস্ট সে, মাধুরী আপত্তি তুললেও অবাধ্য হয়নি। অসীম ধৈর্য ধরে আড়াইশ পাতার উকুন বেছে-বেছে অসীমা হালদারকে সুশীলা ঘোষাল করেছে। বইটা সম্পাদকের পছন্দও হয়েছে, চিঠিপত্র কিছু এসেছে, কিন্তু আমার মন তবুও ভরেনি। আমি বুঝতে পেরেছি, যে-নার্স প্রাইভেট নার্সিং হোমের রোগিণীদের ঘুমের ইঞ্জেকশন থেকে একটু একটু সংগ্রহ করে নিজের একটা শটের ব্যবস্থা করে নেয় তার নাম সুশীলা হতে পারে না।

আমি নিজেও তখন নিজের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। ইংরিজীতে যাকে বলে 'প্রপার নেম' তার কোনো বিশেষ অর্থ নেই। নামের সঙ্গে মানুষের গুণের কোনো সম্পর্ক নেই। টেকো মেয়ের নাম কেশবতী হতে পারে। কিন্তু আমি এখন বুঝি, সাহিত্যের কোথায় প্রত্যেকটি নামের অদৃশ্য ছন্দবোধ আছে। অসীমা হালদার যেসব কর্ম অথবা অপকর্ম গল্পে করতে পারে গল্পের সুশীলা ঘোষাল তা কিছুতেই পারে না। যদি জোর করে তাকে দিয়ে তা করানো হয়, তা হলে গল্পটার কোথাও খুঁত থেকে যাবে। আমি তো এবার ভাবছি, নতুন সংস্করণে সুশীলা ঘোষালকে আবার অসীমা হালদার করে দেবো। পুরনো সংস্করণের কিছু গলতি ফর্মা হয়তো নষ্ট হবে, তা হোক, তবু আমি অসীমা হালদারকে স্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে পারবো

আমি ইতিমধ্যেই মাধুরীকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম,"রবিবার দুপুরে যখন হাতে কোনো কাজ থাকবে না, তখন সুশীলাকে নিষ্ঠুরভাবে ছেদন

করে অসীমাকে পুনর্বহাল করে যাও।”

হয়তো ভাবছেন, আমার এই বদখেয়াল আগে চাপেনি কেন? কারণ, যে-নার্সিং হোমে সেবার অসুস্থ মাধুরীকে রেখেছিলাম সেখানে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। রোগী ভাল হয়ে গেলে, কিংবা রোগী মরে গেলেও, কে আর নার্সিং হোমের খোঁজ খবর রাখে? এবার শুনলাম, ইন্দ্রভূষণও ওখানে যাচ্ছে ডাক্তারের সঙ্গে কীসব একটু কথা বলতে।

ইন্দ্রভূষণ বড্ড ভীতু, বিশেষ করে এই ডাক্তার, হাসপাতাল, পুলিশ, আদালত সম্পর্কে। ইন্দ্রভূষণ নিজেও একবার বলেছিল, “একাকী গমন করবার ভয়ে আমি মরতে চাইছি না, ব্রাদার। তোমার সময় হোক, তারপর দু'জনে একসঙ্গে গপ্পো করতে-করতে ওপারে চলে যাওয়া যাবে!”

এই নার্সিং হোমে ডাক্তারের সঙ্গে ইন্দ্রভূষণ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ব্যস্ত। আমার মনে পড়ে গেলো, কুমারেশ মিত্তির গভীর বিরক্তিতে একবার একটা দামি লাইন লিখেছিলেন—পতিতা ও চিকিৎসকের দ্বার প্রায়ই বন্ধ হয়।

ইন্দ্রভূষণ ভিতরে। আমি সেই সুযোগে একজন স্টাফের সঙ্গে ভাব জমালাম। ভদ্রলোক ড্রেসার। কথায়-কথায় জানালাম আমার স্ত্রীও অনেকদিন আগে এখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর সব ভাল, শুধু রাত্রে ভাল ঘুম আসতো না। তারপর হঠাৎ অসীমা হালদারের প্রসঙ্গ উঠে পড়লো।

“জানেন না?” লোকটা বললো। “নার্স অসীমা হালদার মারা গিয়েছে—ওভারডোজ হয়ে গিয়েছিল ঘুমের ওষুধ।”

সুশীলা ঘোষালের জীবনে আমি মৃত্যুকে ডেকে আনিনি, আমি আধুনিক পাঠকদের অসহিষ্ণুতার কথা স্মরণে রেখে শেষে বর্ণনা করেছি, সুশীলা ঘোষাল নিদ্রাহীনা রোগিণীদের বকুনি লাগাচ্ছেন, “ঘুম কি ছেলের হাতের মোয়া যে চাইলেই এসে যাবে? ঘুম হচ্ছে কেষ্ট ঠাকুরের মতো, অনেক সাধ্য-সাধনা করলে তবে রাধার কথা তাঁর মনে পড়ে।”

অসীমা হালদার যখন নেই তখন এবার যা-খুশি করা যায়। ভগবান প্রত্যেক মানুষকে তার জীবনের একটা কপিরাইট দিয়েছেন। কেউ তাকে সম্পূর্ণ নকল করতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে এই কপিরাইটের অবসান হওয়া উচিত, না-হলে রেকর্ড আপিস যে খাঁ-খাঁ করবে, সেখানে কোনো ইতিহাসের হদিশ থাকবে না।

মাধুরী আমার অনুরোধ অমান্য না করে সুশীলাকে পাতার পর পাতায় আবার অসীমা করেছে। বেচারাকে দুবার রিভাইজ করতে হয়েছে, কোথাও যদি ভুলক্রমে সুশীলা ঘোষাল অক্ষত থেকে যায় তা হলে গল্পের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাধুরী ওর পাতানো বউদি ইন্দ্রভূষণের স্ত্রীকে বলেছে, "কখন যে ওঁর মাথায় কী খেয়াল চাপে! আটাত্তর বার আমি সুশীলাকে খুন করে অসীমাকে বসিয়েছি, ওঁর মুখ চেয়ে।"

না, অনিন্দিত এবং গরিমা থেকে আমরা অনেকখানি সরে এসেছি। আমি ঐ যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিলাম, যেখানে স-ভামিনী গরিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নিজের বিনোদনের জন্য ঠিক সেই সময় অনিন্দিতর আকস্মিক আবির্ভাব।

ভামিনী তাকে পত্রপাঠ বিদায় করতে চাইলো। তুমি সাধারণত ভামিনীর সিদ্ধান্তে না বলো না। কিন্তু একবার তুমি অনিন্দিতর দিকে মুখ তুলে তাকালে।

অনিন্দিত ভীষণ অ্যাপলেজেটিক। তুমি নবীন আগন্তুকের দেহের দিকে তাকাচ্ছো! তুমি একটু ভয়ও পাচ্ছো। কতরকম মানুষের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গরিমা লাহিড়িকে এখানে টিকে থাকতে হয়। কে কোন উদ্দেশ্যে এখানে হঠাৎ আসে কিছু ঠিক নেই। গরিমা শান্তি চায়, চুপচাপ নিজের কাজটুকু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়।

স্বভাবসিদ্ধ স্টাইলে গরিমা এবার এমন ভাব দেখালো যেন কোনো গৃহবধূ মধ্যদিনে অপরিচিত আগন্তুকের বেল বাজানোয় প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে।

তোমার দৃষ্টিতে সেই চিরন্তন অসন্তুষ্টি—যা প্রাইভেসী হারালে মানুষের মুখে দেখা দেয়।

গরিমা, এই প্রাইভেসী ব্যাপারটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবো আমার এই উপন্যাসে। শুনেছি, এই একটি ইংরিজি শব্দ যার বাংলা হয় না, যেমন আমাদের 'অভিমান' শব্দটার যথার্থ ইংরিজী প্রতিশব্দ নেই।

প্রাইভেসী বলতে যারা 'গোপনীয়তা' মনে করে তারা ঐ কথাটার ঠিক সুর ধরতে পারেনি। ঘরের মধ্যে কোথাও আমি কোনো গোপন কর্ম করছি আর কেউ তাতে নাক গলালো, তার নাম প্রাইভেসীর উপর আক্রমণ নয়। হয়তো ঘরের মধ্যে আমি কিছু করছি না, চুপচাপ বসে আছি, আমার বেশবাস বিধ্বস্তও নয়—তবুও সেইসময়

কেউ সেখানে জ্বালাতন করলে প্রাইভেসী ব্রেক করা হলো। অপরের চিঠি লুকিয়ে অথবা প্রকাশ্যে পড়া—ঐ একই দলে। হয়তো আমার চিঠিতে কিছু নেই, কেউ হয়তো স্রেফ কোনো নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে, কিন্তু তা দেখা মানেও প্রাইভেসী ভঙ্গ করা। অর্থাৎ প্রাইভেসী মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। মানুষ অনেক সাধনা করে সমাজবদ্ধ হয়েছে, সংসারের সোনার শিকল পরেছে নিজের পায়ে তবু অসংখ্য বন্ধনের মাঝেও সে সর্বস্বহারা হতে চায় না চিরদিনে জন্যে, সে নিজের জন্যে একটু প্রাইভেসী রাখতে চায়, যা তাকে সেখানে ফিরিয়ে দেবে, যেখান থেকে সমাজবন্ধনের শুরু হয়েছিল মানুষ তার আদিম মৌলিকত্ব নিজের হাতে নষ্ট করতে বেশ ব্যথা পা গরিমা।

কিন্তু যুগে-যুগে এই প্রাইভেসীর কত ব্যাখ্যা চলেছে। বিদে বৃদ্ধরা অনেকসময় প্রাইভেসীর স্বর্ণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়—অমূল এই সম্পদ থেকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হবার দুঃখ পশ্চিমী গল্পে উপন্যা চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে অপরূপ স্বর্ণসুষমায়। আবার আমাদের দেশে ঝি-চাকরদের কথা ধরো, তাদের বিন্দুমাত্র প্রাইভেসীর আশীর্বাদ অথ আশ্রয় নেই।

আমাদেরই একজন বেয়াড়া লেখক বিগড়ে গিয়ে বলেছিলে স্নান এবং মলত্যাগের সময় পর্যন্ত যাদের চারদিকে আচ্ছাদন নেই তাদে আবার প্রাইভেসী! এই ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমাদের দে প্রাইভেসী মানে আব্রু।

আমি ওই সব বিশিষ্ট চিন্তায় প্রবেশ করতে চাই না। আমি শু শুনিয়ে রাখতে চাই সমাজ বড় হৃদয়হীন—যে প্রশ্রয় এবং প্রাইভে সে তথাকথিত সংসারী মানুষকে দেবার জন্যে উন্মুখ তা দোকানদারদে দেবার কোনো আগ্রহ নেই। দেহ লিজ দেওয়াও এক ধরনের দোকানদা —এই ধারণা কত মানুষের মাথায় জেঁকে বসে আছে। তারা ম করে, এই সব দোকানদারকে যখন তখন যত খুশি জ্বালাতন করা অবাধ স্বাধীনতা সকলের আছে।

কুমারেশ মিত্তিরের উপন্যাসে এক দেহবিলাসিনী বিরক্তভাবে তা এক খরিদ্দারকে বলেছিল, "আমরা আপনার ঘরের বউ নয় যে যখ তখন যেমন খুশী বিরক্ত করবেন।"

খরিদ্দার সে-কথা তার এক বন্ধুকে বলেছিল। বন্ধু উকিলমানু তিনি বলেছিলেন, "ঘরের বউরা এখনও দেশের আইন জানে না, তা

ভাল আমাদের। স্বামীর বিরুদ্ধেও রেপের অভিযোগ আনবার কিছু কিছু স্বাধীনতা রয়েছে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে। আইন সবসময় চেষ্টা করছে মানুষের একাকীত্বকে সম্মান দেবার, কিন্তু পাকে-চক্রে কেউ সে সুবিধে পাচ্ছে না।"

অনিন্দিতকে আমি এই প্রাইভেসী সম্বন্ধে বেশ সচেতন করে রাখবো।

সে তোমার কাছে প্রথমেই ক্ষমা চাওয়ায় তুমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছো। কিন্তু তুমি তখনও বলে চলেছো, "আপনি কে ? কেন এখানে এসেছেন ? এখানে আসবার মতলব কে দিয়েছে আপনাকে ?" অর্থাৎ গরিমা গৃহবধূর ভূমিকা অভিনয় দিয়েই শুরু করছে।

এরপর অনিন্দিত একজন পরিচিতজনের নাম করেছে। নামটা অবশ্যই চেনা মনে হচ্ছে গরিমার। কিন্তু বাজিয়ে নিতে হয় এই লাইনে। পদে-পদে বাধা-বিপদ ছড়িয়ে রয়েছে এখানে।

"কী বলেছেন আমাদের সম্বন্ধে ? কে তিনি ? কোথা থেকে সাহস হলো ?" এইসব মুখস্থ সংলাপ ভামিনী হুড়মুড় করেই বলে গেলো।

অনিন্দিত এবার একটু অসহায় বোধ করছে। "উনি বলেছিলেন, ওঁর পরিচয় দিলেই হবে। উনি চিঠি দিলেন না।"

এই অপরিচিত যুবক কেন বোঝে না, পরিচয়ের আগে মুখের কথার কোনো মূল্য নেই। স্রেফ মুখের কথায় মানুষ কেন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বে ? ঠিক সেই সময় অনিন্দিত কার্ডখানা বের করুক। "আপনি ওঁর ভিজিটিং কার্ডখানা হয়তো চিনতে পারবেন।"

"ও। মিস্টার বিশ্বাস—ওষুধের দোকানের। ওঁর কার্ডের কি কোনো মূল্য আছে ?" গরিমা ভাবছে, যিনি নিজে অনেকদিন এই পথ মাড়াচ্ছেন না তাঁর আবার অন্যকে কার্ড দেবার কী অধিকার থাকতে পারে ?

কিন্তু অনিন্দিত বলছে, "মিস্টার বিশ্বাস বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ।"

গরিমা মনে মনে ভাবছে, "মানুষের মন অন্য কোথাও চলে গেলে মানুষ এই ধরনের স্তোকবাক্য দেয়। কী দরকার ? এখানে তো দাসখৎ লেখা নেই যে আসতেই হবে। বললেই হয়, আমার ইচ্ছে করে না, তাই আসি না। কারও কাছে আসবার অথবা না-আসবার স্বাধীনতা নিয়েই তো মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে।"

কিন্তু অনিন্দিত চৌধুরী আরও বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। বলছে, "ওঁর হার্টের গোলমাল চলছিল। মাঝে-মাঝে একটু বুকের ব্যথা—কোনো উত্তেজনা চলবে না, ডাক্তারের মানা।"

এইবার একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে। তাহলে মিস্টার বিশ্বাস, খবরাখবর নেবার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন।

কিন্তু গরিমার ওই যে সিনেমায় যাওয়ার জন্যে বেরোনো। ওই যে বাইরে যাওয়ার জন্যে সেজেগুজে তৈরি থেকেও শেষমুহূর্তে শুধু ভামিনীকে পাঠিয়ে দেওয়া। গরিমার মধ্যে কোথায় প্রফেশনালিজম আছে—সবসময় নিজের বিনোদনকেই সে অগ্রাধিকার দেয় না।

এইখানে আমি আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে ছোট্ট একটা দৃশ্য ঢুকিয়ে দিতে চাই। উপন্যাসের প্রয়োজনের তাগিদে। যাতে পাঠকরা ভুলেও মনে না করেন, পতিতার হৃদয়ে প্রেমের উদয় সম্পর্কে আমরা তাঁদের অজান্তেই প্রস্তুত হচ্ছি।

ভামিনী বিদায় নিয়েছে। ঘরের মধ্যে ওরা দু'জন একা। অনিন্দিত বলছে, "মিস্টার বিশ্বাস আপনার পারিশ্রমিকের কথা আমাকে বলে দিয়েছেন।" টাকাটার পরিমাণটা এখানে অনিন্দিত মুখে না বলে একটা খামের মুখ খুলে নোটের ছাপ দেখিয়ে ইঙ্গিত করুক।

কিন্তু গরিমার গাম্ভীর্য কাটছে না। "তারপর আমাদের খরচ বেড়েছে পঁচিশ ভাগ। চাল, ডাল, মাছ, জামাকাপড়, কোন জিনিসের দাম চুপচাপ বসে আছে বলুন? বাড়ছে না শুধু মন্দিরের পুরোহিতের প্রণামী এবং আমাদের পারিশ্রমিক।"

ও-বিষয়ে কোনোরকম টেনসন দেখাতে চাই না আমি। এতে গল্পের ধর্ম পরিবর্তিত হতে পারে। আমি শুধু চাই, অনিন্দিতর মনে সেই কথাসরিৎসাগর যুগের একটা চিন্তা উঁকি মারুক, অর্থ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই দেহবিলাসিনীর আগ্রহ থাকা উচিত নয়।

অনিন্দিতর হাত ধরে গরিমা এবার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অনিন্দিতর বুকের মধ্যে এক অস্বস্তির সুখ এবং অসুখের মিশ্রণ। অনিন্দিত আড়চোখে দেখে নিয়েছে ওখানেও ঠাকুর-শ্রীমা-স্বামীজীর ছবি একই ফ্রেমের মধ্যে সাজানো রয়েছে। এঁদের জনপ্রিয়তার পরিধি দেখে বিস্মিত হচ্ছে অনিন্দিত।

গরিমা বলছে, আপনি জুতো মোজা খুলে সহজ হয়ে বসুন। অনিন্দিত জুতো খুললেও, মোজা খোলার ব্যাপারে একটু দ্বিধা করছে।

না, এই দৃশ্যকে আমি কিছুতেই অভব্য করে তুলবো না। আমি

গরিমার আটসাঁট দেহের গৌরব গাইবো সামান্য কয়েকটা শব্দে, তারপর তা ঢেকে দেবো গভীর কোনো বেদনার অনুভূতিতে। দেহোৎসবের উদ্দেশ্যে অনিন্দিতর এই গরিমাসান্নিধ্য নয়, এর মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে।

তাছাড়া, নারীদেহের নিবিড় বর্ণনায় আমি কোনোদিনই সিদ্ধহস্ত নই। এ-বিষয়ে আমি কুমারেশ মিত্রর মতো নিরলস সাধনাও করিনি। কুমারেশ মিত্র শত শত সংস্কৃত কবিতা এবং বিদেশী সাহিত্য থেকে নারীর নানা অঙ্গের জয়ধ্বনি সংগ্রহ করে রাখেন তাঁর নোট বইয়ের পাতায় পাতায়। কেবল নিজের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভর করে এই গুরুদায়িত্ব পালনের দম্ভ তাঁর নেই। বহু টাকা বিদেশী মুদ্রায় ব্যয় করে সম্প্রতি বিলেত থেকেও রমণী-রক্ষা সম্পর্কে একখানা গবেষণাধর্মী বই আনিয়েছেন।

নারীবক্ষের জয়গানে যুগযুগান্ত ধরে পৃথিবীর কবি ও লেখক সমাজের কী বিপুল প্রচেষ্টা, কিন্তু এ-বিষয়ে আজও অবসাদ নেই। নিরন্তর রঙীন কল্পনার উদ্ঘাটন চলেছে কুচযুগের অভিনবত্ব সম্পর্কে। গরিমার বুকের বাটিকে আকারে বৃহৎ করে আমি রচনার মধ্যে লালসা রসের অনুপ্রবেশ চাই না। তার দেহ অটুট, কিন্তু সে মহা ঐশ্বর্য-শালিনী নয়, এমন ইঙ্গিতই আমি দিতে চাই, যাতে আমার মূল গল্প অন্যপথে পরিচালিত না হয়।

কুমারেশ মিত্র অনেক সময় তাঁর নোটবইয়ের সাহায্য নেন এবং মনের আনন্দে দেহবর্ণনায় তাঁর শব্দৈশ্বর্যের পরিচয় দেন। হেমকুম্ভ, কলস, স্তনতট, স্তনশিখা ইত্যাদি বর্তমানে কুমারেশের কয়েকটি প্রিয় শব্দ। রত্নাবলী না কি এক দুষ্প্রাপ্য বই থেকে তিনি এইসব নিয়মিত সংগ্রহও করে চলেছেন। বক্ষবন্ধনীর একটি অপ্রচলিত শব্দ আমার সংগ্রহেও রয়েছে—স্তনোত্তরীয়। বর্ণনায় একটু ধ্রুপদী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আমি আগেই বলেছি, নায়িকা গরিমাকে আমি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাই। অল্প সময়েই আমাকে তা করতে হবে, পদে-পদে অপচয়ের মতো ঐশ্বর্য গরিমার ঊর্ধ্ব শরীরে নেই।

পাশের বাড়িতে অ্যালার্ম ঘড়িটা আচমকা বেজে উঠে লেখার সমস্ত পরিবেশটা হঠাৎ নষ্ট করে দিলো। বাড়ির ছেলেটা পরীক্ষা-সমুদ্র পার হবার জন্যে রাত দুপুরে পড়াশোনায় মন দিতে চায়।

ওই অ্যালার্মের শব্দে মাধুরীর ঘুমও হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। "ওমা! তুমি এখনও লিখছো।" মাধুরী একটু চিন্তায় পড়ে যায়। আমার

স্বাস্থ্য, বিশেষ করে আমার ব্লাডপ্রেসার তার চিন্তার কারণ।

"আমি লিখিনি মাধুরী। আমি শুধু অনেকগুলো ঘটনা একের পর এক মাথার মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।" সব জিনিস না সাজিয়ে লিখতে বসার মতো বোকামি কী আছে? ব্যাপারটা মেয়েদের রান্নার মতন। সব কিছু গোছানো না হলে রান্না চড়ানো যায় না।

পুওর মাধুরী। স্বামীর সাধনা এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে কোনটাকে প্রাধান্য দেবে বুঝতে না পরে শ্রীমতী বেশ দ্বিধায় পড়ে যায়।

"না ঘুমুলে মানুষের শরীর খারাপ হয়," মাধুরী বিছানা ছেড়ে আমার কাছে উঠে এসেছে। আমার রাত্রি জাগরণের সাক্ষী টেবিল ল্যাম্পটাও যেন একটু ঘুমের জন্যে লালায়িত।

মাধুরীকে আমি আগে শুনিয়েছি--ঘুমের পিকুলিয়র স্বভাব। যত তাকে প্রশ্রয় দেবে সে ততই মাথায় চেপে বসবে। যাঁরা কাজের মানুষ তাঁরা মাত্র চারঘণ্টা ঘুমিয়েও সুস্থ থাকেন।

মাধুরী বলছে, "ওসব কথা রাখো। যারা মাথার কাজ করে তাদের বেশী ঘুম প্রয়োজন। ঘুম না-হলেই ব্লাডপ্রেসার।"

মাধুরী জানে, রাতের পর রাত জেগে থেকে বিখ্যাত সব চরিত্রদের জটিল সমস্যার গ্রন্থি মোচন করেছেন কুমারেশ মিত্র। সেই সব গল্প এখন পড়ে তুমি বলতে পারবে না এর পিছনে শত শত বিনিদ্র যামিনীর যন্ত্রণা এবং নিঃসঙ্গতা রয়েছে। বরং কুমারেশ মিত্রের গল্প পড়তে পড়তেই কত লোকের চোখে ঘুম নেমে আসে।

মাধুরী একবার বোধহয় ভাবলো আমাকে সে অনাদিকালের আকর্ষণে বন্দী করবে, যুগলসুখের শয্যায় তার পাওনা দাবি করবে। সেইভাবেই সে এগিয়ে এলো, চোখের ইশারা দিলো। আমি হঠাৎ অজানা ভয়ে শিউরে উঠলাম।

তারপর মাধুরীর রণনীতির পরিবর্তন হলো। মাধুরীর মনে পড়ছে, গভীর রজনীতে সাধকের তপোভঙ্গ অভিপ্রেত নয়। সাহিত্যের আঙিনায় নতুন বিষয় উপস্থাপিত করে তাকে নতুন সৃষ্টির সিংহাসনে আরোহণ করতে হবে।

মাধুরীর কাছে আমি যেন ছোট হয়ে যাচ্ছি।

মাধুরী আমার খুব কাছে সরে এলো। জিজ্ঞেস করলো, আমি জল খাবো কিনা? তারপর পরমস্নেহে আমার মাথার চুলগুলোতে তার মিষ্টি হাত বুলিয়ে দিলো। বললো, "আমি তোমার সময় নষ্ট করবো না। যদি ইচ্ছে হয় তাহলে লিখে যাও। তবে লক্ষ্মীটি, মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম নিও। শীতের রাত্রে একটু ঘুম প্রয়োজন।"

আমি এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাধুরীর প্রশান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আমার অশেষ সৌভাগ্য, সাহিত্য সাধনার সময় মাধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করে না, আমি কী লিখছি। আমার অসমাপ্ত লেখার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করেও সে কখনও আমাকে লজ্জায় ফেলে না। সে শুধু জানে অনেক দুর্গম সাহিত্যপথ পেরিয়ে আমাকে সাফল্যের মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। মানুষের জন্য সত্যকে খুঁজে পাবার জন্য কত লেখক বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। আর একজন সাহিত্য সহযাত্রী কুমারেশ মিত্তির তো ঘুম কাকে বলে তা প্রায় জানেনই না, দুর্বল শরীরেও রাত্রে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির দুর্লভ আনন্দ-লোক আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

মাধুরী, তুমি এভাবে আমার মাথার অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে আঙ্গুল না চালালেই পারতে। ওতে আমার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছে। আর একজন মানুষ অনেকদিন আগে ঐভাবে গভীররাতে যখন আমি ঘুম তাড়িয়ে পরীক্ষাপ্রস্তুতিতে নিমগ্ন হতাম তখন আমাকে শান্তি দিতেন। সুখ কথাটা ব্যবহারের লোভ হচ্ছে, কিন্তু এখন আমি শান্তি কথাটাকেই বেশী সম্মান দিতে আগ্রহী। আমি অবশ্যই আমার মায়ের কথা বলছি—কখনও তাঁর অসম্মান হতে দিইনি। কিন্তু মাধুরী, প্লিজ, তোমার এই বিশেষ স্নেহ, এই বিশেষ প্রশ্রয় আমার প্রাপ্য নয়। মনে আছে, হনিমুনের সময় একদিন পুরীতে তোমাকে বলেছিলাম, জেনেশুনে, ভালবেসে অথবা করুণা করে মানুষকে যত-ইচ্ছে ঠকিয়ে দেবে, কিন্তু নিজে কখনও ঠকবে না। ঠকে যাওয়ার মধ্যে পরাজয় লুকিয়ে রয়েছে। আমি চাই তুমি এবং আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব সময় জয়ী হই। আমরা জিতে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু ঠকে ছাড়তে রাজী নই।

মাধুরী, প্লিজ, আমি মুখ ফুটে বলতে পারছি না, কারণ আমার

জিভটা অবশ্য বোধ হচ্ছে আমারই মনের বিষে। দয়া করে তোমার স্নেহের ঐ স্পর্শ সরিয়ে নাও, তাহলে আমি একটু স্বস্তি পাবো, আমি অন্তত মনকে বোঝাতে পারবো, যারা আমাকে ভালবাসে তাদের ঠকানো আমারও ব্যবসা নয়। আমি এখনও অতো নিচে নামিনি। সত্যিকথা বলতে কি, নতুন লেখার বিষয় খুঁজে বেড়াবার উন্মাদনা এবং উত্তেজনায়, আমি নিজের কোনো হিসেবই ঠিকমতো রাখতে পারছি না। আমি যেন কেমন ধরনের হয়ে উঠছি, অথচ আমার প্রিয়জন মাধুরী। আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ মাধুরী এখনও অন্ধকারে রয়েছে, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

"সারারাত ধরে তুমি লিখেই চলেছো," ভোরের আগেই মাধুরীর কণ্ঠস্বরে একইসঙ্গে উদ্বেগ এবং গর্ব। (কর্মময় পুরুষদের স্ত্রীরা স্বামী-সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হলেও এক বিচিত্র গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।)

আমি মাধুরীর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। চেয়ারে বসে, আমি মনঃসংযোগ করছি, দেবী সরস্বতীর চরণ বন্দনায় আমার কোনো বিরতি নেই। কিন্তু কোথায় তিনি?

"কী হলো? অমন করে তুমি তাকাচ্ছো কেন?" মাধুরীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

আমি মাধুরীকে বলতে চাই, আমি লেখাটা নিজের আয়ত্তে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু জানো মাধুরী আমি কিছুতেই যেন এগোতে পারছি না।

মাধুরী মনে করিয়ে দিলো, "এর আগেও তো তোমার এমন হয়েছে। তুমিই তো সেবার বলেছিলে, চরিত্রগুলো মুরগির মতো বিনা প্রতিবাদে ধরা দিতে চায় না। শেষ হবার আগে একটু ছোটাছুটি হয়, ঝটপট করে।"

আমার মনে পড়ছে, কুমারেশ মিত্র সেবার আমাকে আরও খারাপ কথা বলেছিলেন। কলকাতা পৌরসভার পার্কে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ভোরবেলায় চিকিৎসকের নির্দেশে। তার আগে সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন। পার্কে আমাকে দেখলেন বাণীর বরপুত্র কুমারেশ মিত্র, স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে আমাকে তিনি নমস্কার করলেন। তারপর বললেন, "পৃথিবীর মানুষদের মতো সাহিত্যের চরিত্রগুলোও আজকাল ক্রমশঃ

বেপরোয়া এবং বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে। লেখকের কোনো কথা তারা শুনতে চায় না।"

একটু থেমে কুমারেশ মিত্র বলেছিলেন, "এটা না-মানারই যুগ—যদিও অসাবধানতাবশতঃ আপনি একটা বইতে বলে বসেছেন, এটা মেনে নেবার যুগ।"

কুমারেশ মিত্তিরের দুঃখের কারণ আছে। তিনি বললেন, "সমস্ত রাত ধরে ক্যারাকটারগুলোর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ালাম। শুধু তাদের পায়ে ধরতে বাদ রেখেছি—কিন্তু কোনো ফল হলো না, তারা পোষ মানলো না। পৃথিবীর সব জায়গায় বিশৃঙ্খলা, অথচ আর্টের উচ্চতম পর্যায়ে আমরা এখনও অবুঝের মতো সিমফনি খুঁজে বেড়াচ্ছি। লেখার ধর্ম পাল্টাবার জন্যে আমাদের প্রচারে নামতে হবে, না হলে এই বিশৃঙ্খল পৃথিবী থেকে গল্প-উপন্যাস উঠে যাবে। সুশৃঙ্খলা এবং ঐকতানের অভাবে আর্টের অপমৃত্যু হতে আর দেরি নেই।"

মুখে অপমৃত্যু এবং অসঙ্গতির কথা বলেন বটে কুমারেশ মিত্র, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ান সেই সংহতিকে যা তাঁর সাহিত্যকে কালজয়ী মহিমার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

মাধুরী আবার আমার চুলের মধ্যে আঙুলের চিরুনি বুলিয়ে দিচ্ছে আলতোভাবে। মাধুরী বোধ হয় বুঝছে আমার সমস্যার কথা, আমার সামর্থ এবং আমার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে না, আমার দুরাশার জন্যে অনেক যন্ত্রণা তোলা রয়েছে।

মাধুরী মিষ্টি পরামর্শ দিচ্ছে আমায়। "ঘাড়ে এবং মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঠাকুর অথবা স্বামীজী যাঁকে ইচ্ছে কিছুক্ষণ স্মরণ করো। ঠাকুর, শ্রীমা, বিবেকানন্দ এঁদের ছবি তো তোমার সামনেই রেখে দিয়েছি। ওঁরা তো কাউকে কখনও ফিরিয়ে দেন না।"

আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠছে। মাধুরী জানে না আমি সমস্ত রাত ধরে কোন অবুঝ গল্পকে বাগে আনার চেষ্টা করছি।

আমার বলতে লোভ হচ্ছে, "মাধুরী, তুমি অনেকদিন ধরে গল্প-উপন্যাস পড়ছো। তোমার জানা উচিত ওই তিনজন নমস্য জীব এখনকার গল্পের চরিত্রদের কোনো উপকারে আসতে পারেন না। ওঁদের যা কিছু বক্তব্য, যা কিছু উপদেশ তার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বাস। বিরূপ পরিবেশের মধ্যে গনগনে আগুনের মতো জ্বলছে বিশ্বাসের অঙ্গার। এই বিশ্বাসের ভেলায় চড়ে সেকালে অনেক গল্পলেখক

আপাততুস্তর পারাবার পেরিয়ে এসেছেন। কিছু লোক এখনও সর্বজ্বরহরবটিকার মতো, সমস্ত রোগের নিরাময়ের জন্য এই ত্রয়ীর বাণী পরম বিশ্বাসে সেবন করে চলেছেন। অন্ধবিশ্বাসীর সংখ্যা হয়তো ক্রমশই এই কঠিন সময়ে বেড়ে চলেছে, কারণ চাহিদামাত্র বিনামূল্যে এতো ভরসা হাতের গোড়ায় আর কোন মহাপুরুষ এগিয়ে দেবেন? পানের দোকানে, মিনিবাসে, ট্যাক্সিতে, আপিসের টেবিলে, ইউনিয়ন অফিসে, শয়নমন্দিরে, এমনকি দেহবিলাসিনীর গৃহেও তাই ঠাকুর-স্বামীজীর প্রভাব ক্রমশই বেড়ে চলেছে।"

কিন্তু কথাসাহিত্যে এখন অন্য এক ধরনের কাপ অফ টি, মাধুরী, তোমার বোঝা উচিত। সাহিত্যের নন্দন-কানন থেকে বিশ্বাস চির-দিনের জন্য নির্বাসিত হয়েছে। সন্দেহ, সংশয়, শঙ্কা, স্বার্থপরতার রাসায়নিক সার ছাড়া একালের গল্পবৃক্ষ এক মুহূর্তও বাঁচবে না। মানুষ পরস্পরকে যত সন্দেহ করবে, যত ঘৃণা করবে অপরকে, যত শোষণ করতে চাইবে অন্যকে, তত একালের গল্প জমে উঠবে, মাধুরী। বিশ্বাসের পরিবর্তে ঘৃণা, স্থিরতার বদলে দ্বিধা, ত্যাগের বদলে সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকেই আজকের উপন্যাসে প্রয়োজন। বড় বড় মানুষকে নিয়ে স্মৃতিসভা হয় কিন্তু গল্পের জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট মানুষ—তারা যত ছোটলোক হয় তত সুবিধে লেখকের। ছোটলোকদের অনেক মনমাতানো কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়।

মাধুরী এসব নিশ্চয় কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কারণ আমি নিজের বুকের ভিতরেই চুপিচুপি কথা বলছি।

মাধুরী তাই আবার বললো, "আমি যা বলছি শোনো। আমি চলে যাচ্ছি নিজের বিছানায়, তুমি ওঁদের শরণ চাও, ওঁদের সঙ্গে কথা বলো।"

মাধুরী সত্যিই মশারির মধ্যে ফিরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে আবার শুয়ে পড়েছে। সৃষ্টির যন্ত্রণায় কাতর লেখকদের সহধর্মিণীর দুঃসহ দাহের খবর পৃথিবীতে ক'জন রাখে? লেখকের কাছের এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়, অথচ সমুদ্রমন্থনে যদি কয়েকবিন্দু অমৃতর প্রাপ্তি ঘটে তখন এই আপনজনদের কথা কে মনে রাখে?

মাধুরী, তুমি আমার ওয়াইফ, অনেকদিন আমাকে ওয়াচ করছো, কিন্তু আজ আমাকে বেশ বিপদে ফেলে গেলে। এই তিনজন, যাঁদের ছবির সামনে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপধুনো জ্বালাও তুমি, তাঁদেরও ধৈর্যের

সীমা আছে নিশ্চয়। আমাদের অগম্য কোনো এক অক্ষয়লোকে হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগের মতো তাঁরা সারারাত নিশ্চয় আলো জ্বালিয়ে জেগে বসে থাকেন না।

মিস্টার দত্ত, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চ্যাটার্জি, আমাকে ক্ষমা করবেন। এই নির্জন মুহূর্তে আপনাদের জ্বালাতন করার বিন্দুমাত্র দুঃসাহস আমার ছিল না। গল্পলেখক হবার এই গর্ভযন্ত্রণা আমি স্বেচ্ছায় নিজের দেহে তুলে নিয়েছি, কেউ আমাকে বাধ্য করেনি বা ফুসলোয়নি। এখনই গর্ভধারণ করে এখনই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার পথ আমার নেই। দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে এই কষ্ট ভোগ করতে হবে নিজেকেই —কারও ঘাড়ে কোনো কষ্ট চালান করা যাবে না।

এই অসময়ে আপনারা আমাকে কী সাহায্য দেবেন? আমি তো ক্রমশই নিচের দিকে নেমে চলেছি। অধঃপতনের কোনো তলদেশ নেই বলেই এখনও কোনো ধাক্কা খাইনি আমি। কেবল একটা মন শিরশির-করা অবস্থা। আমি অনেক চেষ্টায় রিপন লেনের তনিমার মধ্য থেকে গরিমাকে সৃষ্টি করেছি, আমি তার দেহগৌরবের ওপর সুন্দর একটা কাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। আমি দুঃখিত, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চ্যাটার্জি, স্রেফ বিবাহবন্ধনের নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে থেকে তেমন চিত্তচমৎকারী গল্প আজকাল লেখা যাচ্ছে না। আপনি দেখুন, অমরেশ গাঙ্গুলীর রচনা 'নির্জনে নগ্ন' কেমন হাজার-হাজার কপি বিক্রি হচ্ছে। বাড়ির উঠোনে খুঁটিতে বাঁধা পুরুষ চরিত্রকে আপনি বিশ্বসংসার সম্বন্ধে কতটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিতে পারেন? দিলেও মানুষ তা বিশ্বাস করবে না।

হে পরমপুরুষগণ, লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনাদের ওপর শ্রদ্ধাশীল, আর আপনারা সারাক্ষণ তাদের বলে চলেছেন, ভক্তি এবং বিশ্বাসের কথা। ওই তো মাধুরী শুয়ে রয়েছে একাকিনী। ওর ভক্তি রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে আমার ওপর। এবং আপনাদের ওপরেও। কিন্তু বলুন এই দুটি মাত্র গুণসম্বল করে এই রাতদুপুরে আমি কী এমন গল্প লিখতে পারি যা সম্পাদকের, প্রকাশকের এবং পাঠকের হৃদয় জয় করবে? যা আমাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা দেবে, যা আমার রচনাকে অভিনব করে তুলবে।

মিস্টার এন এন দত্ত, আপনি বহু বছর আগে কিছু-কিছু সোজাসুজি কথা এদেশের মানুষদের বলেছেন। আপনি চেয়েছেন, প্রত্যেক মানুষকে চালু করবার জন্য একটা সেল্‌ফ-স্টার্টার প্রয়োজন—এবং বিশ্বাসের

স্টোরেজ ব্যাটারিই মানুষকে এই শক্তি যোগাতে পারে। আর একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন—সংসারের এই এবড়োখেবড়ো পথের নিত্য ঝাঁকানি সহ্য করবার জন্যে। ভক্তির শক অ্যাবজরবার। যত ঝাঁকানিই আসুক, ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে কেউ কখনও ছিটকে পড়বে না। যদিও সব ব্যাপারটা একটা কল্পনাবিলাস মাত্র, এর মধ্যে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু দুর্গম পথের যাত্রীরা ধরে নিয়েছে, কোনো এক মহাশক্তি হালের মাঝি সেজে তুফানের মধ্যেও তরী পার করবে।

মিস্টার দত্ত, আপনি বুদ্ধিমান কায়স্থ নাগরিক। কলকাতার কায়েতদের কত কূট বুদ্ধির পরিচয় আমরা লাস্ট দুশো বছর ধরে ইংরেজের তোষামোদে, আইনের মারপ্যাঁচে, আবার ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনেও পেয়ে চলেছি। আপনার নিজেরও নিশ্চয় চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধি (বিজনেস সেন্স) ছিল। না হলে আপনি অমন এক কালজয়ী মঠ-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারতেন না। আপনি হয়তো ভেবেছেন, বিশ্বাসের ব্যাটারিতে অচল মানুষ একবার স্টার্ট নিলে আর চিন্তা নেই—তার সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে, মানুষের সাফল্যের শেষ থাকবে না।

এই বিষয় নিয়ে গান লেখা চলে। সুর দিয়ে বললে মানুষ হয়তো বিশ্বাসও করবে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে আপনার প্রেসক্রিপশনের কোনো সদ্ব্যবহার-সম্ভাবনা নেই, স্বামীজী মহারাজ। আমি এরকম কোনো স্বপ্নবিলাসী ভক্তিবিশ্বাসী চরিত্র খাড়া করলে লোকে বলবে যাত্রার গল্প লিখছে! ঐ আসে, ঐ মহামানব আসে—আধুনিক গল্পে স্বয়ং রবি ঠাকুর পর্যন্ত লিখতে সাহস পেলেন না, আর আমি তো কোন ছার। যেখানে বিশ্বাস, যেখানে ভক্তি, সেখানে কেবল সুর। গল্পের পাখা নেই, উপন্যাস কখনও তাই ডানা মেলে ঊর্ধ্ব আকাশে উড়তে পারে না।

কিন্তু তবু আমি প্রিয় হতে চাই, নবীন পাঠকের জয়মাল্যের জন্য আমি এবার কাতর হয়ে উঠেছি। আমি তনিমা নামে একটি মেয়ের শরীর ও মন থেকে অনেক কষ্টে গরিমা নামে এক গরবিনীকে বের করে এনে আমার পছন্দমতো সাজাতে শুরু করেছি,—এমন এক গরীয়সী যে দেহ দেয়, কিন্তু কোনো গ্লানিতে ভোগে না। তার সান্নিধ্যে অনিবার্য ওরফে অনিন্দিত চৌধুরী একটা বেপরোয়া কিছু করতে উন্মুখ, ঠিক সেই সময়ে আমার স্ত্রী তথা আপনার এজেন্ট মাধুরী বলে কিনা আপনার শরণ নিতে, একমাত্র আপনিই নাকি আমাকে

র্থক সাধনার পথ দেখাতে পারেন।

মিস্টার দত্ত, কথাসাহিত্যের এই সংকটজনক অবস্থায় আপনি যে মার কোনো সাহায্যেই আসতে পারেন না তা আমার এবং আপনার না থাকলেও আমার স্ত্রী মাধুরী বিশ্বাস করতে পারছে না। ওই সর্বজ্বরহরবটিকার শিশিতে কিছু মানুষ আপনাকে স্থাপন করেছে টা আপনার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে।

কেউ কেউ বলে, ওঠো, জাগো, নিজেকে জানো—এইসব কথার ধ্য আপনি সব মানবিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। ন্তু আমি তো নিজেকে জানতে ব্যস্ত নই, আমি একজন দায়িত্বশীল লেখক হিসেবে আধুনিকতার আলোকে কিছু বিচিত্র সামাজিক নুষকে জানতে ব্যস্ত। তারপর আমি গভীর ধৈর্য নিয়ে তাঁদের নসিক মানচিত্র আঁকতে আগ্রহী। আমি এই মুহূর্তে অত্যধিক ত্রায় নিজেকে জেনে কী করবো? কিন্তু আপনার কোনো কোনো জেণ্ট চুপিচুপি বলে বেড়াচ্ছে—এই সংসারযাত্রায় আমরা তিলে লে কেবল নিজেদেরই আবিষ্কার করতে পারি, নিজেকেই যারা নলো না তারা কী করে অপরকে জানবে?

কী জানি! এইসব পরস্পরবিরোধী চিন্তা মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধায়। খকের পথ আটকে যায়। চিন্তার জ্যামজট বৃদ্ধি পায়—গল্প ছুতেই আর এগোতে চায় না।

আমি অস্বস্তিকর একটা অবস্থায় পড়ে রয়েছি। শীতের দুপুরে পন লেনের একটা প্রায় ভেঙে-পড়া একদা অভিজাত গৃহে আমি নিন্দিত এবং গরিমাকে স্থাপন করেছি। নারী-শরীর অনভিজ্ঞ নিন্দিতর সঙ্গে রয়েছে কিছু ঔৎসুক্য, আর গরিমার রয়েছে দেহ বং অনুজ্জ্বল অভিজ্ঞতা। অনিন্দিতর এখনও রয়েছে দৈহিক বিত্রতার বিপুল ঐশ্বর্য—(যা মানুষ মাত্র একবারই হারাতে পারে। পুল এই বৈভব যে হারায় সে বাকি জীবন সর্বস্বহারা দরিদ্রের মতো বাস করে।)

আমি এখন ঠাকুরের ছবিটার দিকেও একটু তাকাচ্ছি। মিস্টার দাধর চ্যাটার্জি, লেখাপড়ায় সড়গড় না হলেও আপনার গল্প বলার মতাটা বেশ ভালই ছিল। হে পরমহংস, বেস্টসেলার গল্পকার হতে লে যেসব গুণ প্রয়োজন তা আপনার মধ্যে সবই প্রবলভাবে দ্যমান। কুমারেশ মিত্তির আপনাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে স্টাডি করেছেন। টি ছোট মানুষের ছোট চিন্তার গল্প আটকে গেলেই এক ডোজ

কথামৃত পরিবেশন করে তিনি সামাল দেন। কিন্তু ঠাকুর, একসম
অনেকেই আপনাকে ভিটামিন হিসেবে গল্পে ব্যবহার করেছে
আজকের কথাসাহিত্য, বিশেষকরে একালের উপন্যাস, বড় জটিল এ
রসায়ন হয়ে উঠছে। এইভাবে জটিলতা বৃদ্ধি হতে চললে ভবিষ্যতে
সব গল্পকার কমপিউটরের দাসত্ব গ্রহণ করবেন—বিশাল বিশা
ইলেকট্রনিক গণকযন্ত্রের মধ্যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ঘটনার সংগ্রহ থে
বিভিন্ন মানুষ সম্বন্ধে একটা প্যাটার্ন বেরিয়ে আসবে। কমপিউটরে
পথনির্দেশ অনুযায়ী গল্প লেখা হবে। এইসব রচনায় লেখকে
ব্যক্তিগত যন্ত্রণার কোনো স্থান থাকবে না। লোকে হাসবে যখ
শুনবে এককালে মানুষকে মাথা খাটিয়ে গল্প লিখতে হতো; মানুষে
সমস্ত ইতিহাস যন্ত্রের মধ্যে চিরকাল নথিবদ্ধ থাকতো না; এক একজ
মানুষ নিজের সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের খেয়ালখুশি মে
ঘটনামালার সৃষ্টি করতো এবং তার চরিত্রদের অভীষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌ
দিতো।

ঠাকুর, কমপিউটর যুগের এইসব জটিল তত্ত্ব আপনার মাথায় প্রবে
করবে না—নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে কামারপুকুর এবং দক্ষিণেশ্বরের ম
যাতায়াত করে এইসব জ্ঞান আহরণ করা আপনার মতো সুপা
ইনটেলিজেণ্ট লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। চমৎকার আপনার মেথডলজি—
বোকা সেজে পাগল সেজে আপনি নিজের বুদ্ধিকে ঢেকে রাখতে চাইলে
অবিশ্বাসী লোকেরাও গলে গেলো। কিন্তু উনিশ শতকে বসবাস ক
আপনি কী করে আমাদের এই সময়কে এবং আগামীকালকে বুঝবেন
আপনি অবশ্যই ব্যাকডেটেড হয়ে পড়ছেন। তবু বিংশ শতাব্দীর এ
অপরাহ্ণে স্রেফ আপনার উপর ভরসা করেই হাজার হাজার লো
বসে রয়েছে। আপনি তাদের মাথা গরম করে দিয়েছেন! তাদে
প্রত্যেকের মধ্যেই নাকি স্বয়ং ঈশ্বর সশরীরে বিরাজ করছেন। ক্লা
ওয়ান থেকে বিনা পরীক্ষায় একেবারে টপ ক্লাশে প্রমোশন! এ
সেইসঙ্গে বিনামূল্যে গ্যারান্টি; কেউ ফেল হবার জন্যে জন্মায়নি, সব
ফার্স্ট প্রাইজ পাবে—এই সিদ্ধান্তপত্রে সিলমোহর লাগিয়েই বিধাতাপুরু
নামক এক দিলদরিয়া ভদ্রলোক প্রত্যেক মানুষকে বিশ্বসংসা
পাঠিয়েছেন। টম ডিক হ্যারি বলে কেউ নেই এই পৃথিবীতে, সবাই হি
ম্যাজেস্টি দি এমপারার অথবা হার রয়াল হাইনেস।

ঠাকুর, আপনি বাজারের অবস্থা দেখে, সুযোগ বুঝে, দুনিয়ার হা
প্রায় বিনামূল্যে গ্র্যাণ্ড ক্লিয়ারেন্স সেল লাগিয়ে দিলেন—দুনিয়ায়

তাপী বলে কিছুই নেই, সবাই শ্রীভগবানের অংশ। একবার শুধু মায়ের নাম নাও, আর কোনো পরীক্ষায় পাশ করতে হবে না, আর কোথাও কোনো অ্যাডমিট কার্ড দেখাতে হবে না। এতো সস্তায় 'সেল' দিলে, ঠাকুর আপনার দোকানে 'হরলালকার' থেকে বেশী ভিড় তো হবেই—হয়েছেও।

কিন্তু দয়া করে আপনি বলুন, আমি একজন গল্পলেখক হিসেবে দাগ রেখে যাই কী করে? যত মত তত পথ, যিনি কেষ্ট তিনিই 'খেস্ট', যার যা প্রাণ যেভাবে চায় সেভাবেই একবার ডাকো, জীবনের রেলগাড়ি সবাইকে যথাসময়ে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের ইস্টিশনে ফ্রি পাশে পৌঁছে দেবে, এ-ভাবতে কার না সুখ হয়? কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আমি একজন গল্পলেখক হিসেবে কী করবো? লোকাল ট্রেনের ভেণ্ডারের মতো কামরায় কামরায় কবিরাজ কালীপদ দের আশ্চর্য মলমের নমুনা প্রচার ছাড়া আমার আর কোনো কাজ থাকবে না। সর্ব যন্ত্রণার সহজ মুক্তি, মুহূর্তে ফললাভ, চোখের নিমিষে শান্তির নমুনা বিতরণই তখন আমার মতো অভাজনের একমাত্র কর্ম হয়ে উঠবে। কিন্তু এরজন্য তো স্রষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই।

ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী তিনজনের ছবির দিকে আমি একের পর এক তাকাচ্ছি। আমার শ্রীমাকেই পছন্দ। বেশী বাণী নেই, একটু চুপচাপ ভাব। যে যেমন সে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন—এই কথাগুলোই কানের কাছে গুনগুন করছে। যে যেমন তাকে তেমনভাবেই নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে দেওয়া ভাল, তাহলে এই পৃথিবী কখনও গল্পহীন হয়ে উঠবে না। সকলের জয়লাভ গ্যারান্টিড হলে নাটকীয়তা হারিয়ে যায়, জেতার উল্লাস থাকে না।

মিসেস সারদা চ্যাটার্জি (ডটার অফ মিস্টার রামচন্দ্র মুখার্জি), আপনি চাটুজ্যেদের কূটবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়েই বোধ হয় বিশ্বসংসারকে স্পেশালি স্টাডি করে চুপি চুপি একখানি বোমা ছেড়েছেন, ("যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো।")

অতি উত্তম প্রস্তাব, জননী সারদামণি। কিন্তু এই উপদেশ মেনে নিলে গল্প-উপন্যাস পড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে! অপরের দোষ দেখাবার জন্যেই তো আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্ম। আমাদের একমাত্র কম্মোই তো হলো অপরের দোষ দেখানো, নিজের লোককে পর করে দিতে পারলে আমরা পদক পাই, জগৎকে নিজের করে নেবার

কথাই ওঠে না সেখানে। না, মা ঠাকরুণ, আপনিও এই মুহূর্তে আমার কোনো কাজে লাগবেন না, আপনি জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন, এখন বরং রূপোর ফ্রেমে বাঁধা হয়ে ভক্তদের জ্বালানো ধূপধুনো এনজয় করুন।

ঠাকুর, ওরফে মিস্টার জি ডি চ্যাটার্জি, আপনি ওইভাবে আমার দিকে নজর দেবেন না। লোকের দিকে ওইভাবে তাকিয়ে যাকে-তাকে যখন-তখন ছুঁয়ে দিয়ে আপনি অনেক লোকের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন, সংসারের কোনো কাজে লাগলো না তারা। অমন যে অমন গিরিশ, তিনিও আপনার সংস্পর্শে এসে গোল্লায় না গেলে বোধ হয় আরও কতকগুলো ভাল নাটক লিখতে পারতেন। ওই যে সেদিন কোথায় শুনলাম, কমিটমেন্টই কথাসাহিত্যিকের সবচেয়ে বড় শত্রু। গল্পলেখক কারও ঘরের বউ নয় যে সারাক্ষণ একজনকেই ভজনা করতে হবে। সাহিত্যের স্রষ্টার কখন কী মতিগতি যত বুঝতে মুশকিল হবে ততই তার স্বাধীনতার জয়ধ্বনি, ততই তার লেখায় মুক্তির স্রোত। যেজন্যে এবার আমিও অপ্রত্যাশিত হতে চেষ্টা করছি, ঠাকুর।

ঠাকুর, আপনি ভাল লোক, শতখানেক টপক্লাশ শর্টস্টোরির জন্ম দিয়েছেন, মানুষের জটিলতার মধ্যে ঢুকেও সহজ থাকবার উপায় বের করেছেন। একজন অর্ডিনারি লোক হিসেবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু গল্পলেখক হিসেবে আমি কোনো পার্টির খাতায় নাম লেখাতে পারবো না, আমি প্রজাপতির মতো যেখানে খুশি উড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখছি! আমার বউই অনেকদিন আগে বলেছে, "তুমি কারও দাসত্ব করবে না। যে পরের চাকর সে কখনও জাতলেখক নয়।"

ঠাকুর, আপনার দিকে তাকিয়ে শুধু আমার মনে হচ্ছে, সব মানুষকে সমানভাবে দেখবার যে-ক্ষমতা পরমেশ্বরের আছে তা চরিত্রের স্রষ্টা হিসেবে আমাকেও গোপন রাখবার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু দেখুন, এই দ্বিতীয় বিধাতা ইত্যাদি ভূমিকাটি লেখকের ঔদ্ধত্য বাড়িয়ে তাকে শিকেয় তুলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি ওইসব মিথ্যা গর্বে গরীয়ান হতে চাই না। আমি শুধু চাইছি, আমার সৃষ্ট চরিত্রদের নিয়ে গল্পের নাটক জমে উঠুক।

এখন যে-কাহিনীর মধ্যে আমি ডুবে রয়েছি সেখানে নাটকীয়তার মধ্যে রয়েছে অনিন্দিতর শারীরিক পবিত্রতা, যা এই রিপন লেনের একটি ঘরে এখনই সে হারিয়ে ফেলতে পারে। বহু যত্নের, বহু মূল্যের এই কলুষহীনতা কি সামান্য কারণে মুছে যাবে একটি যুবকের শরীর ও

মন থেকে চিরতরে? হে বিশ্বের অধিবাসীগণ, শৃণ্বন্তু, তোমরা শ্রবণ করো, তোমরা সাক্ষী থাকো।

ঠাকুর, তবু আপনি আমাকে একটু বাড়তি আস্কারা দিচ্ছেন না। আমার বক্তব্যগুলো আদৌ আপনার কানে প্রবেশ করছে কিনা তাও সন্দেহ হচ্ছে। আপনার মুখ দেখে হঠাৎ মনে হচ্ছে, আপনি বলছেন, পৃথিবীর সব পুরুষ ও নারী পবিত্র হয়েই জন্মগ্রহণ করে, পবিত্রভাবেই তারা বড় হয়ে ওঠে। তারপর পাকেচক্রে কে তা বিসর্জন দেয় তা আর এক ইতিহাস। ওই যে রমণী, রিপন লেনের রুদ্ধকক্ষে যে কয়েকখানা নোটের বিনিময়ে অপরিচিত অনিন্দিতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, যার স্পর্শে অনিন্দিত শেষ পর্যন্ত কৌমার্যের ঐশ্বর্য হারিয়ে কলুষিত হতে পারে, তারও একদিন ঐ একই ঐশ্বর্য ছিল। সেও ছিল পবিত্র এক শরীরের সৌভাগ্যবতী মহারানী।

ভারি সুন্দর কথা। আমি তো তনিমা লাহিড়িকে ঐ আলোকে দেখার চেষ্টা করিনি। আমি তো ধরেই নিয়েছি, শরীরকে নিজে খাটিয়ে সংসার যাপনের জন্যেই যেন তার জন্ম হয়েছে।

ভোর হয়ে আসছে। দূরে হঠাৎ যেন একটা পাখির ডাক শুনতে পেলাম। এই পাখিরাই ভোরকে পৃথিবীতে ডেকে আনে বলে আমার অনেকদিনের ধারণা ছিল। তারপর একদিন রাশিয়ান লেখকের লেখা পড়লাম। আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যরা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিরোধকারী স্বাধীনতাপ্রেমীদের হত্যা করলো। কিন্তু লেখক হতাশ হতে দিলেন না পাঠকদের। বললেন, আলোকের দিন আগতপ্রায়, কারণ ভোরের পাখিদের গুলি করে মেরে প্রভাতের আগমন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। খুব সুন্দর লাইন। মানুষকে নাড়া দেয়, কিন্তু আমার ঐ ছোটবেলার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলো যে পাখিরা গান গেয়েই স্বর্গলোকের ভোরকে আমন্ত্রণ জানায়।

এখনই এই মহানগরীতে আরও অনেক কাণ্ড ঘটবে। এখনই দূরের মসজিদে আজানের বাণী প্রসারিত হবে। কতদূর থেকে এই আহ্বান শোনা যাবে। আমার এসব শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমার সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সব লোক জেগে উঠে একসঙ্গে আমার ওপর নজর রাখলে আমার লেখা নিয়ে বিশেষ

কিছুই করে উঠতে পারবো না। আমারও দোষ আছে। অনিন্দিত ও গরিমাকে আমি বেপরোয়া ও দুঃসাহসী করে গড়ে তুলিনি। ওদের দুজনের লজ্জা আছে—ওরা দুজনেই মানুষের ভিড় সহ্য করতে পারে না। কিন্তু প্লিজ, অনিন্দিত, তোমার শরীরকে এই মুহূর্তেই মলিন কোরো না, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ওদের দুজনকে নির্লজ্জ করে গড়ে তুলতে গল্পলেখক হিসেবে আমার কী আপত্তি ছিল? রিপন লেনের দেহ-লিজিং-এ থেকে এবং বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সেখানে ভরদুপুরে উপস্থিত হলে লজ্জার কোনো প্রয়োজন থাকে না তো। ওরা নির্লজ্জভাবেই তো অঙ্কিত হতে পারতো। অন্তত সেইটাই তো স্বাভাবিক হতো। ওখানে তো কেউ লজ্জা প্রত্যাশা করে না। কিন্তু তা তো আমি করিনি। আমি এখন আবার নতুন পয়েন্ট তুলে ওদের স্বভাব নষ্ট করবো না।

অনিন্দিত ও গরিমার শয়নশয্যায় আমি এখনই উঁকি মারবো। ওখানে লজ্জা না থাকলে সব সম্পর্কটাই বীভৎস হয়ে উঠবে – সেই রস পরিবেশনের ক্ষমতা আমার নেই। আমি চিৎকার করি না, আমি চুপিচুপি কথা পছন্দ করি। আমি লাজলজ্জা বিসর্জন দিতে এখনও অভ্যস্ত নই।

আমার কী সৌভাগ্য! আমার সহধর্মিণীর লেলিয়ে-দেওয়া তিনজন মহাত্মা এখনও আমাকে কোপানলে ভস্মীভূত করছেন না। আমার জটিল প্রফেশনাল সমস্যার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই দেখাচ্ছেন না তাঁরা। এই একটি কারণে এই ত্রয়ীকে সম্মান করা যায়। তাঁরা মানুষের কোমরে দড়ি পরিয়ে নিজের গোয়ালে টেনে আনায় বিশ্বাস করেন না। যার যেখানে যেপথে যাবার ইচ্ছা সেপথে তাকে যেতে দিলে অনেকসময় সমাজের যে ভাল হয় এই সত্যকথাটুকুও অনেক ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বিশ্বাস করতে চান না।

অনিন্দিত ও গরিমা, তোমাদের ঘরের দরজায় এবার একটু টোকা পড়ুক। অনেকক্ষণ ধরে তোমরা নিভৃতে সময় ব্যয় করেছো। আমি ধরে নিতে পারি, এই সময়ের মধ্যে অনিন্দিতর শারীরিক দ্বিধা অনেকটা কেটে গিয়েছে। আর গরিমা, শয্যার রণাঙ্গনে তোমাকে তো দ্বিধাগ্রস্ত রমণী হিসেবে কোনো ভূমিকা দেওয়া হয়নি। তুমি যত সহজ হবে, তুমি যত সত্যের কাছাকাছি থাকবে, অপ্রিয় কথাও তুমি যত প্রিয়ভাবে বলবে, ততই তুমি সবার প্রিয় হয়ে উঠবে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বহু পাঠকের সম্মান তোমাকে অর্জন করতেই হবে। অতি কঠিন

তোমার ভূমিকা, গরিমা!

শরৎচন্দ্র-মার্কা সাহিত্য পড়ে-পড়ে অনেকেই তোমাদের সম্বন্ধে কিছুটা সম্মান আগাম গচ্ছিত রেখেছে, আবার অনেকে, বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের কোনো সহানুভূতি নেই তোমাদের ওপর। তোমরা দিনের পর দিন, একের পর এক, অন্যের নিরাপত্তা ও শান্তি নষ্ট করে চলেছো। তোমাদের দাপট না থাকলে অনেক নারীর সংসার আরও সুখের হয়ে উঠতো।

চমৎকার! অনেকক্ষণ বন্ধ থাকার পর বুকের টিভিটা যেন আবার চালিয়ে দিয়েছি। গরিমা, এইমাত্র তোমার সুখময় শয্যাকক্ষের দৃশ্যটা রঙীন পর্দায় আবার ফুটে উঠলো। যারা আগের দৃশ্য দেখেনি, এইমাত্র দর্শকের আসনে যারা বসলো, তারা ভাববে কোনো পারিবারিক দৃশ্য। বোধহয় স্বামীস্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনো এক আধুনিক সিন!

অলস কোনো অপরাহ্নে তুমি কফির কাপে চামচ নেড়ে-নেড়ে পানীয় তৈরী করছো নিপুণা কোনো গৃহবধূর মতো। না, সম্পূর্ণ গৃহপালিত গৃহবধূ হয়তো তুমি নও। তাহলে তোমার মুখ, চোখ, দৃষ্টি, তোমার দেহভঙ্গী আরও অনেক সংরক্ষণশীল করতে হয়। তুমি যেন কোনো আপিসের মধুরহাসিনী রিসেপশনিস্ট, অপারেটর অথবা একান্ত সচিব। হাফ্-ডের কাজ শেষ করে একটু আগেই তুমি বাড়ি ফিরে এসেছো। স্বামীও যেন এইমাত্র অন্য কোথা থেকে ফিরেছেন। কিংবা আরও একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যাক। তোমাদের যুগলমিলন খুবই বিরল হয়, এই শনিবারের অপরাহ্ণটুকু ছাড়া। অনেক আশা নিয়ে ওভারটাইমের লোভ বিসর্জন দিয়ে গরিমা লাহিড়ি কর্মস্থল থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু এসে দেখে স্বামী বেরিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত। কর্মস্থল থেকে হঠাৎ ডাক এসেছে—এসময়ে অফিসে যাবার কথা নয়, কিন্তু নিশ্চয় কোথাও কিছু অঘটন ঘটেছে।

এই রকম দৃশ্য রচনায় জনপ্রিয় লেখক অপরূপ গুহ সিদ্ধহস্ত। আগে জঙ্গল নিয়ে লিখতেন। এখন জঙ্গলের পশুগুলোকে শার্টপ্যান্ট শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে কলকাতার ড্রইংরুমে নিয়মিত চালান করে যাচ্ছেন। চটুল প্রেমের সঙ্গে, আধুনিক ভঙ্গিতে, কুশলতার সঙ্গে ওয়ার্কিং গার্ল বধূ হাফডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বামীকে গরম কফি পানে আপ্যায়ন করছে। কিন্তু মুখে দুঃখের ছায়া, কারণ এক সপ্তাহ ধরে এই উইকএণ্ডটুকুর দিকে সে তাকিয়ে ছিল। কী দরকার ছিল অফিসের কাজে

স্বামীকে শেষ মুহূর্তে ডেকে পাঠানো ? কিন্তু যা পাঠক-পাঠিকারা ইতিমধ্যেই জানে, অথচ নবীনা ও আধুনিকা নায়িকা জানে না, স্বামীদেবতা আসলে অফিসের কাজের ছুতো করে পালাচ্ছেন অন্য এক মৃগয়ায়। মৃগয়ায় সেই আদিম যুগের সত্য—লক্ষ্যভেদই সব নয়, অনুসন্ধানেই আনন্দ। সুতরাং ফলাফল নায়িকা এবং পাঠক-পাঠিকা সকলেরই অজ্ঞাত।

এই দৃশ্যের শেষে একটি সাময়িক বিদায়ের সুমধুর চুম্বন থাকবে। তারপর নায়িকা স্বামীদেবতাকে বিদায় দিয়ে ক্যাসেটরেকর্ডার নিয়ে বসবে, নতুন এক মুড সৃষ্টির জন্যে। ততক্ষণে অপরূপ গুহ নিপুণ নাট্যকারের মতো ঘটনার ঘনঘটা সাজিয়ে নেবেন একের পর এক। প্রথম নাটক ঃ পালে অবশেষে বাঘ পড়বে। অফিসের পিওন সত্যিই খবর দিতে এলো সায়েবের ডাক হয়েছে। মেমসাহেব যতই বলছেন, সায়েব আগেই খবর পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, বেয়ারা বিশ্বাস করতে চাইছে না কারণ অফিসের ম্যানেজার তাকে এই মাত্র খবর দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে স্কুটারের পিছনে সঙ্গিনীকে চাপিয়ে নায়ক চলেছে কোন নতুন রোমাঞ্চে। আর মৃগয়ার মৃগীটি হঠাৎ বলছে, আকাশে মেঘ জমেছে, আজ থাক, বাড়ি ফেরা যাক।

অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা এরপর রীতিমত প্রস্তুত। নায়ক বাড়ি ফিরে আসবে পিলিয়ন শূন্য করে—এবং শুরু হবে পুরুষ ও রমণীর এক জটিল সংঘাত। যার প্রতিদানে বধূ নায়িকা একদিন নির্মম প্রতিশোধ নিতে চাইবে, তার অফিসের এক বান্ধবীর স্বামীর মাধ্যমে। বান্ধবী সাহায্য করতে প্রস্তুত। তারই স্বামীর সঙ্গে নায়িকা স্কুটারবাহিতা হয়ে আলিপুরের বাগানের কাছে ঘুরে বেড়াবে, আর বান্ধবী যাবে খবরটা স্বামীদেবতার কাছে ফাঁস করতে। কারণ স্বামীদেবতাকে আগে জানানো হয়েছে তার স্ত্রী অফিসের জরুরি কাজে হঠাৎ আটকে পড়েছে। এবার সহকর্মী বান্ধবী আকাশ থেকে পড়বে—সে কী কথা! কোথায় ওভারটাইম ? আজ তো অফিসের থিয়েটার। বান্ধবী ও সে তো দুজনেই নির্ধারিত ছুটির একঘন্টা আগেই পথে বেরিয়ে পড়েছে।

এই দৃশ্যগুলো আমার থেকে শতগুণ সুন্দর কমপোজ করেন অপরূপ গুহ। তিনি যা নিপুণভাবে দেখিয়ে দেন তা হলো, বড় বড় শহরগুলোর সমস্ত গাছ কাটা হয়ে গেলেও সেগুলো আসলে জঙ্গলই আছে। আর তার সঙ্গে বাড়তি বোনাস, স্ত্রীর প্রতিশোধ স্বামীর ওপর। দুর্বল কোথাও সবলের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে এ-দৃশ্য পাঠকের পাষাণ হৃদয়েও অপার আনন্দের সূচনা করে। রসের রসায়নে এই নিয়ম—

এর কোনো বিচ্যুতি নেই। তাই এবার স্বামী যত উত্তেজিত হয়ে উঠবে, যতই সে বোকার মতো ছোটাছুটি করবে, বান্ধবী যতই সাহায্য করবে তার স্বামীর সহায়তা দিয়ে, ততই ব্যাপারটা মধুর হয়ে উঠবে। একবারও কেউ জিজ্ঞেস করবে না সংসারে এমন ঘটে কিনা ?

আমি ঐ ধরনের গল্প ফাঁদতে পারি না। লোকে ঢাক ঢোল সানাই নিয়ে বসে আছে—তারা সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করবে আমার ওপরেও গুহমহাশয়ের ছায়া পড়েছে, আমি তাঁর নকল করছি। সৃষ্টির সাম্রাজ্যে অনুকরণ নামক অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।

নিষ্ঠুর পাঠক সবসময় আমার কাছে গভীর কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত চায়—কোনো পুরনো মূল্যবোধের ওপর আমি নতুনভাবে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করি, এই তাদের প্রত্যাশা। আমার দুর্ভাগ্য, নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের সহজ দৃশ্যগুলো আমার সাহিত্যে আনা চলবে না। আমাকে এমন কিছু ভাবনা খুঁজে বের করতে হবে যা অন্য কেউ এখনও খুঁজে পায়নি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমাকে এই কর্ম করতে হবে, সন্ধান করতে হবে তার, যা অপরের কাছে ধরা দেয় না। হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু সাহিত্য-সংসারের এই নিয়ম। প্রভু পাঠক যাকে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার নির্দেশ দেবে তাকে তাই মেনে চলতে হবে।

যতই অভিযোগ করি, তনিমা অর্থাৎ গরিমার এই দৃশ্যটি আমার বেশ ভাল লাগছে। একজন সুদর্শন মহিলা তার নিভৃত শয়নকক্ষে একজন অশান্ত যুবককে কফি পানে আপ্যায়িত করে শান্ত করার চেষ্টা করছে। নিজের হাতে তৈরি উষ্ণ পানীয় তুলে দিচ্ছে এমন একজনের হাতে যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেও তার কোনো পরিচয় ছিল না।

এই দৃশ্যটি আমাকে রিলিফ দিচ্ছে। ওই যে কারেন্সি নোটের সলজ্জ বিনিময় হয়েছে, ওই যে নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে ব্যবসায়িক গন্ধ সবকিছু কলুষিত করে তুলছিল, তার মধ্যে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা, যা নোংরামি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে। সামান্য এক কাপ কফি দোকানে কিনলেও এক টাকা লাগতো না। কিন্তু পরিবেশকে সহনীয় করে তুলছে। কফি কোম্পানির লোকেরা জানে না, কত বিচিত্র অবস্থায় এই পানীয় কত পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলতে পারে।

আমি তো এ দৃশ্য সম্বন্ধে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত নই। দ্বিধা আসে তখনই যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হয়। যেমন এক মফস্বলী লেখকের গল্পে ফারপো রেস্তোরাঁর এক দৃশ্য ছিল। নায়ক

তার প্রতিষ্ঠা দেখাবার জন্যে নায়িকাকে নিয়ে বিকেল পাঁচটায় ফারপোর অভিজাত রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেছে। এই পর্যন্ত চমৎকার। ফারপো নামে বড় রেস্তোরাঁ আছে চৌরঙ্গীর ওপরে—সেখানে তাঁর নায়ক-নায়িকাকে প্রবেশ করিয়ে দেবার অধিকার অবশ্যই প্রত্যেক লেখকের আছে। একটু পরে ওয়েটার এলো। অর্ডার চাইলো। নায়ক-নায়িকার ভাগ্যবিধাতা-লেখক এইবার গর্তে পা ফেললেন! বললেন, 'ডবল ডিমের মামলেট ও চা নিয়ে এসো।' ফারপোতে বিকেলে যাঁরা পদার্পণ করেন তাঁরা যদি অপরাহ্ণে ওই খাদ্যের অর্ডার দেন যা কলেজ স্ট্রীট, শিয়ালদহ, শ্যামবাজারে স্বাভাবিক, তাহলে অভিজ্ঞ মহলে যা সৃষ্টি হয় তার নাম হাস্যরস। এই সময় রোমান্স হোঁচট খেতে বাধ্য—যদি লেখকের সূক্ষ্ম কোনো অনুভূতি থাকে।

রিপন লেনে আমিও কিছু একটা লোকহাসানো করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু তনিমা লাহিড়ি, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি নিজেই চায়ের কথা তুললে। আমি কিন্তু এই আতিথেয়তা প্রত্যাশা করিনি।

গরিমা ও অনিন্দিতকে এই দৃশ্যতে সুন্দর মানাবে। নির্লজ্জ কেনা-বেচার বাইরেও যেন অবশেষে কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে। রিপন লেনের গরিমা শুধু কফির মগ এগিয়ে দিচ্ছে না, সে মধুর হেসে জিজ্ঞেস করছে, চিনি ঠিক হয়েছে কিনা। এই জিজ্ঞেস করার মধ্যে কোনো অপরিচ্ছন্নতা নেই। অনিন্দিতও ভাবতে পারতো, ওই যে কারেন্সি নোট বিনিময় হয়েছে ওর মধ্যেই দুকাপ কফির দাম ধরা আছে এবং সেই অনুযায়ী সে আর একটু চিনি চেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু অনিন্দিত এই মুহূর্তে আদর্শ ভারতীয় অতিথির ভূমিকা পালন করছে, কফি তিক্ত হলেও চিনি চাইতে সঙ্কোচ আসে।

কফির কাপ সাক্ষী রেখে পৃথিবীতে কত সংখ্যাহীন সান্নিধ্যের ইতিহাস দেশে দেশান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে। সিগারেট বিনিময় যদি পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, তাহলে কফি তার ভিত্তিপ্রস্তরের সিমেণ্ট। পাশাপাশি দুখানা ইটকে একত্রে গ্রথিত করতে তার তুলনা নেই।

গরিমা এই মুহূর্তে ব্যবসায়ে ব্যস্ত নয়। অনিন্দিতও কিছুক্ষণের জন্য খরিদ্দারের ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

গরিমার মধ্যে সহজ সরলতা আছে। সে জিজ্ঞেস করছে, "আপনি কেমন কফি পছন্দ করেন, হাল্কা না কড়া?"

এই পছন্দের কোনো আইনকানুন নেই। কে যে কেন লাইট অথবা স্ট্রং কফি পছন্দ করে তা বিশ্বসংসারে কেউ জানে না। কিন্তু

নিপুণা গৃহকর্ত্রী ব্যাপারটা মনে রাখেন ভবিষ্যতের জন্য। তখন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা সিমবল হয়ে দাঁড়ায়।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে আলাপটা অনিন্দিত আরও অন্তরঙ্গ করে তুলতে চায়। গরিমার কোনো আপত্তি নেই—বরং উৎসাহ। তাঁর অতিথি ক্রমশ যে প্রাথমিক লজ্জা কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠছে তাতেই তার আনন্দ।

আমার অসুবিধে হচ্ছে। আমি অনিন্দিতকেও একজন প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদী লেখকের ভূমিকায় দেখতে চাই। গরিমাকে কোথায় কীভাবে সে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবে তা এখনও ঠিক করেনি অনিন্দিত। এমন মিষ্টি মেয়েকে মধুর কোনো পরিবেশে দেখালেই তো সুন্দর হতো। কিন্তু যে মেয়ে সংসারবন্ধনের বাইরে এভাবে একলা বসবাস করে তাকে বাংলা গল্পে একজন ইনডিভিজুয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কী?

এই যেমন ধরুন দুনিয়ার কত মানুষ তো কতরকমের প্রফেশনে ব্যস্ত। তাদের নিজস্ব কুশলতা আছে এবং সেই কুশলতা নিয়ে তারা নিজের কাজ করে যায়।

কত লোক তো সংসারে একা থাকছে। একলা লোকের সংসার তো ইউরোপ-আমেরিকায় হুড়মুড় করে লাখে লাখে বেড়ে যাচ্ছে। গরিমা লাহিড়িও সেইভাবে জীবনযাপন করছে। মানুষ যে যুগল অবস্থা ছাড়া সুখে বাঁচতে পারে না তা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সিঙ্গল সংসারে। আসলে একলা-একলা বাঁচবার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি, সেইভাবেই শ্রীভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

গরিমার একটি হাত এবার তার অতিথির হাতের ওপর এসে পড়েছে। কফির ধূমায়িত কাপ দুজনের পাশেই রয়েছে। এই হাতটি বেশ নরম ও ঠাণ্ডা। তার মধ্যে বেচা-কেনার কোনো কলঙ্ক লক্ষ্য করতে পারছে না অনিন্দিত। এতোদিন ধরে তার গল্পে যেসব নির্মল প্রথম প্রেমের ছবি এঁকেছে, সেখানে যেসব নরম-নরম মিষ্টি-মিষ্টি মেয়েলি হাতের বর্ণনা দিয়েছে অনিন্দিত, তার সঙ্গে এই হাতের তো কোনো তফাত নেই।

এই হাতটির মালিক হাতখানি যেন অতিথিকে উপহার দিয়ে দিয়েছে। এই উপহারে ঈষৎ আগ্রহ না দেখালে বোধহয় ঠিক দেখায় না। অনিন্দিত সেই হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—আঙুলগুলো, নখগুলোর আকার লক্ষ্য করছে। নখগুলো ঈষৎ রঙীন, একটা নখ আকারে একটু বড়ো।

এতোদিন সুন্দরী মেয়েদের যেসব মিষ্টি মিষ্টি, নরম নরম, ঠাণ্ডা

ঠাণ্ডা হাত এঁকেছি, তাঁর মডেল ছিল একটি। সেই হাত অবশ্যই মাধুরীর। এই দুটি হাতকে বারবার অনুভব করে আমি বহু নারীর হাতের বর্ণনা করেছি বিভিন্ন কাহিনীতে। আমি মধ্যিখানে বৈচিত্র্য আনবার জন্য বিভিন্ন উপন্যাসে নারী-শরীরের গুণগানগুলো সাবধানে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেখান থেকে কিছু নিলে সে তো চুরি করা হবে। অনুকরণ এবং চৌর্যবৃত্তি সৃষ্টিশীলদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ—সাহিত্যের সৌন্দর্যকাননে এই অপরাধীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শরীরের সন্ধানকর্মে চিকিৎসক ও চিত্রশিল্পীর সঙ্গে লেখকরাও সেই আদিযুগ থেকে সারাক্ষণ নিয়োজিত রয়েছেন। চিকিৎসার ছাত্ররা নিরন্তর দেহব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মানব শরীরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হচ্ছেন। শিল্পীর কলাভবনে নিয়মিত ডাক পড়ে মডেলের, বিবস্ত্রা রমণীদেহের নিয়মিত নিবিড় নিরীক্ষণ শিল্পশিক্ষার অঙ্গ—শুধু এই লেখকের বেলায় দেহের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোনো প্রকাশ্য সুযোগ নেই। সমস্ত কিছুই আন্দাজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ পৃথিবীর কথাসাহিত্যে যুগ-যুগান্ত ধরে দেহের জয়গান।

আমি আজকের সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে আগ্রহী। আমি চাই অনিন্দিত কবি, কথাশিল্পী এবং চিত্রশিল্পীর চোখে রমণী-শরীরকে তিলে তিলে ব্যবচ্ছেদ করুক, পদে পদে তার বিজয়িনী হবার রহস্যটি স্মৃতির সেফ কাস্টডিতে সঞ্চিত রাখুক। তবেই তো সে রমণী-শরীরের সফল মানচিত্রকার হয়ে উঠতে পারবে।

এখন অনাবৃত শরীর আবিষ্কারে মুগ্ধ হবার মুহূর্ত নয়, অনিন্দিত। তোমাকে ছাত্রের নিষ্ঠায় অনেক কাজ করতে হবে, তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করো এই আমার প্রত্যাশা।

গরিমার ফুলের মতো হাত নিয়ে এখন খেলা নয়—এখন নিরীক্ষণের সময়। গরিমা চায় তুমি প্রাপ্তির আনন্দ উপভোগ করো, আর দ্রষ্টা চাইছে তুমি শিল্পীর দায়িত্বে বিভোর হয়ে থাকো। অনিন্দিত, তুমি একবার শরীরসাহিত্যের অভিধান স্মরণ করো। নারীর ভুজমূলাবধি মণিবন্ধ-পর্যন্ত অংশের নাম বাহু। বাহুপাশে আবদ্ধ শরীরের বর্ণনা তোমার অজানা নয়। অথবা বাহুলতা, যার উৎপত্তি বাহুমূল থেকে যার অপর নাম বগল—শব্দটা আমার ভাল লাগে না। নাকে একটা দুর্গন্ধ ধাক্কা দেয়। বরং বাহুকক্ষ বলে একটি শব্দ আছে যা প্রয়োগের অভাবে মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। শব্দের এই ভীষণ অসুবিধা—সব সময় সার্কুলেশন রাখতে হবে, চলমান না হলে শব্দ বিলীয়মান হবেই।

বাহুলতা শব্দটির কিছু নিজস্ব খেয়াল আছে—কৃশ এবং শোভন অঙ্গ ছাড়া প্রয়োগ নিষেধ। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই—গরিমার বাহু অবশ্যই মেদভারে শ্লথগতি নয়। তার শরীর অবশ্যই কৃশ ও শোভন। বাহুর অপর নাম ভুজ। গরিমার দক্ষিণ হাতটিই এই মুহূর্তে আমাদের ধৈর্যহীন নায়কের একমাত্র আশ্রয়। ভুজচ্ছায়া শব্দটিও লিখে ফেলার লোভ লাগছে, কিন্তু তার ব্যবহার নিষেধ, কারণ বাহুবলের যে আশ্রয় তার নাম ভুজচ্ছায়া—গরিমা লাহিড়ির এই হাতটি বড় কোমল, কোনো রমণী-শরীরেই বলের অস্তিত্ব শোভন হয় না।

দুই ভুজের মধ্যবর্তী যে বিরাট নিষিদ্ধ অঞ্চল তার নাম ভুজান্তর অথবা বুক। না, সেখানে এখন পথভ্রষ্ট পথিকের বিশ্রাম নেওয়ার সময় নয়। অনিন্দিত এখন আনন্দসঙ্গিনীর নবীন বাহুলতার ঊর্ধ্বাংশ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসুক।

অনিন্দিত, এখন যে শব্দটি গরিমার সান্নিধ্যে তুমি উপযোগী করে তুলতে পারো তার নাম পাণিপল্লব। পল্লবসদৃশ্য করতল। পাণির সীমা নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে সেই কোন আদি যুগে—মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলি পর্যন্ত হস্তাংশ।

তুমি এখন গরিমার রঙীন নখগুলির গৌরব লক্ষ্য করতে চাও. করো। নেলপালিশের দাক্ষিণ্যে নেল কথাটি বাংলাতেও বেশ মিষ্টি হয়ে উঠেছে! সবাই এখন বোঝে। কিন্তু এই নখের আরেকটি মিষ্টি নাম ছিল একদা—পাণিজ। যা পাণিতে জন্মগ্রহণ করে। হাতের চেটোকে বলা চলতো পাণিতল। এখন করতল বললেই শরীরের মানচিত্রে অনেকে দিশেহারা হয়ে যায়। অনিন্দিত, এখন তুমি পর্বতা-রোহীর মতো ঊর্ধ্বযাত্রা করো একবার—পাণিপদ্ম থেকে আরোহণ শুরু করে ভুজান্তরের স্বর্ণকুম্ভ তোমার লক্ষ্যস্থল হোক।

গরিমা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি নবীন এই আগন্তুককে। শরীরের নানা অঙ্গ দিয়ে ঠিক ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু হয়, কিন্তু সে তো কিছুক্ষণের জন্যে। মানুষ আজকাল যে বড় ব্যস্ত তা গরিমা অবশ্যই জানে। গরিমা অবশ্য কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে না, অভিযোগও নেই বিন্দুমাত্র। অতিথির মুখে দেহের প্রশস্তিও তাকে বিমুগ্ধ করে না।

গরিমা এবার কফির কাপে চুমুক দিয়ে অনিন্দিতর হাতটি মুঠোয় নিয়ে একটু চেপে দিয়েছে। সুদেহিনী রমণীর পাণিপল্লবে নিগৃহীত পুরুষহস্ত—মধুর এই যন্ত্রণার (অথবা শাস্তির) নাম পাণিপীড়ন। কিন্তু

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে চমৎকার এই শব্দটির। এর অর্থ এখন শাস্তি নয়—বিবাহ।

গরিমা মৃদু হাসছে। সে আহ্বান করছে—গঙ্গা-যমুনার মতো দুই হাতের মিলন হোক। না, চিন্তার কারণ নেই—গরিমা ইংরেজী মতেই হ্যাণ্ডশেক করতে আগ্রহী। করমর্দন অথবা অর্ডিনারি পাণিপীড়ন, যা পরিচয়ের সূত্রপাত ছাড়া আর কোনো অঙ্গীকারের দায় বহন করে না।

পঞ্চাঙ্গুলির শৃঙ্খলে বন্দী এখন আরেকজনের পাঁচটি আঙুল। এই পাঁচটি আঙুল নিয়ে দেহপূজারী সায়েবরাও আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো সমারোহ করতে পারেননি। অনিন্দিত এখন এই বিশেষ ঐশ্বর্য উপভোগ করুক। পাঁচটি আঙুলই সমান নয়। প্রতিটি অঙ্গ রমণী-শরীর ও মনের বিভিন্ন বাণী পাঠাতে অভ্যস্ত। প্রাচীন পিতারা অনেক লক্ষ্য করে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা নামে তাদের চিহ্নিত করেছেন।

অনিন্দিত এবার নানা প্রশ্নে রমণী-শরীরের অভিজ্ঞতার সীমা প্রসারিত করুক। কফির কাপ হাতে গরিমা পরম ধৈর্য সহকারে একের পর এক উত্তর দিক। তার বিকশিত শরীর এখন অবারিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। সে এই আগন্তুককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত।

গরিমা কি একবার একটু সন্দেহ করবে তার অতিথিকে? কুমারেশ মিত্তিরের এক বইতে সেরকম এক পরিস্থিতি ছিল। অতিথি ছদ্মবেশে যিনি এসেছেন তিনি আসলে একজন সরকারী ইন্সপেক্টর। সরলমনা আনন্দদায়িনী তা বুঝতে পারেনি। সে যত কিছু বলার সব অনর্গল বলে চলেছে এবং অবশেষে আর একদিন যখন আইনের রক্ষীরা তার ফ্ল্যাটে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন সেই মহিলা চিনতে পারলো ছদ্মবেশীকে।

সেই ছদ্মবেশী কী ভেবে শেষ মুহূর্তে ক্ষমা চাইতে এসেছিল। আনন্দিনী ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে বলেছিল, "ছিঃ! আপনারাও লোক ঠকান।" তারপর তুরুপের তাস খেলেছিলেন কুমারেশ মিত্তির। এই বিনোদিনী এবং ছদ্মবেশীকে বিবাহ বন্ধনের সুবিধা দিয়েছিলেন।

আমি এসব কাণ্ড বাধাতে পারবো না। গরিমা কোনোদিন অনিন্দিতর গরীয়সী গৃহিণী হতে যাচ্ছে না, তা সবাই এখনই জেনে রাখুক। ওইসব সস্তা মারপ্যাঁচে আমি মোটেই বিশ্বাসী নই।

অনিন্দিত এখন অতি সহজ ভাবে পঙ্কজাক্ষীর কৃপাদৃষ্টি উপভোগ করছে। পাণিপীড়নের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে সে একটা ভুল করে

বসেছে। চাপটা বোধহয় বেশী জোরে পড়ে গিয়েছে। গরিমা প্রথমেই মৃদু আর্তনাদ করে উঠেছে—উঃ।

মুহূর্তের মধ্যে হাত সরিয়ে নিয়েছে অনিন্দিত। বেশ লজ্জা পেয়েছে সে। কিন্তু গরিমা ততক্ষণে সামলে নিয়ে বলেছে, "কিছু নয়, একটু বেশী চাপ পড়ে গিয়েছিল।" যাতে আরও লজ্জা না বাড়ে সেজন্য গরিমা এবার কী করতে পারে?

আমি আগেকার মতো অনভিজ্ঞ থাকলে এই সময় কলম কামড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতাম। হয়তো নায়কের মুখে দুয়েকটা ইংরেজী আক্ষেপ ছুঁড়ে দিতাম। কিন্তু এখন আমি জানি, আমার কাজ অনিন্দিতর ওপর আলোক নিক্ষেপ করা নয়। আমার একটিই দায়িত্ব, আমাকে দ্রুত গরিমাকে প্রীতির আলোকে স্নান করাতে হবে। তার প্রতিটি বাক্যে ও কর্মে সে যেন মধুরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সে নয়, কিন্তু তাকে সকলের সহ্যসীমার মধ্যে সুরক্ষিত করতে হবে।

গরিমা সামান্য ব্যথা পেয়েছে। সে-ব্যথা এখন অস্বীকার করলে গল্পটা শরৎ অ্যাণ্ড কোং মার্কা হয়। দেখো, কী নীরব সহ্যশক্তি! এই রমণী কষ্ট পেয়েও পুরুষের কর্কশ নিপীড়ন সহ্য করে নেয়। এইসব মেয়েরই তো বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এদের মুখের মৃদু কথাই পৃথিবীর মানুষের কানে ঢুকতে চায় না, অন্তরের কথা তো দূর অস্ত!

এই দৃশ্য-সৃষ্টি আমাকে অবশ্যই আগে চিন্তায় ফেলে দিতো। অল্পে চিন্তায় পড়ে যাওয়াই যে আমার স্বভাব সে-কথা তো মাধুরী বিবাহের পরেই আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এই চরিত্রদের নিয়ে চিন্তায় পড়লে মাধুরীর মৃদুভর্ৎসনা শুনতে হতো। "ওরা তো রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, ওদের গায়ে একটু আঁচড় না-হয় লাগলোই—সে নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কেন?"

আমি মাধুরীকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। গল্পের মানুষদেরও সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা আছে। তারাও সুবিচার পাবার যোগ্য। এই অবিচার এড়ানোর উত্তেজনায় আমি সারাক্ষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকি।

আসলে যা বোঝাতে পারি না, দায়িত্ব রয়েছে আমার ঐসব মানুষদের ওপরে। বিধাতা তার কর্তব্যকর্মে যতটা অসাবধানী হতে পারেন, লেখকের তা মানায় না। এই দায়িত্ববোধের অভাবে, এক

এক সময় আমি দু'একটা চরিত্রকে অযথা ছোট করেছি, কষ্ট দিয়েছি। এখন তা পুনরাবৃত্তি অবশ্যই নয়।

দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজাতে গিয়েও এই দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করতে হয় গল্প লেখককে। অমরেশ গাঙ্গুলী একবার মদের সান্ধ্য আসরে বলেছিলেন, "মা, তুমি আমাকে বিশ্ব সংসারের ধোপা করে পাঠালে এর থেকে ভাল করতে। দুনিয়ার লোকের ময়লা কাপড়ের বাণ্ডিল পিঠে করে আমি সারাদিন ঘুরে বেড়াই, তারপর সব যন্ত্রণা ভুলবার জন্যে রাত্রে একটু কারণবারি পান করি।"

আমি কখনও মানুষের নোংরামি নিয়ে মাতামাতি করি না। আমি বুঝি ধোপার বোঝার থেকেও খারাপ হলো দায়িত্বের বোঝা। গল্পের চরিত্রগুলো যে-অবস্থায় যখন যা করবে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব লেখকের।

কোন সময়ে কার কী করা শোভন তা ভাবতে আমার অনেক সময় লেগে যায়। জীবনে অথবা গল্পে ছন্দছাড়া কিছু একটা ঘটে যাক তা কে চায়?

ওই যে গরিমার হাতের আচমকা যন্ত্রণা তা আমি অবশ্যই ওকে দিয়ে নীরবে সহ্য করিয়ে শরৎ অ্যাণ্ড কোং মার্কা কিছু করবো না। আমি অপরূপ গুহর মতো প্রত্যেক ছোট ছোট যন্ত্রণাকে নিপীড়নের সিম্বল বলেও উপস্থাপিত করতে পারবো না। আমি জানি অপরূপ গুহ এই চান্স পেলেই কিছুক্ষণ শরীরের কাব্যময় অথচ বন্য বর্ণনা দেবেন. আর তখনই তাঁর পাঠক-পাঠিকা শিউরে উঠে মনে-মনে বলবে, আব খোলাখুলি বলতে হবে না। আমরা সমস্ত ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি—এই গল্পের পুরুষটি এই মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক শারীরিক কষ্ট দেবে, এটি তার প্রস্তুতি মাত্র। আরও দু'এক প্রস্থ বৃহত্তর শারীরিক নির্যাতনের জন্যে পাঠক-পাঠিকা নিজেদের মানসিক প্রস্তুতি ঘটাবে। শরীরকে নিয়ে যাদের বড় বেশী মাথাব্যথা তারা অপরূপ গুহকে আঁকড়ে ধরে আছে। মাধুরী কারও নিন্দা করে না, কিন্তু সে একদিন বলেছিল তুমি কখনও মিস্টার গুহর মতো হবার চেষ্টা কোরো না। তুমি নিজের মতো থাকো, শুধু যদি পারো তোমার চরিত্রগুলোর অঙ্গে উদ্বিগ্ন হবার দুর্বলতা ত্যাগ করিয়ে দাও।

এবার আমি তাই করবো, মাধুরী। আগে হলে আমি অনেকক্ষণ ধরে অনিন্দিতর লজ্জা দেখাতাম। হয়তো হাত ভেঙে গিয়ে ডাক্তার ডাকাডাকিও হতো। কী পিকুলিয়র সিচুয়েশন বুঝুন—শীতের নির্জন দুপুরে আনন্দসঙ্গিনীর গৃহে অজ্ঞাত অতিথির হাতে দৈহিক নিপীড়ন।

ামিনী ছুটে এসেছে, পাশের খাবারের দোকান থেকেও লোক ছুটে সেছে। এমন ঘটনা কখনোই অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়নি নিশ্চয়। ভামিনী খাঁজ করছে, কেন এই অঘটন ঘটলো। ইচ্ছাকৃত এই নির্যাতনের ারণ কী ? আর বেচারা গরিমা নিজের শরীরের লজ্জা ঢাকতে ব্যস্ত।

কিন্তু মাধুরী, এখন আমাকে কল্পনার যন্ত্র চালু রাখতে হচ্ছে না, ামি অতি সহজে স্রেফ স্মৃতি থেকেই কয়েকটা দৃশ্য লিখে ফেলতে ারবো।

গরিমা যখন দেখলো তার তরুণ অতিথি লজ্জা পেয়েছে তখন সে রিস্থিতি সহজ করতে সচেষ্ট হলো। মিষ্টি হেসে দক্ষিণ করপল্লব নিন্দিতর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, যন্ত্রণা যখন দিয়েছেন তখন হাত লিয়ে দিতে হবে!

অনিন্দিত নীরবে মধুর নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে। আর গরিমা লছে, "এই তো! কী সুন্দর হাত বুলিয়ে দেন আপনি!"

অনিন্দিত কিছুটা লজ্জায় পড়ে, কিছুটা উদ্বেগে তার হাত বুলনো ন্ধ করছে না। সে জানতে চাইলো, ব্যথা কমলো কিনা?

গরিমার রসিকতা, "এতো সুন্দর হাত বুলোলে, ব্যথা সারতেই হবে না!"

যে এতো মিষ্টি কথা বলে সে প্রথম পরিচয়ের সময় দরজার কাছে াড়িয়ে অমন কঠিন হয় কী করে? অনিন্দিত এবার একটা প্রশ্ন করে রিমাকে একটু বিরক্ত করতে চায়।

গরিমা কী ভাবলো। তারপর বললো, "উপায় কী? চেনা এবং চেনা লোকের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য।"

বেশ মূল্যবান কথা বলেছে গরিমা। সে নিজেই স্বীকার করছে, চেনা লোকই আবার কত অল্পসময়ে চেনা হয়ে যায়।

আনন্দসঙ্গিনীদের চেনা-অচেনার দর্শনটা আমাকে ভেবেচিন্তে তৈরি রতে হচ্ছে না। অনিন্দিত শুধু মনেমনে কথা দুটো নাড়া-চাড়া রছে। ব্যথা পাওয়া হাতটা গরিমা নিজেই সস্নেহে সরিয়ে নিয়েছে।

এখন সখার ক্লান্তিবিনোদন করছে অঙ্গুলি ফোটনের মাধ্যমে। নিষ্ঠা থেকে শুরু করে সে ধীরে-ধীরে তর্জনীতে এসে স্তব্ধ হলো। ঙ্গুষ্ঠমোটন সে ম্যানেজ করতে পারে না। তার শরীরে অত শক্তি ই। তাছাড়া আচমকা আঘাত দেবার ভয়ও রয়েছে।

"অচেনা এবং চেনার মধ্যে কে বেশী বিপজ্জনক?" অনিন্দিত ়যোগ বুঝে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছে তার সঙ্গিনীর দিকে। এর মধ্যে

রসিকতা আছে, আবার জীবনদর্শনও আছে ?

দেহের ডালি সাজিয়ে কোমল শয্যা আলো করে বসেছিল গরিমা। শাড়ির আঁচল সামলে নিলো গরিমা। তার চোখ দুটো এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আপনি এবার আমাকে চিমটি কাটছেন। অচেনা থেকে চেনারাই যে বেশী বিপজ্জনক তা সংসারের সমস্ত মেয়েই জানে।"

কথাটা খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল অনিন্দিতর। গরিমার মতো মেয়েদের জীবনে এমনিই নিশ্চয় ঘটে থাকে। চেনা মানুষের হাতে বিপদে-পড়া গরিমার গল্পটা শোনা প্রয়োজন। তা থেকে হয়তো কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

গরিমা কিন্তু রসিকতা করলো। "এই ধরুন আপনি। অচেনা অবস্থায় দরজার গোড়ায় যত বিপজ্জনক ছিলেন এখন এই চেনা অবস্থায় তার থেকে অনেক বেশী বিপজ্জনক। ওখানে আপনি আমার হাত মুচড়ে দিলে আমি ভাবতে পারতাম আপনার লক্ষ্য আমার শরীর নয়, শরীরের অলঙ্কার। আমি চিৎকার করে লোক ডাকতে পারতাম।"

"আর এখন ?"

"এখন আপনি যেহেতু চেনা, আমি বুঝতে পারছি আপনি আমাকে সুখ দিতে গিয়ে কষ্ট দিয়ে ফেললেন। আমার এখন উঃ—বলাও শোভা পায় না।"

অনিন্দিত অবশ্যই গরিমাকে একটু বোকা ভাবতে পারে। রমণী শরীরের অলঙ্কার বলতে শুধু স্বর্ণালঙ্কারই বোঝায় না—মহামূল্যবান অলঙ্কারগুলি যৌবন সমাগমে ঈশ্বর নিজেই প্রস্ফুটিত করে থাকেন পরিচিত তস্করদের নজর ঐসব অলঙ্কারের দিকে।

কিন্তু অনিন্দিত এখন এক মনে গরিমার মিষ্টি কথা শুনে যাক সে তেমন কিছু বিস্ময় প্রকাশ করবে না। যেসব কথা কলমে ডগায় আনতে লেখককে সাধ্যসাধনা করতে হয় তা যে এমন সহজে বিনোদিনীর মুখ দিয়ে ঝরে পড়েছে তা জনসাধারণ জানতে পারলে লেখকের কোনো সম্মান থাকবে না।

সুখ দিতে গিয়ে কষ্ট দেওয়া! কী সুন্দর কথা। পৃথিবীতে অনেক কষ্টের ইতিহাসের পিছনেই সুখের তাড়না রয়েছে!

গরিমা, তোমারও নিশ্চয় এমন একটা ইতিহাস আছে; এই রিপন লেনেই নিশ্চয় তোমার জীবনের শুরু নয়। কোনো রমণী শরীরই এই ভাবে এই রিপন লেনে পল্লবিত হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক

া লাহিড়িরই কিছু জিওগ্রাফি, কিছু হিসট্রি থাকা প্রয়োজন।

অনিন্দিত ভাবছে, আনন্দসঙ্গিনীদের এই ইতিহাসটা সাধারণত া হয়। কেউ কেউ ভাগ্যস্রোতে চেনা মানুষের সঙ্গে নিরাপদ য় থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর সময়ের রসিকতায় সেই চেনা ই অচেনা হয়ে যায়। কেউ ইচ্ছে করে আনন্দময়ীও হয় না, কেও হয় না। পাকে-চক্রে পরিবেশের ষড়যন্ত্রে ব্যাপারটা ঘটে

রিমার পিছনে যে-গল্পটা লুকিয়ে আছে সেটা কী রকম? কোথায় ; কোথায় বড় হয়ে ওঠা। কোথায় সেই আশ্রয় হারিয়ে নতুন পাবার আশায় বেরিয়ে পড়া?

া, আনন্দসন্ধানী অতিথিকে ঐসব বিষয় বিস্তারিতভাবে শোনানোর আগ্রহ নেই গরিমার। গরিমা বলছে, "দুঃখ শোনবার জন্যে কেউ আসে না। এখানে আসতে হয় দুঃখ ভোলবার জন্যে।"

কিন্তু গরিমার জীবনের একটা মোটামুটি ছবি এঁকে নিতে হবে মনে। তার দুঃখের মুক্তোটা বুকের কোথায় লুকনো আছে সযত্নে খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু গরিমা প্রিয়-আগন্তুকের সব প্রশ্ন হেসে উড়িয়ে দিতে । "কোনো দুঃখ নেই আমার। কেন দুঃখ থাকবে?" মধুর দ জানাচ্ছে দেহগরবিনী। যেন দুঃখের সাহসই হবে না অমন শরীরের দিকে কু নজর দিতে।

একা থাকার দুঃখ? কথাটা এবার তুলতে পারলে মন্দ হতো না। ঐশ্বর্যময়ী শরীর এলিয়ে দিয়ে গরিমা কেমন মিষ্টিভাবে বললো, তো একাই আসে। এবং একাই তো তাকে চলে যেতে হয়।"

মা হঠাৎ একটা দামি কথা বলে ফেললো। "ছোটবেলায় র শ্যামদেশীয় যমজ দেখেছিলাম। মানিকজোড়ের মায়ের সে চোখের জল—ডাক্তারবাবু এদের কেটে আলাদা করে দাও।"

অর্থাৎ মানুষকে ঈশ্বর একা থাকবার মতো ব্যবস্থা করেই পৃথিবীতে য়েছেন। মাঝে-মাঝে যুগল হবার সাধ জাগে শরীরে ও মনে, সে তো সাময়িক বাসনা। আসলে প্রত্যেক মানুষই একা।

ব্যাপারটা এমনভাবে আমার মাথায় কখনও ঢোকেনি। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রিয়জনের সঙ্গে পৃথিবীতে পাঠালে আমাদের কান্না তা না। আমরা আলাদা থেকেই মাঝে মাঝে সান্নিধ্যসুখ উপভোগ চাই।

অপরূপ গুহ এই আইডিয়াটা পেলে এখনই একটা অ
উপন্যাস ফেঁদে ফেলবে। বিচ্ছেদ ও মিলন পরস্পরবিরোধী দুই
পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ ও রমণীকে সারাক্ষণ জর্জরিত করছে। বিপ
এই বোধ থেকেই মানব-মানবীর সম্পর্ক স্থির হচ্ছে যা একদিন
সমাজের ভিত্তিমূলকে নাড়া দেবে। উল্টো-সিধে অনেকগুলো ঘ
পরপর সাজিয়ে যাবে অপরূপ গুহ—একবার একাকীত্বকে গ্রহণ ক
তার নায়িকা, তারপর কোনো দুর্বল মুহূর্তে অর্ধ বিবস্ত্র শ
সান্নিধ্যের তৃষ্ণায় সে কাতর হয়ে উঠবে। আবার সান্নিধ্যকালে
জন একাকীত্বর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। শেষটায় কী বক্তব্য
করবে অপরূপ গুহ তা আমি কোনো কষ্ট না করেই বলে
পারি। অপরূপ গুহ কোনোরকমেই নিজের ব্যক্তিগত মত প্র
করবে না। দুই অমোঘ পরস্পর বিরোধী শক্তি সম্পর্কে সে
প্রকাশ করবে এবং ইঙ্গিত দেবে যে মানব-মানবীর ইচ্ছার বিরু
দুর্জয় দুই শক্তি এই পৃথিবীতে সহ অবস্থান করছে। কাছে টা
দূরে সরিয়ে দাও, আবার কাছে টানো—এই বিচিত্র খেলাই চির
পৃথিবীতে চলবে।

হেঁয়ালিভরা এই পথ আমার ভাল লাগে না। আমি সোজা
মানুষকে দু'দলে ভাগ করে দিতে চাই যারা কাছে টানে অথবা
সরিয়ে দেয়। অদৃশ্য কোনো মহাশক্তির ঘাড়ে কামনা-বাসনার
দায়দায়িত্ব অর্পণ করে আমি নিজেকে দায়মুক্ত করায় বিশ্বাসী
আমি চাই, গরিমা এ-বিষয়ে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে আসুক। স
জানুক, একাকীত্বের আশ্রয়ে গরিমা লাহিড়ি সুখী না অসুখী। সু
পেলে সে কোনদিকে ভোট দেবে?

আমি তাই গরিমাকে ধোঁয়াটে আলো-আঁধারিতে রাখতে
না। গরিমাকে আমি এমনভাবে উপস্থিত করতে চাই যে মানু
দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দিক।
সম্বন্ধে কোনো কিছুই অজানা থাকবে না। পাঠকের মনে হবে
তো চোখের সামনে রিপন লেনের মেয়েটি রয়েছে। অনিন্দিত
এক যুবক-লেখক চুপিচুপি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে এই গরিমা লা
সম্পর্কে যা-যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার সমস্তটাই পাঠকের সম্প

কিন্তু গরিমা লাহিড়ি কেমন করে একটা থ্রি-ডি জীবন্ত চরিত্র
উঠবে? সেইটাই তো লেখার টেবিলে বসবার শুরু থেকেই আম
যন্ত্রণা দিচ্ছে। নতুন এক মানবী আবিষ্কারের বিস্ময় অনুভূতি পাঠ

্বার দিতেই হবে। গরিমাকে দেখে যেন মনে হয়—কী আশ্চর্য! সেই শরীরিণী রমণী! ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে অথবা মিনিবাসের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে একে বসে থাকতে দেখলে আমি নিশ্চয়ই করতে পারতাম না যে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পাড়ার এক সরু গলিতে এক জীবন এর জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল গরিমাকে আমি প্রথমে কোনো এক স্ট্যাণ্ড থেকে ধরি। অন্য অনেক ওয়ার্কিং গার্লের মতো সেও ানে অপেক্ষা করছে মিনিবাসে ওঠার জন্যে। জীবিকার তাগিদে, জীবন-ের ধারাবাহিকতায় ঘর ছেড়ে যারা বাইরে বেরিয়ে এসেছে সেইসব দের জন্য নিরাপদতম এই শহর। এইসব ওয়ার্কিং রমণী থেকে মাত্র আলাদা নয় আমাদের এই গরিমা। সবাই এখানে সমাজের ঈষৎ বিপন্ন। সবাই চেষ্টা করেও ঘড়ির সীমারেখা সন্ধান করতে হ না, অথচ সময়কে অসম্মান করার ইচ্ছে কারও নেই, সবাই তাই -মাঝে রিস্টওয়াচের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করছে।

এই সময়েই অনিন্দিত আসুক ট্রামে চড়ে সেই রাজপথে। ন্দিত যখন একজন তরুণ লেখক, তখন সব পরিস্থিতিতে সবরকম তোলার স্বাভাবিক অধিকার তার রয়েছে।

এই এক মস্ত সুবিধা কথাসাহিত্যিকের। মানবজীবনের এমন না দিক নেই যার সম্বন্ধে সে না আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে— ড়ঘর থেকে আরম্ভ করে শ্মশান পর্যন্ত সর্বত্র তার লক্ষ্য রাখার ার। মহানগরীর জীবনযাত্রায় অনভিজ্ঞ অনিন্দিত প্রশ্ন করুক, াতা যে পুরুষ মানুষের শহর বলে বদনাম আছে তা তো আর সত্য ইংরেজ বাসিন্দারা একদা দুঃখ করে গিয়েছেন এমন পুরুষসর্বস্ব ়গরী বিরল, রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও কোনো স্থানীয় মহিলার মেলে না, সন্দেহ হয় এখানে আদৌ কোনো রমণী বসবাস করেন । অর্থের তাগিদে দেশবিদেশের সংখ্যাহীন পুরুষ এখানে ছাউনি ছেন। অনিন্দিতর তখন মনে পড়ুক সেই বিখ্যাত উক্তি—যে গাষ্ঠীতে শিশু নেই, বৃদ্ধ নেই, রমণীর নিরন্তর মঙ্গলস্পর্শ নেই তা যাই হোক জনপদ নয়—পুরুষসর্বস্ব ছাউনির জীবনযাত্রা কখনও বিক হতে পারে না।

এরপর হয়তো মজা করার একটু স্কোপ পাওয়া যেতো। প্রতি ট্যাণ্ড এতোগুলি করে সুবেশিনী এবং স্মার্ট মহিলার জমায়েত

দেখে অনিন্দিত ভাবছে কবে এমন পরিবর্তন হলো কলকাতার? কী কারণে নগরীর রমণীরা গৃহ ও গৃহকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এইভাবে একসঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লো? আগেকার কাল হলে সন্দেহ হতো, এরা সবাই রাগ করে বাপের বাড়ি চলেছে। এখন তো তা বলবার উপায় নেই।

অনিন্দিত তারপর ভাবতে পারতো এরা কারা? কোথায় এদের কর্মস্থল? এরা কোন কর্মে নিজেদের কুশলী করে তুলেছে?

এক-আধটা অফিস-ভ্যান এসে কিছু সুবেশিনীকে পথ থেকে তুলে নিক। ভিতরে আরও সহযাত্রিণী রয়েছেন। ভ্যানের বাইরে কোম্পানির নামটি পরিচ্ছন্নভাবেই লেখা রয়েছে। অনিন্দিতর মনে পড়ুক তার এক তরুণ বন্ধুর কথা, যে বলেছিল সি-এ পরীক্ষায় পাশ করে আমি অমুক কোম্পানি ছাড়া কোথাও অ্যাপ্লিকেশন করবো না, ওইখানে আমার চাকরি চাই-ই। অনিন্দিত প্রশ্ন করেছিল, ওই কোম্পানির আর্থিক রেজাল্ট বুঝি ভাল? খুব প্রফিট করছে বুঝি? মাইনের সঙ্গে অনেক অ্যালাউন্স দেয় বুঝি তরুণ কর্মীদের? বন্ধু বলেছিল, "মোটেই না।" প্রফিটের মাত্রাও যে নিম্নমুখী তাও জানা গেলো।

আসলে, প্রতিদিন এক বাস বোঝাই সুশোভিতা সুন্দরীকে দেখা যায়: রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বন্ধু অনেক কোম্পানির বাস পর্যালোচনা করে দেখেছে, সুদর্শনা সহকারিণী নিয়োগে এই কোম্পানিই এক নম্বর। বোঝা যায় কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের রুচিবোধ বলে বস্তু আছে। এই সময়েই একটা ধাক্কা আসে। কোনো সাবজেক্টেই মন খুলে বাংলায় কিছু লেখা যায় না। এই গুড এবং গুড লুকিং মহিলা সহকারিণীদের পার্থক্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কে একখানা বেস্টসেলার লিখে বসে আছে! নতুন কথা বলবার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই। এই হয়েছে মুশকিল, অনিন্দিত চৌধুরী ভাবতে পারতো।

ভাল ভাল বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখার জন্যে কয়েক ডজন লেখকের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলেছে হন্যে হয়ে তাঁরা গল্পের ভাগারগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। না, এই ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা যাবে না পরস্পরকে লিখিতভাবে গালাগালি না-করার একটা অলিখিত আচরণবিধি লেখকসমাজে রয়েছে। বরং এই জিনিসটাই একটু ঘুরিয়ে দেওয়া যাক্! বলা যাক্, অনিন্দিতর দুঃখের শেষ নেই—দুঃসাহসী দুর্গমপথের যাত্রী হিসেবে কঠিন সব বিষয় ও চরিত্রগুলিকে ইতিমধ্যেই সাহিত্যের মন্দিরে সংগ্রহ করেছেন পূর্বসূরীরা। তরুণ অনিন্দিতর একমাত্র দুঃখ, লেখকই যখন হতে হবে তখন আরও আগে জন্ম হলো না কেন? তাহলে সে

শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়. বনফুল, বিমল মিত্রর বিষয়গুলো আরও ভালভাবে গুছিয়ে লিখতে পারতো।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা পড়তো। অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ লেখকরা ভাবতেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে, কিছুটা হিউমারও হতো। অথচ যা সত্যিকথা অর্থাৎ ওই একই ভাগাড়ে একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃখটাও প্রকাশ করা যেতো।

ধরুন, সুন্দরী মেয়েদের রাজপথ থেকে সংগ্রহ করে সুন্দর কোম্পানির সুন্দর বাস কোনো অজানা উদ্দেশে দ্রুত পাড়ি দিলো। এই দারুণ দৃশ্য স্বস্তিতে অবলোকন করার জন্যেই যেন অনিন্দিতর ট্রাম গতিহীন হয়ে পড়েছে। কলকাতার ট্রাম ড্রাইভাররাও মানুষ, তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ঠিক সেই সময় আরও যারা স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রইলো তাদের নিয়ে অনিন্দিত তার লেখায় একটু রসিকতা করুক।

সে লক্ষ্য করুক, লাঠি এবং অ্যালুমিনিয়ামের বাটি হাতে একজন মধ্যবয়সিনী গাড়িতে উঠে পড়েছেন। এই মহিলা যে ভিখারিণী তা স্পষ্ট। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভিখারিণীরাও তাদের ভিক্ষাস্থলে যাবার জন্যে ট্রাম-বাস ব্যবহার করছেন!

এর পরেই নজরটা গরিমার দিকে পড়ে যাক। একটি টাইট ফিটিং সালওয়ার পরে সে একই ট্রামে উঠুক। এই মহিলা কোন কর্মক্ষেত্রে চলেছেন? এঁর মণিবন্ধেও ঘড়ি। তিনি কিন্তু কোনোপ্রকার ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন না। অনেক মানুষের এই স্বভাব—বিশেষ করে এদেশের মেয়েরা বড় শান্ত, তাঁরা প্রকাশ্যে নিজেদের উদ্বেগ বা ব্যস্ততা প্রকাশ করেন না। বাইরের এই শান্তভাবই মেয়েদের বিশেষ গৌরব দেয় এবং এই কারণেই বোধহয় মেয়েদের হার্ট অ্যাটাক কম হয়।

কিন্তু কোন কাজে চলেছেন এই মহিলা? এই কৌতূহল জেগে উঠুক অনিন্দিতর মনে। ইতিমধ্যে অপরিচিতা গরিমার শরীরকে নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করুক অনিন্দিত। শরীরের রঙ, লাবণ্য, ত্বকের মসৃণতা এইসব এক মুহূর্তে দেখে নিক অনিন্দিত। আজকাল সাবান ও ক্রিমসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের দৌলতে আর একটি ইংরিজী শব্দ মেয়েদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে—খুঁতবিহীন চামড়া—ত্বকের কোথাও কোনো দাগ নেই। চাঁদের মতো মুখ, অথচ চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো এবড়োখেবড়ো নয়।

রমণী-শরীরের আকার সম্বন্ধেও একটা ইঙ্গিত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে একটু রসিকতা থাক। আধুনিক লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে

এবং রমণী-শরীর সম্পর্কে নিজের প্রফেশনাল মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রবীণ লেখকরা দিশেহারা বোধ করছেন। দূরদর্শী লেখকরা এবার হয়তো দর্জির দোকানে শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন বোধ করবেন। অনিন্দিতর এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। রমণী দেহের পরিমাপ সম্পর্কে একটা আন্দাজ সে অতি সহজে করে নিতে পারে।

অনিন্দিতর অপরিচিতা গরিমা লাহিড়ি ঐ একই ট্রামে উঠলো এবং লেডিজ সীট থেকে যাকে উৎখাত করে আসন দখল করলো সে বেচারা অনিন্দিত নিজেই। লেডিজ সীটের মাধ্যমে পাবলিক যানবাহনে নারীজাতিকে সম্মান দেখানোর রেওয়াজ তুনিয়া থেকে ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে। কলকাতা এখনও সব ব্যাপারে একটু রক্ষণশীল। আসন থেকে উৎখাত হয়েও গরিমার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অনিন্দিত, তার টাইট ফিটিং সালোয়ারের দিকে নজর পড়ে যাচ্ছে বারবার। এই মহিলাও বা কোথায় যাচ্ছেন কে জানে? হঠাৎ অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগলো।

এর পরের ব্যাপারটা এইরকম। যে-স্টপেজে মেয়েটি নামলো সেখানেই যাত্রা শেষ করলো অনিন্দিত। তারপর একটু অবাক লাগলো যখন তারই চেনাজানা এক দর্জির দোকানে প্রবেশ করলো মেয়েটি। পুরনো বন্ধুর পৈতৃক দোকান। একে নিয়েই কলেজে একসময় রসিকতা হতো। আমাদের মধ্যে তুই-ই সবচেয়ে ভাগ্য করে জন্মেছিস! সারা দিন ধরে দর্জির ফিতে দিয়ে মেয়েদের দেহের মাপ নিবি, আবার পয়সাও কামাবি। তুর্লভ এই জীবিকা—যার কোনো তুলনা হয় না। চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, ইঞ্জিনীয়ার কিছুই হতে চাইনা ভাই. যদি তোর ওই মাপ নেবার কাজটা পাইরে ভাই, বন্ধুরা রসিকতা করেছে।

তারপর মনে করুন, দোকানে ঢুকে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অনিন্দিতর দেখা হয়ে যাক। এবং তার সঙ্গে কথায় কথায় অনিন্দিত জানতে পারুক পুরনো এই মহিলা খরিদ্দারটির সম্পর্কে কিছু সন্দেহজনক কথা। কতরকম মানুষ আসে এইসব দোকানে—সভ্য অসভ্য সবরকম নারী ও পুরুষেরই জামাকাপড় প্রয়োজন হয়। জামাকাপড় ছাড়া কারও চলে না। শুধু ফ্যাশান পাল্টায়। এই মহিলা সাজসজ্জায় অনেক খরচ করেন। কিন্তু এই খরচকে যে বেহিসেবী খরচ বলা যায় না সে-ইঙ্গিতও পাওয়া গেলো বন্ধুর কাছে।

এরপরেই অনিন্দিত এবং গরিমার দেখা হোক। সেই জীর্ণ-মলিন সেকেলের বাড়িটায় গিয়ে হাজির হোক অনিন্দিত নিজের সন্দেহ নিরসন করতে। যা কানে শুনেছে তা সত্যি কিনা জানতে। সেখানে উপস্থিত

হয়ে অনিন্দিত বুঝুক মেয়েদের কত বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু পথে দাঁড়ালে কাউকে চেনা যায় না, সব মানুষ একাকার হয়ে যায়।

কিন্তু এইভাবে গল্প শুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে কোথাও একটু অনভিজ্ঞতার ইঙ্গিত লুকনো রয়েছে—যদিও এই মেয়েদের শরীরের মাপ নিতে সদাব্যস্ত ওই দর্জির দোকানের বন্ধুর কাহিনীটা সত্য। কার কি পছন্দ, কে কেমন ফিটিং চায় – লুজ, মিডিয়াম, টাইট—এইসব কথাই জানে বন্ধু। কিন্তু এরা কারা, কোথা থেকে আসে, কী করে, এসব জানার সময় ও কৌতূহল কোনোটাই নেই তার। গল্পের প্রয়োজনে তাকে বাধ্য করা যেতো কৌতূহলী হয়ে উঠতে, কিন্তু এখন কিছুই প্রয়োজন নেই। ওই যে রিকশ থেকে দেখা বাড়িটা, ওই যে শীতের দুপুরের দুর্বার বাসনা তাকে টেনে নিয়ে এসেছে নিষিদ্ধ অভিজ্ঞতার দিকে, যা বর্ণনা করার জন্যে বিন্দুমাত্র কল্পনার প্রয়োজন নেই, ওই ভাল।

আমি জোর করে আবার ফিরে এসেছি গরিমার শয়নমন্দিরে। বিলাসবহুল শয্যাকক্ষে প্রচণ্ড বিলাসিতা নেই, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য আছে—যা বাড়ির বাইরেটা দেখলে বোঝা যায় না। বাইরে যতই রুক্ষতা থাকুক, ভিতরে কিছু সুখের আয়োজন প্রয়োজন। আর কেনই বা এখানে সব কিছু কঠিন হবে? সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্যে তো এখানে কেউ আসে না। আমার গল্পটা এখন শয্যাতেই পড়ে রয়েছে, গরিমার শরীরের খুব কাছাকাছি। কী বিচিত্র এই লেখক মন। একটি দেহ এবং একটি ঘর থেকেই শতসহস্র দৃষ্টিকোণের সম্ভাবনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। যার একটি দিয়েই গল্পটা বলা যায়।

আমি কী বলতে চাই? কোথায় আমি গল্পকে নিয়ে যেতে চাই তার ওপরেই দৃষ্টিকোণের নির্বাচন নির্ভর করছে। প্রতিটি দৃষ্টিকোণ যেন এক এক ধরণের দূরবীক্ষণ অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্র, এক এক দৃশ্য দেখার জন্যে এক এক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

এতোক্ষণ ধরে অনিন্দিতর চোখ দিয়েই আমি গরিমাকে দেখে চলেছি। নিবিড় নিষ্ঠায় তার দেহ-ঐশ্বর্য আমি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু মানুষটাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি এক ভদ্রপরিবেশে। একবার যদি গরিমার চশমা পরে এই একই দৃশ্য দেখতে পারতাম তা হলে ব্যাপারটা হয়তো অন্যরকম হয়ে দাঁড়াতো।

কে এই গরিমা? পৃথিবীর কোন কোন ঘটনাচক্রের জটিল সংঘাতে সে এই পৌষের দুপুরে একজন অপরিচিতর অঙ্কশায়িনী হয়ে পরবর্তী

পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষা করছে তা স্পষ্ট জানা যেতো।

জানলে গল্পটা নিশ্চয় অনেক ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠতো। কিন্তু তাতে একটা মুশকিল হতো। এই অনিন্দিতকে নিয়ে আমি কী করতাম? অনিবার্য-কাম-অনিন্দিত যে কে, কী তার আকর্ষণ তা কি এই রমণী জানে? কেন সে এখানে চুপি-চুপি এসেছে তা যদি জানাজানি হয়ে যেতো তাহলে গল্পটা কোনদিকে বাঁক নিতো?

না, নিজের পরিচয় প্রদান করবার জন্যে অনিন্দিত অবশ্যই এখানে আসেনি। ব্যাপারটা প্রকাশিত হলে সব কিছু গোল্লায় যাবে। পৃথিবার কারুও জানবার কথা নয়, আদর্শের পূজারী, বাণীর বরপুত্র লেখক নিতান্ত বাধ্য হয়েই এক দুর্নিবার শক্তির আকর্ষণে চুপিচুপি এই গরিমা-সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছে। গরিমাতীর্থ কথাটা ব্যবহার করতে লোভ হচ্ছে—প্রত্যেক শরীরের মধ্যেই তো দেবতা আছেন এবং দেবতার নিবাসই তো তীর্থক্ষেত্র। গরিমার দেহতীর্থে পূজা দেবার সঙ্কল্প নিয়েই যে ভক্তের আনাগোনা।

আমি ভাবছি, গরিমা যদি তার অতিথির প্রকৃত পরিচয় সন্দেহ করে বসতো তা হলে কী কী ঘটতে পারতো? একজন বিশিষ্ট অতিথির সান্নিধ্যে আসতে পারার সুযোগের জন্যে সে কি খুব গর্ব বোধ করতো? তারপর দুর্গম দেহতীর্থের দ্বার উন্মুক্ত করে শরীরের নানা উপহারে ভূষিত করতো বিশিষ্টজনকে। এবং তারপর বলতো, আপনি যা-যা জানতে আগ্রহী আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবো আমার সাধ্যমতো।

অথবা এমনও ঘটতে পারতো, গরিমা লজ্জায় দুঃখে নত হয়ে পড়তো। যে-লেখককে সে শ্রদ্ধার হিমালয়শিখরে ধারণ করে রেখেছে, যাঁর রচনার কাছে সে বারবার ফিরে যায় নিত্যদিনের গ্লানি ধুয়ে ফেলবার জন্যে, তিনি কেন অধঃপতিত হবেন? এই নিষিদ্ধস্থানে তিনি তো প্রত্যাশিত নন।

না, এইসব কথা বেশী না ভাবাই ভাল। লেখার কাজটা সহজ করে নিতে হবে। অনিন্দিতর দৃষ্টিকোণ ছাড়া আর কোনো পথই খোলা নেই আমার সামনে। আমাকে এই পথেই জেনে নিতে হবে এই ঐশ্বর্যময়ী রমণীকে।

অজস্র ছোটছোট ডিটেল আমার প্রয়োজন। কেমন করে সে হাসে? কেমন করে কথা বলে, কেমন করে রেগে ওঠে এই নারী? কেমন করে সে তার পেশা চালিয়ে যায়? কেন সে এখানে এসেছে? কখন সে ফিরে যেতে চায়? কোথায় কোন গভীর দুঃখ তাকে নাড়া

দেয়? সমাজ তাকে কেমন নির্দয়ভাবে শোষণ করে চলেছে? এইসব ঘটনা সম্পূর্ণ গোপনে অপহরণ করে অভিজ্ঞতার পুঁটুলি সাবধানে বেঁধে নিয়ে তস্কর লেখককে চুপিচুপি বিদায় নিতে হবে।

গরিমা একটু অবাক হয়ে গিয়েছে। "আপনি এখনও পায়ের মোজা খুলছেন না?"

সব অতিথি আসামাত্রই নিশ্চয় পায়ের মোজা খুলে ফেলে, না-হলে গরিমা এইভাবে জিজ্ঞাসা করবে কেন?

অনিন্দিত যেন ধীরে-ধীরে ব্যবসাসর্বস্ব এক রমণীর মায়ামোহের বাহুডোরে বন্দী হতে চলেছে। এইভাবেই মানুষ বোধহয় ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। এই দুর্বলতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না আমার সৃষ্ট চরিত্র অনিন্দিত।

অনিন্দিত, তুমি সাবধান। তুমি যেন ধীরে ধীরে গরিমার দেহ-ঐশ্বর্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছো।

আমি অনিন্দিতকে ভর্ৎসনা জানাতে চাই। সীমিত একটি লক্ষ্য নিয়ে তুমি এখানে উপস্থিত হয়েছো। তুমি একটা গল্পের শুরু লোকমুখে শুনতে পেয়েছিলে। একজন আগন্তুক ও একজন আনন্দসঙ্গিনী অকস্মাৎ একটি দ্বারের আড়ালে চলে গিয়েছে! দ্বাররুদ্ধ। পাঠকের কৌতূহল এই মুহূর্তে কী বিপুল তা বুঝতে পেরে তুমি উৎসাহ বোধ করছিলে।

তুমি এতোদিন আদর্শের উচ্চলোকে অবস্থান করেছো। সামাজিক মানুষের নানা দীনতা তোমার লেখনীর অসিধারায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মানুষের সম্মান লাভ করেছে। তুমি সাধারণ সাহিত্যশ্রমিক নও, তুমি এক শ্রদ্ধেয়-স্রষ্টা—মানবমনের বিপুল রহস্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা, শুভ মঙ্গল পথে তাদের উদ্দীপ্ত করে তোলাই তোমার কর্ম। এতোদিন গভীর নিষ্ঠায় তুমি তা করে এসেছো। কিন্তু এবার হঠাৎ কী যে হলো।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ভেবে ভেবে তুমি গল্পের বাঁধুনি বাঁধতে পারছো না। তুমি নিজেই একবার পড়েছিলে, গল্পগুলো এক একটা বিষাক্ত সাপ, আর লেখক সাপুড়ে। মাঠে-ঘাটে-আঙিনায় সে গর্তে-গর্তে কাঠি ঢুকিয়ে সাপের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। সাপুড়ের ঠোকাতেই সাপ হঠাৎ ফোঁস করে বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে আর সেই সময়ই সাপুড়ে নিপুণভাবে তাকে হাঁড়িতে বন্দী করে নেয়, তারপর আসল সাপের তেজ ভেঙে দিয়ে তাকে নিয়ে খেলা দেখায়। অর্থাৎ সাপ ছাড়া সাপুড়ের কোনো ভূমিকা নেই। তার অস্তিত্ব মূল্যহীন।

না, সাপুড়ের তুলনাটা সুন্দর নয়। মানুষের বুকের গল্পগুলো কোন দুঃখে সাপের মতো লিকলিকে এবং বিষধর হতে যাবে? লেখক একজন দর্শক। এই বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের যে বিচিত্র লীলাখেলা চলেছে তুমি তার লিপিকার। ঈশ্বরের মালঞ্চের তুমি মালাকার, নানা রঙের পুষ্প চয়ন করে তুমি একের পর এক গুচ্ছ উপহার দাও স্রষ্টাকে। তাই তোমার কাজ। একবার সেই চিন্তায় তোমার বাধা পড়েছে! তুমি কিছু গল্প খুঁজে পাচ্ছো না। তখন তোমার ভয় হলো, তুমি হঠাৎ শুকিয়ে যাচ্ছ কিনা। এমন হয়। সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে পৃথিবীকে মাতিয়ে রাখার পর গাছ শুকিয়ে যায়। সেই গাছে আর ফুল আসে না।

তুমি হঠাৎ সেই দুর্ভাবনায় আচমকা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছো। তুমি গুটি কয়েক কথা যা কান দিয়ে শুনেছো, অথচ যার সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, সেগুলি তুলির টানে কাগজের ওপর স্পষ্ট করে তোলার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছো। তুমি এই দেহসর্বস্ব রমণীর সম্পর্কে অনেক রচনা পাঠ করেছো, এখনকার সব গল্প ড্রেন ইনসপেকটরদের পূতিগন্ধময় রিপোর্ট দিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন কিছু বলার নেই এই আশঙ্কায় লেখা শুরু করে তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছো। তুমি এবার সম্পাদক হরিহর দের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছো। তুমিও যে নদীর মতো সর্বদা চলমান ও পরিবর্তনশীল তার প্রমাণ রেখে যাবে। তোমার রক্তের মধ্যে এখন চিরনবীনের ডাক। তুমি যে করেই হোক অভিজ্ঞতার সীমানা প্রসারিত করে নতুন কিছু লিখবে যা পাঠকদের বিমোহিত করবে।

সেই চঞ্চলতা নিয়ে তুমি চুপি-চুপি এখানে এসেছো, শিকারী বাঘের মতো তোমার লক্ষ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

তোমার ওপর এখন অনেক দায়িত্ব, অনিন্দিত। অনেক চিন্তার পরে ওই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। নিন্দার সমুদ্রে বারবার অবগাহন করেও তোমাকে সমস্ত নিন্দার অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করতে হবে। তুমি হবে এমন এক চরিত্র যা আমার এতোদিনের সমস্ত পাঠকদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করবে। তারা কামনায় কলুষিত এক পুরুষের সন্ধান নেবার জন্যে আমার রচনা-অরণ্যে প্রবেশ করে না, তারা মানুষকে শ্রদ্ধা করতে চায়, তার হৃদয়ের উন্নততর বৃত্তিগুলির বিকাশ লক্ষ্য করে আনন্দিত হতে চায়।

তাই তুমি অনিবার্য চৌধুরী নয়। তুমি অনিন্দিত চৌধুরী। আমি যখন ওই তনিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন অতশত ভেবে

আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে যাইনি। তাই নিজের নামের খোলসটা দূরে সরিয়ে রেখে যখন নতুন একটা নামের আশ্রয় খুঁজে বের করতে হলো তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো অনিবার্য। নতুন নাম, চমকপ্রদ নাম। তনিমার নিজেরও খুব ভাল লেগেছিল। এবং এই নাম ভাল লাগা তার চরিত্রে ও শিক্ষায় মধুর প্রতিফলন বটে। তার রুচির রিফ্লেকশন বলতে পারো। কলকাতার সরুগলির যে কলগার্ল মুহূর্তের এমন একটা নামকে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো সে তৎক্ষণাৎ পাঠকের চোখে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বোঝা যায় তার একটু বাংলায় পড়াশোনা আছে, এমন কোনো পরিবেশ থেকে সে এসেছে যেখানে সুপ্রযুক্ত শব্দের সম্মান রয়েছে।

কিন্তু লেখার টেবিলে বসে আমি অনিবার্যকে বিদায় করতে বাধ্য হয়েছি। ওর মধ্যে যেন বাধাবন্ধহীন এক আদিম শক্তির উপস্থিতি রয়েছে। যাকে নিষেধ করা উচিত ছিল তাকেই যেন চূড়ান্ত স্বাধীনতা দিয়ে, পরে সমস্ত দায়দায়িত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে। অনিবার্য নাম মানেই পাঠককে আগাম নোটিশ দেওয়া যে এমন কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে যা নিবারণের সাধ্য স্বয়ং লেখকের নেই। তনিমা লাহিড়ির ঘরে কী ঘটতে পারে তা এই অধমের অজানা নয়। আমি কিছুতেই তাকে নিবারণের অসাধ্য বলে চিহ্নিত করে নিজের পরাজয় মেনে নেবো না। আমি শেষপর্যন্ত কী করবো তা এখনই লিখে ফেলে সিলমোহর আটকে দিতে পারবো না। যা কিছু হয়ে গেলো তা যেন হঠাৎ কেমনভাবে হয়ে গেলো। আমি প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতিটা আর একবার ভেবে দেখতে চাই। আমার অনেক দায়িত্ব রয়েছে—পাঠকের কাছে, সমাজের কাছে এবং যে আমাকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে, তার কাছে। মাধুরী, প্লিজ, এই মাঝদরিয়ায় তুমি হঠাৎ মনের মধ্যে উঁকি মেরে আমাকে বিপদে ফেলো না।

অনিবার্যর মধ্যে ঝড়ের ইঙ্গিত আছে, ধ্বংসের সংকেত রয়েছে, আর এই অনিন্দিতর মধ্যে অপ্রতিহত আদিম শক্তির আবেগ নেই কেবল আছে নির্মল শরীরে দাগ লাগার সম্ভাবনা।

আর তনিমা! না, তার বিমল তনু দেহকে নিয়ে তিলে-তিলে উপভোগের উৎসব-আসর বসাতেও আমি রাজী নই। সাহিত্যের ইতিহাস ওকাজ করে পুরনো হয়ে গিয়েছে, ঐ কাজের জন্যে আমার মতো লেখকের জন্ম হয়নি। রামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত ইস্কুলের মাস্টারমশায়রা এই কাজ করার জন্যে আমাকে দিনের পর দিন মহাপুরুষগণের অলৌকিক

জীবনগাথার সঙ্গে পরিচিত করেননি। তাঁদের সমস্ত পরিশ্রমের আত্মশ্রাদ্ধ করার জন্যেও আমি আমার সাহিত্যজীবনের এই সংকটজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছইনি !

দেশে-দেশে সাহিত্যের আসরে মহামূল্যবান রমণী শরীরকে নিয়ে মহোৎসব চলেছে। শরীরসর্বস্ব সেই সাহিত্যের মাদকতা আমাদের এই দরিদ্রদেশের বাতাসেও হয়তো প্রসারিত হবে, কিন্তু আমি এই বয়সে স্বধর্মচ্যুত হতে রাজী নই। আমি তনিমাকে তাই গরিমায় রূপান্তরিত করেছি। তনুসর্বস্ব না হয়ে সে যে গরবিনী হয়েও উঠতে পারে তা অনিন্দিত এতোক্ষণে নিশ্চয় অনুভব করছে।

অনিন্দিত এবার ঐ ছোট্ট ঘরে মেয়েটির খুব কাছে বসে খোঁজ করুক—কীসের গর্ব ? শরীরের গর্ব ? না সাফল্যের গর্ব ? না স্রেফ কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্যেও মানুষের গর্বের প্রয়োজন হয় ?

আমি ইতিমধ্যেই অনিন্দিতর দৃষ্টিকোণ থেকে একসময় বলে নিয়েছি, গর্ব না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। গর্বই হচ্ছে মানুষের ব্যাটারি—যার গর্ব নিঃশেষিত হয়েছে সংসারে সে ভেজিটেবল মার্কা হয়ে গিয়েছে। শাকসবজির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু এই পরিবেশে একটি নরম-নরম, মিষ্টি-মিষ্টি, কিছুটা অসহায় রমণীকে খুঁজে পাবার প্রত্যাশা ছিল অবচেতন মনে। এমন একটি নারী, সমাজ যাকে দেহসর্বস্বর তপশিলিভুক্ত করলেও, প্রেমের সঞ্জীবনী বাণী গ্রহণ করার মতো সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল। এই ধরনের মেয়েরাই এই দেশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে পলিমাটির সাহিত্যে মূর্তিময়ী সাফল্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা নিজে কাঁদে এবং সবাইকে কাঁদায়। তাদের সঙ্গে বারবার বিভিন্ন পরিবেশে পরিচিত হয়েও, তাদের বুকের সব শব্দ সাহিত্যের স্টেথিসকোপে বারবার শ্রবণ করেও পাঠকের মনের আশা মেটে না। এরা তাই কিছুতেই পুরনো হতে চায় না। এরা এমন নেশাগ্রস্ত পাঠকের সৃষ্টি করে যারা চায় সে বারবার ফিরে আসুক।

আমি নিজেও হয়তো এই দলে। গরিমা-সান্নিধ্যে আমি অনিন্দিতর চরম অভিজ্ঞতার মুহূর্তের জন্য কয়েকটি শব্দ পরম যত্নে সংগ্রহ করে রেখেছি। ইংরিজী এক লেখক সাহিত্যসাফল্যের একটি গোপন কথা তাঁর বিশিষ্ট ভক্তকে চুপি চুপি শুনিয়ে গিয়েছেন। কোনো আইন-কানুনের বন্ধন নেই, এই আইন ছাড়া আর্টের ক্ষেত্রে আর কোনো আইন নেই। অনেকদিন পর বহু অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে আর একজন লেখক চুপি চুপি বলেছিলেন—এমন কিছু কখনই

লিখতে চেষ্টা কোরো না যা অন্য কেউ লিখলে তুমি নিজেই পড়তে চাইতে না! নরম-নরম ভাগ্যহীনা মেয়েদের দুঃখের কাহিনী পড়তে আমার এখনও আপত্তি হয় না, সুতরাং গরিমাকে মোমের পুতুল করে তুললে হয়তো তেমন কিছু ক্ষতি হতো না।

কিন্তু গরিমা হয়তো আমাকে অন্য এক ভুবনের সন্ধান দিতে পারে। গরিমার বুকের মধ্যে পাইপ বসিয়ে অনেকখানি ড্রিল করে গিয়ে অন্য কোনো উপলব্ধির আবিষ্কার-সম্ভাবনা প্রবল। আমি অনিন্দিতকে তাই সেই পথেই চলবার জন্যে ব্যাকুল অনুরোধ করছি। প্রলুব্ধ কাঠুরিয়ার মতো তুমি অযথা দেহের জঙ্গলে পথহারা হয়ে সর্বস্বহারা হয়ো না! তুমি গরিমার দেহের কাছে কিছুতেই ধরা দিও না, তুমি এই রমণীর মধ্যে এমন কাউকে আবিষ্কার করো যে ভিন্ন ধরনের, যার ছাঁচ এর আগে সাহিত্যের হাটে হাজির হয়নি। পাঠক ও সম্পাদক হরিহর দে উভয়েই বিস্মিত বোধ করুক।

গরিমার শয়নমন্দিরে আবার প্রবেশ করা যাক। না এখানে কোনো লজ্জা অথবা সঙ্কোচ ছড়িয়ে রাখার সুযোগ দেয়নি এই কক্ষের অধীশ্বরী। যথাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ দম্পতি প্রিয় শিষ্য সহ অবস্থান করছেন! ঠাকুর, আপনি সত্যিই সর্বত্র বিরাজমান! বিছানার কাছেই নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ফ্রেমে গরিমারই নিজস্ব একটি ছবি শোভা পাচ্ছে। সেখানে গরিমাকে যে গর্বে ধরে রাখা হয়েছে তা কেবল প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী টেনিস তারকাদের মধ্যেই দেখা যায়। এই ছবিটায় আত্মপ্রত্যয় আছে, বাধাবিপত্তি কাটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনোর বিজয় গৌরবও রয়েছে।

অনিন্দিত প্রশ্ন করেছে, আর গরিমা নিজেই বলেছে, "স্টুডিওতে গিয়েও কয়েকবার ছবি তুলেছি। কিন্তু ছবি দেখলে মনে হয় যেন জেলখানায় বসে আছি। জানেন, কোনো ফোটোগ্রাফার আমাকে হাসাতে পারে না। এরা মাত্র তিনরকম ছবি তুলতে অভ্যস্ত—বিয়ে হয়ে যাবার আগে পছন্দের ক্যাটালগে যে ছবি স্থান পায়, বিয়ের পর বরের সঙ্গে এবং মরে যাবার পরে শোওয়া অবস্থায়। এরা স্বাধীন মানুষের ছবি তুলতে জানে না!"

অনিন্দিত এর পর শুনেছে, "এই ঘরেই বরোদার মিস্টার ব্যানার্জি সেবার এই ছবি তুললেন। খুব স্পোর্টিং মানুষ। প্রথমে একটু

ভয় ভয় করলেও, ওঁর হাতে ক্যামেরা দেখে আমিও স্পোর্টিং হয়ে গেলাম। এখানে সবাই লুকিয়ে আসতে চায় চোরের মতন। আমি বলি, চোরের মতন কেন? বন্ধুর মতন আসুন। মিস্টার ব্যানার্জির মতো ক্যামেরা নিয়ে আসতে পারেন।

"আমি ভেবেছিলুম ছবিটা তোলানোই হলো, কখনও দেখা হবে না। কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি কথা রেখেছিলেন। ডাকে ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি।"

একটা ফ্রেমের মধ্য দিয়েই অনিন্দিত এতক্ষণ যেন এই ছবির মালিককে দেখবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অনিন্দিত ভাবছে, অতীতের কোনো দুঃখ নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথাও লজ্জা আছে কী?

কিন্তু গরিমা লাহিড়ি সমস্ত সন্দেহর ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখছে নিজেকে।

গরিমা সিনেমার কথা তুলছে। "যেসব সিনেমায় শুধু মেয়েদের নাকের জল চোখের জল থাকে তা আমার দু' চোখের বিষ! আমার কাজের লোক ভামিনী ওইসব পছন্দ করে। মেয়েরা একটু না কাঁদলে সিনেমা কী হলো? আমি কিন্তু ওসব একেবারেই সহ্য করতে পারি না। সংসার থেকে গটগট করে বেরিয়ে এসেছি বলে সব সময় কাঁদতে হবে কেন বলুন তো?"

"সিনেমার কান্না দেখে দেখে আর রেডিও নাটকের কান্না শুনে শুনে সব মেয়ে কাঁদতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে," অনিন্দিতর এই তাৎক্ষণিক মন্তব্য বেশ ভাল লেগেছে গরিমার।

সে এবার যেন আরও একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অতিথির দিকে তাকাচ্ছে। "আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন তো।"

শরীরটা সে এতোক্ষণে অতিথির দিকে এলিয়ে দিয়েছে। অনেকটা যেন নৈবেদ্যর মতো এগিয়ে দেওয়া দেবতার ভোগের জন্য, অনিন্দিতর মনে হচ্ছে।

না, ভোগ কথাটা এখানে অচল। ভোগের মধ্যে বড্ড বেশী কামের গন্ধ আছে, দেবতার ভোগ হলেও। শরীর ও ভোগ দুটো শব্দ পাশাপাশি রাখা এ যুগে সুবিবেচনার কাজ নয়, বিশেষ করে মন যেখানে উচ্চপর্যায়ের কোনো চিন্তায় ব্যস্ত হতে চায়। কৃপাদৃষ্টি শব্দটা বরং ভাল—সযত্নে সাজানো নিজের শরীরের ডালি পরিচয়হীন দেবতার কৃপাদৃষ্টির জন্যে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যে

অর্থবিনিময়ে শরীর ক্রয়-বিক্রয়ের গ্লানি মুছে দিয়েছে। দেবতার দৃষ্টি আকর্ষণই এখন যেন পূজারিণীর একমাত্র কর্ম।

অনিন্দিতর মুখের দিকে এবার মিষ্টি ভাবে তাকাচ্ছে গরিমা। বলছে, তার পুরুষ 'বন্ধুরা' নানা বিষয়ে কৃতী, কিন্তু তাদের কেউ এমন সুন্দর বাংলা বলে না।

একটু ভয়-ভয় লাগছে অনিন্দিতর। শব্দকে কেটে ঘষে-মেজে পালিশ করে পরিস্থিতির প্রয়োজনে ব্যবহার করার ব্যবসা লেখকদের! সুন্দর বাংলা থেকে গরিমা কি কিছু সন্দেহ করছে? একবার সে বলেওছে, "আপনাকে একবারও অচেনা বলে মনে হলো না। যেন দেখা না-হলেও দেখা হয়েছে আমাদের।" যাকে ভাল লাগে না তার সঙ্গে সে বেশী কথা বলে না, একথাও জানিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট করে।

অনিন্দিতর চিন্তা একটু বাড়ছে। প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হতে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। তবু কিছু কথা বলতে হয়। সে নিবেদন করে, "কি সুন্দর তোমার কথা, গরিমা। সুন্দর মুখ থেকে অনেক সময় যখন কুৎসিত শব্দ বেরিয়ে আসে, তখন খুব কষ্ট লাগে।"

"ওমা! আমি আবার কি স্পেশাল কথা বললাম!" গরিমার দেহনৈবেদ্য অতিথি-দেবতার সামনে আগের মতোই সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এখন প্রলোভনের বলি হবার সময় নয়। অজস্র ছোটছোট ঘটনাকে অবিলম্বে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে। এই ভাবে অনেক কথা অনিন্দিতর মনে রাখতে কষ্ট হয়--সে তাই নোটবুকের ওপর নির্ভর করে। স্মৃতিকে কখনও বিশ্বাস কোরো না, আমি নিজেই একবার কোনো উপন্যাসে লিখেছিলাম। নিত্যসঙ্গী নোটবইটা অনিন্দিতর বুক পকেটেই রয়েছে, কিন্তু তা এই পরিস্থিতিতে বের করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। গরিমা নিশ্চয় ভীষণ ঘাবড়ে যাবে, কি সন্দেহ করে বসবে কিছু ঠিক নেই।

এই সময় বুকের কাছে ছোট্ট একটা লুকোনো টেপরেকর্ডার থাকলে মন্দ হতো না। এ ঘরের সমস্ত ইতিহাস নিঃশব্দে ধরে রাখা যেতো, একটা শব্দও কোথাও হারিয়ে যেতো না। নিশ্চিন্ত অনিন্দিত আর একটু নিবিড় হওয়ার চেষ্টা করে গরিমার সমস্ত গল্পটা চুপি-চুপি তার বুক থেকে নিংড়ে নিতো।

কুমারেশ মিত্তির একেই বলেন 'পকেট মারা'। মানুষ নিজের গল্পটা জেনে শুনে প্রাণধরে কারও হাতে তুলে দিতে পারে না, দিলেও অনেক বেশী তেঁতো করে ফেলে। বেস্ট হলো, মালিকের অজান্তে চুপি-চুপি গল্পটা পকেট মেরে নেওয়া, যখন মালিক বুঝতেই পারছেন না।

তার যত্নের কোহিনূর মণিটা অন্যের কাছে চলে যাচ্ছে, তখন সব চেয়ে দামী গল্পটা পাওয়া যায়।

গরিমাকে একটু মিষ্টি কিছু বলে ওর মনের সন্দেহটা মুছে ফেলা প্রয়োজন। গরিমাকে দেখে সবারই পছন্দ হবে, গরিমা নিজে নিশ্চয় তা জানে। কিন্তু গরিমাকে জয় করার জন্যে আরও কিছু বিনিয়োগের প্রয়োজন।

পছন্দের একটা সহজ আইন সেই আদিম যুগ থেকে চলে আসছে এ-কথা আমি নিজেই একবার লিখেছিলাম। পুরুষের পছন্দ চোখ দিয়ে, আর মেয়েদের পছন্দ কান দিয়ে। অর্থাৎ সুদেহিনী নারীর প্রতিই পুরুষের প্রথম আকর্ষণ, আর নারীর আদিম আকর্ষণ মধুভাষী পুরুষের প্রতি, প্রিয়বাক্য, প্রশস্তিবাক্য শুনে গলে যাওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের কোনো তুলনা নেই।

না, শরীরবন্দনা দিয়ে শুরু করে লাভ নেই। শরীরমন্দিরের প্রসাদ পাবার জন্যেই তো এখানে ভক্তদের বিনম্র প্রবেশ। গরিমার মতো গর্বিনীদের দেহপ্রশংসায় বোধ হয় আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে না।

অনিন্দিত তার অন্য মধুর অভিজ্ঞতার কথা উত্থাপন করলো। সে জানিয়ে দিচ্ছে, গরিমার একটি কথা তার হৃদয়স্পর্শ করেছে। গরিমা যাদের সঙ্গে এই কক্ষে পরিচিত হয় তাদের অতিথি হিসাবে চিহ্নিত না করে 'বন্ধু' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

"বন্ধু তো বটেই।" অনেকে বন্ধুর মতোই যে হয়ে যায় তা গরিমা গোপন রাখছে না। বরোদার মিস্টার ব্যানার্জি কলকাতার বিজনেসে খুব সফল হচ্ছেন। তাতে খুব গর্ব হয়েছে গরিমার। গরিমার ধারণা, এখানে যাঁরা সময় কাটাতে আসেন তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের কর্মে। তাঁরা সাকসেসফুল পুরুষ—আর এই সফল পুরুষদের জাতই নাকি আলাদা। কাজের লোকদের ভীষণ পছন্দ গরিমার—এঁদের সময়ের দাম থাকে। যে-পুরুষমানুষের সময়ের দাম নেই তার সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা নেই গরিমার।

গরিমা কি সংসারযাত্রায় সফল এইসব বন্ধুদের কথা একে একে অনিন্দিতকে বলবে? তাহলেই তো অনেক ঘটনা হয়ে যায়।

না, আনন্দসঙ্গিনীর অঙ্কশায়ী সফল পুরুষদের কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করে চাঞ্চল্যকর এক সাংবাদিক ইতিবৃত্ত রচনার কোনো উৎসাহ নেই অনিন্দিতর। এইসব রচনার সমাদর আছে, কিন্তু সম্মান নেই। স্ক্যাণ্ডাল-ভ্যালুতে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্যের হাটে বেচাকেনায় আগ্রহী নই আমি।

আমার চরিত্ররা অবশ্যই এ-বিষয়ে অত্যধিক আগ্রহী হবে না।

কিন্তু এই সব মানুষের আসাযাওয়ার পথে অন্য-কোনো গল্প থেকে যেতে পারে। গরিমা তার 'বন্ধুদের' পরিচয় না-দিয়েও তাদের কৃতকর্মে সুখী। তারা আরও সফল হোক এই ইচ্ছা রয়েছে সর্বক্ষণ তাঁর বুকের মধ্যে।

গরিমা এবার গল্পচ্ছলে একজন বন্ধুর কথা তুললো। "ধরুন, তাঁর নাম মিস্টার দাস। কী ভীষণ অবসাদের মধ্যে জীবন কাটছিল। ক্রমশ সব প্রতিযোগিতায় তিনি পিছিয়ে পড়ছেন। এই ডিপ্রেসন কাটাবার জন্যেই এখানে এসেছিলেন। এখানে এসে তিনি মদ চাইলেন। আমি সোজা বলে দিলাম, ওইসব হাঙ্গামা আমার এখানে থাকে না, আপনার জানা উচিত ছিল। মদই যদি খাবেন শহরে কয়েকশ বার রয়েছে, সেখানে চলে যান। আমাকে জ্বালাতন কেন?"

মিস্টার দাস এই প্রসঙ্গে কী চমৎকার কোনো ডায়লগ উপহার দিয়েছিলেন? তাহলে আমার কাজে লেগে যেত।

একটু হেসে নিলো গরিমা। মিস্টার দাসের কথা শুনেও সেদিন সে খুব হেসেছিল। "মিসেস দাসের সঙ্গে আপনার কোনো তফাত নেই। যেখানেই যাই সেই একই কথা —ছাইভস্ম গিলো না, গিলো না।"

"মিসেস দাস বেচারার জন্যে খুব মায়া হয়েছিল। বললাম, আমার মন বলছে, আপনার অফিসের হাঙ্গামাগুলো এবার আপনি সামলে উঠবেন। লোকটা বিশ্বাসই করতে চায় না। আমার বিশ্বাস আছে। কারণ ভাগ্য নিয়ে এসেছি আমি। আমাকে যে টাচ করে সে ঠকে না— সে শুধুই এগিয়ে যায়।"

গরিমাই শোনালো, দিন পনেরো পরে মিস্টার দাস আবার হাজির। "এই অসময়ে আপনার আগমন! বললেন, অফিসে ম্যাজিকের মতো সব সমস্যা কেটে গিয়ে প্রমোশন হয়েছে। মিসেস দাস হুকুম করেছেন এখনই পুজো দিয়ে এসো। ঠাকুরের কাছে অবশ্যই যাবেন মিস্টার দাস, কিন্তু তার আগে আমার কাছে ছুটে এসেছেন—এক কাঁড়ি গিফট নিয়ে। কী পাগল লোক, আপনাকে কী বলবো! পুরো রেমুনারেশন দিলেন, কিন্তু বসলেন না। রাস্তায় কোম্পানির গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন। বললেন, এখনই, মিসেস দাসকে তুলে নিয়ে ছুটতে হবে দক্ষিণেশ্বরে।"

অনিন্দিত ধৈর্য সহকারে শুনছে। আর গরিমা বলছে, "আসল ব্যাপার কী জানেন অনিন্দিতবাবু, পুরুষমানুষগুলো আজকাল ভীষণ ঝিমিয়ে পড়ছে। তাদের চাঙ্গা করে তোলা খুব সহজ, কিন্তু বাড়ির

বউরা তা করবে না। তারা দিনরাত শুধু দাও-দাও করছে—তারা হিসেব করছে না মানুষটার মধ্যে কী সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে কী করে বাঘের মতো করে তোলা যায়, যাতে জঙ্গলে সব প্রতিযোগিতায় সে জিততে পারে।"

অনিন্দিত, খুব সাবধান তুমি। এইসব মহামূল্যবান কথা তুমি যদি মনে রাখতে না পারো তা হলে দুঃখের শেষ থাকবে না। টেবিলে বসে এসব কথা বানিয়ে লেখার সাধ্য তোমার নেই।

গরিমার মুখের দিকে এবং শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি কী করবো তা চিন্তা করছি। আমি ওদের দু'জনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গরিমা এবার বলছে অনিন্দিতকে, "দেখুন, আমি জায়গাটাকে পরিচ্ছন্ন রেখেছি, ধূপধুনো দিয়ে পবিত্রও করে রেখেছি। না-হলে মিস্টার দাস, মিস্টার ব্যানার্জির মতো মানুষরা এখানে এসে বাড়তি কী পাবেন?"

অনিন্দিত এবার একটু চিন্তিত হয়ে উঠুক। কড়ি দিয়ে কেনা সীমিত সময় ক্রমশই কেটে যাচ্ছে। এখনই হয়তো সময় সম্পর্কে গরিমা লাহিড়ির টনক নড়বে।

অনিন্দিত, তুমি তো একবার মন দিয়ে মার্কিন লেখক জন ডস প্যাসোর উপন্যাস পড়েছিলে। তোমার ডায়রিতে লেখাও আছে, প্রত্যেক মানুষই টুকরো টুকরো অনেকগুলো গোপন ঘটনার তাল—মিজারেবল লিট্‌ল পাইল অফ সিক্রেট্‌স। যে-মানুষ যা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে সেইটাই তার আসল স্বরূপ।

অনিন্দিত মনে মনে বলুক, তুমি আমার অবস্থাটুকু একটু বোঝো, হে বিলাসিনী। এতদিন আমার লুকোবার মতন তেমন কিছু ছিল না, সেই ছোটবেলায় বাজার করতে গিয়ে কিছু-কিছু পয়সা সরানো এবং কর্মজীবনে অফিসে কিছু মিথ্যে টি-এ বিল করা ছাড়া। আমি আমার অত্যন্ত প্রিয়জনের কাছে কখনই কিছু লুকিয়ে রাখিনি, মাঝে-মাঝে আমার সৃষ্টির অবর্ণনীয় জন্মযন্ত্রণা ছাড়া। কিন্তু আমার সৃষ্টির অমৃতভাণ্ড হঠাৎ শুকিয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে আমি ছুটে এসেছি তোমার দ্বারে। তুমি আমাকে ঐশ্বর্যময় করে তোলো। তোমার সমস্ত গোপনীয়তা আমার কাছে অবারিত করো। তোমার দেহের আবরণ এই মুহূর্তে উন্মোচনের অপেক্ষায়, কিন্তু আমি চাই তোমার সেই মিজারেবল লিট্‌ল পাইল অফ সিক্রেট্‌স—তিল তিল করে গোপনে জমে উঠে যা তাল হয়ে উঠেছে। আমাকে সেই ঐশ্বর্য উপহার দাও।

গরিমা এবার তার ঊর্ধ্বদেহ কিছুটা অনাবৃত করতে অতিথিকে

উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু কেবল ও নিয়ে আমি কী করবো? আমি তো তোমার গোপনীয়তা হরণ করতে এসেছি।

মদ না খেয়েও ঈষৎ মত্ত বোধ করছে আমার নায়ক অনিন্দিত। কুচযুগের আদিম ঐশ্বর্য নিষিদ্ধ ফলের মতো তাকে আহ্বান করছে উন্মোচন ও পীড়নের উত্তেজনায়। কিন্তু কোথায় কাহিনী? অথচ আমার যে কাহিনী প্রয়োজন, গরিমা।

ঐশ্বর্যময়ী শরীরের দুটি স্বর্ণকুম্ভ ঈষৎ প্রকাশিত হয়ে তাদের প্রাপ্য আকর্ষণ ও বন্ধনমুক্তির স্বাধীনতা দাবী করছে। আর গরিমা তার বন্ধুদের কথা শোনাতে গিয়ে বলছে, "একজন আমাকে ঠকাতে এসেছিল। মিস্টার দাসের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার জন্যে এক ভিজিল্যান্স ইনস্পেক্টর। শুধু কায়দা করে মিস্টার দাস সম্বন্ধে খবরাখবর চায়, অথচ অতিথির ছদ্মবেশে এসেছে। এন্টারটেণ্ড হবার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। আমি বুঝতে পেরেই লোকটাকে বললাম, আর একটুও সময় নেই আমার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে চলে যেতে হবে। লোকটাকে সেবার দূর করে দিয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। মানুষের সিক্রেট ফাঁস করতে যারা ব্যস্ত তারা মোটেই ভাল লোক নয়।"

কথাগুলো মোটেই ভাল নয় অনিন্দিতর পক্ষে। মানুষের ভিতরে যে গোপন মানুষটা লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে বের করবার জন্যেই সে গরিমা-সান্নিধ্যে এসেছে। গরিমা যদি বুঝে ফেলে অনিন্দিতকে তা হলে মোটেই ভাল হবে না।

তাই দেহের ওপরেই নজর দেওয়া উচিত এখন। গরিমা যেন অন্য কোনো সন্দেহের সুযোগ না পায়।

অনিন্দিত ভেবে চলেছে গরিমার মধ্যে গোপন গরিমাকে কোথায় কেমন করে খুঁজে পাওয়া যাবে? মানুষের খোসা ছাড়ালেই তার গোপনীয়তার সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষ বোধহয় অনেকটা নারকোলের মতন। ছোবড়াবিহীন শরীরের তলায় যে শক্ত খোলা থাকে তাকে পেরিয়ে যাওয়া বড় কঠিন।

গরিমার অতীতকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে অনিন্দিত অতি সাবধানে। কোথায় জন্মেছিল, কোথায় বড় হয়েছিল, কোথায় লেখাপড়া শিখেছিল। তারপর কেমন করে সংসারের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে

কোন সোনার হরিণের হাতছানিতে সে নির্মম এই জীবনে প্রবেশ করেছে তার নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়েছে অনিন্দিত। কোথায় বর্ধমান শহর। সেখানে ইস্কুল এবং অসমাপ্ত কলেজ জীবন। বাবার অকাল মৃত্যু। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রেম। বাড়ি থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসা।

কিন্তু কোনো নতুন গল্প পাচ্ছে না অনিন্দিত। আর ঐসব ছেঁদো গল্প সম্পর্কে গরিমার নিজেরও কোনো আগ্রহ নেই। "আমার দোষ নেই, কেউ আমাকে বের করে নিয়ে এসেছে," "আমার দোষ নেই, আমার অভাবই আমার সর্বনাশ করেছে," এসব গল্প মোটেই আকৃষ্ট করে না গরিমাকে। "আমি অনেক সুখ পেয়েছি জীবনে, যা ভোগ করতে চাই এখন তা পাই। আমার কেন দুঃখ থাকতে যাবে?" গরিমা বেশ মিষ্টি করেই বলেছে। পৃথিবীর কারও বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই।

আমার সামনে যে পথ ছিল তা যেন এক সর্পিল কানাগলির প্রান্তে হঠাৎ শেষ হয়ে গেলো। গরিমার অর্ডিনারি দুঃখ থেকে বস্তাপচা একটা পরিণতি সন্ধানের কোনো উপায়ই নেই। গরিমা বেশ সুখে আছে— অনেক সিঁথিতে-সিঁদুর মেয়েদের চেয়ে তার সুখ যে বেশী তা বুঝিয়ে দিয়েছে। কিছুই গোপন রাখেনি।

"ও মা! এখনও তুমি লিখছো!" আমার দায়িত্বসম্পন্না স্নেহশীলা স্ত্রী মাধুরীর ঘুম ভেঙেছে। বাইরে এখন ঝলমলে রোদ, ভোরের পাখিরা বিদায় নিয়েছে, তার বদলে রাস্তার বাস-ট্রামের আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাধুরী আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। "মঠের মহারাজ বলেছিলেন, সারাক্ষণ স্বামীকে সাধনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে। যে-মানুষ সাধনা করতে পারে না, সে কোনো বড় কাজের যোগ্য নয়।" স্বামীর বিনিদ্র সাধন শক্তির প্রমাণ পেয়ে মাধুরী বেশ গর্ব বোধ করছে।

আবার কোথাও যেন মাধুরীর একটু দুঃখও রয়েছে। সে একদিন বলেছিল, "একটা লেখার পিছনে মানুষের কত কষ্ট থাকে, কত চেষ্টা থাকে তার খবর কেউ রাখবে না।"

"পাঠক হবার ওইটাই তো মস্ত সুবিধা!" আমি মাধুরীকে বুঝিয়েছিলাম। "ওল্ড প্রোডাক্ট নিয়েই তাদের আগ্রহ, বহু বাধাবিপত্তি

পেরিয়ে সেই জিনিস কীভাবে তৈরী হলো সে-বিষয়ে কারও কোনো মাথাব্যাথা নেই।”

মাধুরী এখন গভীর যত্নে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর ঠাণ্ডা হাতের কল্যাণস্পর্শ পেলেই আমার সমস্ত যন্ত্রনা দূর হয়ে যায় আমি দেখেছি।

মাধুরী জানতে চাইছে, “যন্ত্রণা নেই তো? এইভাবে সারারাত ধরে চেয়ারে বসে লেখার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকলে ব্লাডপ্রোসার বাড়ে. রক্তচাপ বৃদ্ধি লেখকদের পক্ষে ভাল নয়। কুমারেশ মিত্রর আজকালের লেখাগুলো দেখো তো, নায়ক নায়িকা সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে—অল্পে রেগে ওঠে তারা, কোন ধৈর্য নেই তাদের।” এর সবই যুগধর্ম নয়, মাত্র স্রষ্টার ব্লাডপ্রেসারের নিদর্শন আমার স্ত্রীর মতে। এই রক্তচাপের জন্যই নাকি কুমারেশ মিত্র তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। লেখকদের সবসময় সুস্থ থাকতে হবে, মাধুরীর ধারণা।

“মাধুরী, তুমি আমাকে কাছ থেকে সরিয়ে দিও না। কাজের জন্যেই তো মানুষের জন্ম। আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম, কাজ করলে কখনও শরীর খারাপ হয় না।” আমি কেবল একটু কাতর হয়ে পড়ছি। আমাকে এবার পাঠককে এমন কিছু দিতে হবে যা আমার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, যার অপর নাম বিস্ময় অথবা চমক।

স্নেহময়ী মাধুরী আমার জন্য চা এনেছে। মাধুরী বলছে, “বোঝা বইবার একটা সীমা ঠিক না করে ভগবান মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান না। সেই সীমার মধ্য থেকেই সাধনা সচল রাখতে হবে।”

আমার কী সৌভাগ্য। মাধুরী এখনও জানে না বিনিদ্র রজনী যাপন করে আমি কী লিখে চলেছি। আমি সত্যিই ভাগ্যবান—মাধুরী একেবারে ছাপার অক্ষরে আমার লেখা পড়ে থাকে, কখনও ম্যানাসক্রিপ্ট অবস্থায় পাঠিকাসুলভ কৌতূহল প্রকাশ করে না। আমরাও ঐ এক অবস্থা, লেখা যখন চলে তখন আমি কারও সঙ্গে আলোচনা করতে ভরসা পাই না। ছাপাখানার কম্পোজীটরই প্রথম আমার লেখা পড়েন।

মাধুরী জিজ্ঞেস করছে, “কী হলো তোমার?”

আমি বলছি, “মাধুরী, পরিশ্রমে কখনও শরীর দুর্বল হয় না। দেহ দুর্বল হয় তখনই যখন তুমি যা করতে চাইছো তা সফল হচ্ছে না। গাড়ির ইঞ্জিনটা গোঁ গোঁ করেছে কিছুতেই সচল হচ্ছে না।”

মাধুরীকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। সে আমার পরিশ্রমের জন্য গর্ব বোধ করেছে। একদিন হয়তো পৃথিবীর মানুষদের সে বলবে, "আমার স্বামী কি কঠিন সাধনায় দিবারাত্র মগ্ন থাকতেন তা যদি আপনারা জানতেন।

আমি এখন মাধুরীকেও প্রশ্ন করতে চাই। আমার মনের মধ্যে নানা ভয় ঢুকেছে। "মাধুরী, আজকাল পাঠক কী চায় বলো তো? সেক্স?"

"ওই সব নোংরামি অনেকে নিশ্চয় পড়ে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে পাঠক-পাঠিকারা তা প্রত্যাশা করে না।" মাধুরীর মনে কোনো দ্বিধা নেই। অথচ আমার সারাক্ষণ ভয় মানুষের রুচি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, লেখক হিসেবে আমি তার খোঁজ খবর রাখছি না। এই রুচিবদলের রেল দুর্ঘটনাতেই আমি হয়তো একদিন শেষ হয়ে যাবো।

আমি মনে-মনে এবার ভায়োলেন্স কথাই চিন্তা করছি। মাধুরীকে আমি জিজ্ঞেস করবো না, সেক্সেই যখন ওর ঘোর আপত্তি, তখন ভায়োলেন্সকেও সে নিশ্চয় প্রশ্রয়দেবে না। এক-একজন লেখকের কাছে মানুষের এক-একরকম প্রত্যাশা, এই কথা বলে মধুরী আমার মনে বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছে। সম্পাদক হরিহর দে নিশ্চয় অনেক ভেবেই ওই অপ্রত্যাশিত শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা আমাকে অভিনবত্বের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেবে।

মাধুরী কিন্তু আমার কাছে কী চাইছে তা আমি জানি। মাধুরী চায় আমার তৈরী সব চরিত্রের মহৎ উত্তরণ হোক। নিত্যদিনের গ্লানিমুক্ত হয়ে তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পদযাত্রা করুক। কিন্তু মাধুরী খবর রাখে না, প্রচণ্ড দুর্দিনের মধ্যে চলেছে গল্প-উপন্যাসের জগৎ! এখন মহৎ উপলব্ধির বাড়তি কোন মূল্য নেই। মানুষ সেখানে যথাযথ অঙ্কিত না-হলে লেখক বসবার আসনও পাবেন না। বাস্তবতার স্বর্ণশৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্টে বন্দী হয়েছে কথাসাহিত্যের চরিত্ররা, তাদের জন্য কোন মুক্তির পথও নেই। সংসারের আগুনে তাদের জ্বলেপুড়ে ক্ষতবিক্ষত হতেই হবে। বড্ড সাধারণ জায়গা এই মানব সংসার, এখানে কথায় কথায় মহৎ উত্তরণ কেমন করে সম্ভব?

মঠমিশনের মহারাজরা ভক্তদের যা বলেন তা অবাস্তব। স্বামী বিবাকানন্দ যা লিখে গিয়েছেন তা পড়তে ভাল, কিন্তু কোন কাজের নয়। আমি একটা লাইন কোথাও ঢুকিয়ে দেবো, "হে মহাপুরুষ, আপনার বাণী ও রচনা সেইসব ওষুধের মতো যার এক্সপায়রি ডেট

শেষ হয়ে গিয়েছে। দেখতে ঝকঝকে প্যাকেট, কিন্তু ওষুধের শক্তি নিঃশেষিত।" মাধুরী অবশ্য কিছুতেই আমার সঙ্গে একমত হবে না।

আমি আজ একটুও নড়াচড়া করবো না। এই গল্পটার শেষ না দেখে, ওই গরিমা লাহিড়ির একটা হেস্তনেস্ত না-করে আমি এই ঘরের বাইরে পা ফেলবো না। আমি সারাক্ষণ একটা নোংরা মেয়ের উদভ্রান্ত শরীরকে বুকে করে নিয়েই বসে আছি। এই অবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোনো ঘটনাব সঙ্গে আমার পরিচয় না-হওয়াই ভাল, কে জানে হঠাৎ কোন ঘটনা গরিমা লাহিড়ির ছবিটা পাল্টে দেবে, তখন আমি ভীষণ বিপদে পড়ে যাবো।

আমি মাধুরীর উপদেশ অনুযায়ী স্নান সেরে, কিছু হাল্কা খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি দিনের আলোয়। পূর্ণগর্ভা রমণীর মতন আমাকে সর্বদা গভীর যত্নে রেখেছে মাধুরী। এই মাধুরীকেই আমি বলেছিলাম— পূর্ণগর্ভা রমণীর শাস্ত্রীয় তুলনা পূর্ণপাত্র তৈলের সঙ্গে, সামান্য অসতর্কতায় অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

অফিস যাবার আগে মাধুরী আমাকে উত্তেজনা নিরোধক বটিকা খাইয়েছে। এই অশান্ত পৃথিবীতে মানুষ সারাক্ষণ কী করে অন্তরের শক্তিতে নিজেকে শান্ত রাখবে? তাই এযুগে কেমিস্টদের জয়জয়কার, তাঁরা অশান্তকে শান্ত এবং ধীরস্থির করার রাসায়নিক পন্থা উদ্ভব করেছেন। আমি সেই ওষুধ খেয়ে অনেকক্ষণ আলস্যে সময় অপচয় করেছি। মাধুরী অবশ্য তার জন্য মোটেই চিন্তিত নয়। যাবার আগে বলে গিয়েছে উত্তেজনার মধ্যে অকালে সৃষ্টির আনন্দধারা বর্ষিত হয় না।

আমি ঐ অর্ধচৈতন্য অবস্থায় চোখ বুজে মনে মনে রিপন লেনের সেই ঘরটাতে ফিরে গিয়েছি। আমি গরিমার অনাবৃত ঊর্ধ্বদেহর সমস্ত বিবরণ ধৈর্যের সঙ্গে ডায়রিতে টুকে নিচ্ছি, ঠিক যেমন ভাবে দর্জিরা তাদের খাতায় মাপ লেখে। গল্পটা শেষ করার দুশ্চিন্তা ছাড়া আমার মধ্যে কোনো রকম বাড়তি উত্তেজনা নেই।

আমার যেন হঠাৎ মনে হলো, গরিমা আমার পরিচয় জেনে ফেলেছে। সে জিজ্ঞেস করছে, "আপনার তো নজর ছিল ভূমার প্রতি। আপনার সাহিত্যে আপনি তো বারবার নগণ্যের মধ্যে মহত্তমকে সন্ধানের চেষ্টা করে এসেছেন। আপনি এখানে কেন।"

আমি কী করে বোঝাই এই রমণীকে যে আমি এবার পরিবর্তন

চাই। যে-লেখক নদীর মতন নয় এই মানব সংসারে সে লেখকের কোনো মূল্য নেই। এবার আমি মোড় ফেরাতে চাই, আমি দেখাতে চাই আমিও আধুনিক হতে পারি। প্রত্যেক আধুনিক লেখকের সঙ্গে আমিও অতি সহজে পাল্লা দিতে পারি।

গরিমা হঠাৎ যেন জিজ্ঞেস করছে, "এই যে এখানে এসেছেন স্ত্রীর অনুমতি নিয়েছেন? আপনার স্ত্রী আপনার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন?"

গরিমা, তুমি অযথা বাজে বোকো না। শিল্পীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো স্বাধীনতা, যেমন বিবাহিত পুরুষ ও নারীর দৈহিক নিষ্কলুষতা। আমি নিজেই ঠিক করবো আমি এবার কেমন লিখতে চাই। অসংখ্য বন্ধনের টানাপোড়েনেই আজকের কথাসাহিত্য গোল্লায় যেতে বসেছে—আমি চাই ব্রাইট, বোল্ড, বেপরোয়া হয়ে উঠতে। অথচ ছেঁদো কথার পুনরাবৃত্তি চাই না। পাগলের মতো আমি এমন কথা খুঁজে বেড়াচ্ছি যা এর আগে বলা হয়নি, যা অন্য কারও মানসলোকে এ যাবৎ ভেসে ওঠেনি।

গরিমা, তুমি মৃদু হাসছো। রিপন লেনের আনন্দসঙ্গিনী আমাকে উপনিষদীয় ভঙ্গীতে কী এমন সত্যের সন্ধান দিতে পারে যা শৃন্বন্তু বিশ্বে…বলে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বিশ্বজনের কাছে ঘোষণা করতে পারি?

আসলে, কুমারেশ মিত্তির একবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় যা বলেছিলেন তুমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাও।

কুমারেশ মিত্তির বলেছিলেন, "সারা জীবন ধরে প্রতিবার নতুন বোতল এবং নতুন মদ কোথা থেকে জোটাবো? নতুন থাকবার আরও দুটো পথ আছে—কখনও নতুন চরিত্রের বোতলে পুরনো আইডিয়ার মদ ঢেলে দাও, আবার কখনও পুরনো চরিত্রগুলোর বোতলে নতুন ভাবনাচিন্তার মদ পরিবেশন করো। দুনিয়া সারাক্ষণ লেখকের কাছে নতুনত্ব চাইছে, অথচ নতুনত্বের কী অসম্ভব দাম তা তারা জানে না। এই বিশ্বসংসার শুরু হওয়ার পরে খুব কম জিনিসই ঘটেছে যা নতুন।

আমি বেসামাল কুমারেশ মিত্তিরের কথাগুলো সেবার বাড়িতে ফিরে এসেই নোট করে নিয়েছিলাম। আমি জানি দেহবিলাসিনীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হাজার-হাজার বছর ধরে। কত বিভিন্ন ভঙ্গীতে দেহকামনার সেই পুরনো সুরটাই বেজে উঠেছে সাহিত্যিকের সেতারে। এবার আমি বিশেষ অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকে এই পুরনো পরিবেশকে নতুন মহিমায় মণ্ডিত করতে চাই।

আবার রাত এসেছে। মাধুরীও শেষপর্যন্ত কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। শুধু আমি জেগে রয়েছি। আমার চোখে ঘুম নেই এই জন্য যে আমাকে এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যা পড়তে পড়তে অন্যের চোখে ঘুম আসবে। কত লোক যে আমাকে বলেছেন, বিছানায় শুতে যাবার আগে গল্পের বইয়ের কয়েকটা পাতা না উল্টেলে তাঁদের চোখে ঘুম আসে না!

এই ক'দিনে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। রাতের পর রাত ধরে আমি গরিমাকে নিভৃতে বুঝবার চেষ্টা করি। আমি দেখেছি, মাধুরী যতক্ষণ জেগে থাকে, আমার কাছাকাছি বসে আমাকে অনুপ্রেরণা দেবার চেষ্টা করে, ততক্ষণ আমি গরিমার ওপর মনঃসংযোগ করতে পারি না। গরিমাকে আমি ঠিক যেন একান্তে পাই না।

মাধুরী এখন আমার এই যন্ত্রণা দেখে হতাশা যোগায় না। মাধুরী বলে, "আমি বুঝেছি তুমি নতুন কিছুর সন্ধান পাবে। নতুনের জন্ম-লগ্নেই তো কাতর যত প্রাণী।"

মাধুরী ঘুমোলে এই ঘর থেকে মনে-মনে সোজা আমি ওই রিপন লেনের দুপুরে চলে যাই। যেখানে তনিমা ওরফে গরিমা লাহিড়ি আমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে।

গরিমার শরীর আমার আয়ত্তের মধ্যে! পৌষের এই শীতে তার শারীরিক উষ্ণতা আমার জন্যে রিজার্ভড সীটের মতো অপেক্ষা করছে! গরিমা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনো অতিথিকেই সে ঠকায় না। এই বক্তব্য আমি অস্বীকার করবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। আমি কেবল অতিথির স্তর থেকে এই সুযোগ কিছুক্ষণ বন্ধুতে প্রমোশন চাই। গরিমার কথাবার্তা থেকে আমার বোঝা উচিত, একাধিক দিনের পরিচিতই বন্ধুত্বের দ্বার খুলে দেয়, একদিনের ডবল প্রমোশন হয় না! কিন্তু আমার যে অন্য অবস্থা, আমি পিকুলিয়র এক প্রবলেম নিয়ে এখানে এসেছি—একটু স্পেশাল আচরণ বোধহয় আমার প্রাপ্য।

গরিমা কী সহজভাবে নিজেকে গচ্ছিত রেখেছে আমার কাছে। একটা সুন্দর পাখি তার উষ্ণ শরীরটা যেন শিকারী বেড়ালের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে।

আমার গল্পে আর একটা পরিণতি উঁকি মারছে। বড়-বড় লেখকেরা বারবার তরুণ লেখকদের গোপন পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন

গল্পের শেষটা ভেবে রেখেছো তার কোনো বিকল্প আছে কিনা খোঁজখবর নিতে ভুলো না।

আমি ভাবছিলাম, এই শীতের দুপুরে নতুন আগন্তুক অনিন্দিতে নানাভাবে এই বিনোদিনী বালিকার জীবনে সমস্ত গল্প নিংড়ে বের করে নিক। শৈশব, কিশোর, যৌবন এবং বর্তমান জীবনের কোনো গোপনীয়তার টুকরো যেন অনিন্দিতের অজানা থাকে। বিনোদিনীর শরীরও সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে উঠুক।

তারপর বিচিত্র এক অবসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক আগন্তুক অনিন্দিত চৌধুরী। অনিবার্য এক শক্তির দুর্দমনীয় প্রতাপে সে দিশেহারা হয়ে উঠুক। তার মনে হোক, সব সময় অপচয় হয়েছে। নতুন কিছুই পাওয়া যায়নি এই বিনোদিনীর রমণীর বাক্য ও শরীর থেকে। সেই পুরনো ঘটনাগুলো, যা হাজার হাজার বছর ধরে সেই কথাসরিৎসাগরের যুগ থেকে বারে বারে লেখা হয়েছে, তাই আমার পাওয়া গিয়েছে একটু আধুনিক মোড়কে।

অনিন্দিত এবার একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠুক। বলুক, আমি স্রেফ নতুনের সন্ধানে আমার পরিশ্রম দেহসম্পদ সঙ্গে নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। হে নতুন, বিশ্বের সর্বত্র তোমার জয়ধ্বনি, তোমাকে বরণ করার জন্যে সবাই বরণডালা সহ প্রস্তুত, কিন্তু তুমি এখন কোথায়?

গরিমা বুঝতে পারুক, তার অতিথির মনঃসংযোগের অভাব হচ্ছে। নিপুণা সেবিকার মতো সে প্রশ্ন করুক, "কী হলো? আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি অন্য কারুর কথা ভাবছেন।"

অনিন্দিত মৃদু প্রতিবাদে জানবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যাক। গরিমা রসিকতা করুক: "কত রকমের যে বন্ধু আছে আমার। মিস্টার ঘোষাল—এইখানে এলেই ওয়াইফের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। আমি বলেওছি, যখন বউদির কথা এতোই মনে পড়ে তাহলে এখানে আসা কেন? ভদ্রলোক ভীষণ সরস। স্বীকার করেন, এইখানে এলে তবেই ওকে মনে পড়ে, তার আগে নয়।"

অনিন্দিত বুঝুক, পৃথিবীতে সবাই নতুন-নতুন করে হৈ-চৈ বাধাচ্ছে, নতুনের এতোই জয়ধ্বনি, কিন্তু নতুনের সংখ্যা খুবই কম। আসলে একের পর এক সাজানো জিনিসগুলো জপমালার রুদ্রাক্ষের মতো ঘুরে ফিরে আসছে। এই যে প্রভাত, সে ত্রি-সন্ধ্যার দূরত্ব পেরিয়ে রাত্রের শেষে আবার উপস্থিত হয় বলেই তাকে নতুন মনে হয়, সমস্ত

প্রকৃতিতে জয়ধ্বনি পড়ে যায়, কিন্তু আসলে সবই পুনরাবৃত্তির শৃঙ্খলে বাঁধা পুরাতন। পৃথিবীতে কতবার ভোর হয়েছে তার হিসেব নেই।

গরিমার দৈহিক উষ্ণতার সংযোগ ছিন্ন না-করেই আমার মাথায় নতুন ভাবনা উঁকি মারছে। আমি ভাবছি, ব্যাপারটা প্রচণ্ড নাটকীয় করে তুললে কেমন হয়?

গরিমার এই ছোট্ট দেহটি অনিন্দিত খেলনার মতো ব্যবহার করুক। তিলে তিলে এই দেহ এবং এই মনকে সে আবিষ্কার করুক। তারপর যদি ধীরে ধীরে তার মধ্যে ভেঙে ফেলার, দুমড়ে ফেলার, মুচড়ে ফেলার বাসনা জেগে ওঠে? অনিন্দিতর যদি মনে পড়ে, ছোটবেলায় এমনি হতো তার। কোনো খেলনা তার বেশিক্ষণ ভাল লাগতো না। খেলনা পেলেই সে কিছুক্ষণ সর্বস্ব ভুলে সেটা নিয়ে পড়ে থাকতো, তারপর যেমনি সব জানা হয়ে যেতো অমনি অস্বস্তিকর এক ক্লান্তি এবং বিরক্তি তাকে ঘিরে ধরতো। সে ধীরে-ধীরে কঠিন পাষাণের মতো হয়ে পড়তো। গরিমা যেন এখনও কিছুই বুঝতে পারেনি—ছোট্ট পাখির মতো তার গরম দেহটা সে অতিথিকে উপহার দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। এই সময় আদরের উপলক্ষে শরীরটাকে যদি দুমড়ে ছোট্ট করে ফেলা যায়—যদি কিছু না বুঝেই গরিমা বলে ওঠে, একটু আস্তে। গরিমা এখনও বুঝতে পারেনি, ধ্বংসের কি ভয়ঙ্কর বাসনা চেপে বসেছে তার অতিথির বুকে।

গরিমার গলাটার আকারও দশটা আঙুল দিয়ে অনুভব করে নিয়েছে তার অতিথি। গরিমা এখনও কি নিশ্চিন্ত! কোনো দুর্ভাবনার ছায়া নেই তার নগ্ন শরীরে। আর এই দৃশ্যটা যদি সুন্দর করে ধীরে ধীরে তুলে ধরা যায় পাঠকের সামনে। যেন পাঠকের চোখের সামনেই সুনিবেদিত শরীরের ধারাবিবরণী পেশ হচ্ছে। অনিন্দিত আজ অভাবনীয় কিছু করে বসবে—এই দেহ-খেলনা সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট নেই তার মনে। সে এবার ভাঙতে চায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বোকামি করে বসলাম। আমি ভাবছি, ঐ সুলভ দেহটির উত্তাপ কোন পদ্ধতিতে চোখের সামনে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়? আমার হাতের ধাক্কায় হঠাৎ বিরাটাকার অভিধানখানা খান দুয়েক পেপার ওয়েটসহ হুড়মুড় করে টেবিল থেকে মেঝেয় পড়ে গেলো! অভিধান বাঁচাতে গিয়ে আমি অসতর্ক একটু ডাইভ দিয়েছিলাম এবং সেই সংঘাতে টেবিলের তিন প্রহরী (ঠাকুর, শ্রীমা ও

বিবেকানন্দ) পপাত ধরণীতলে।

মাঝরাতের সেই আওয়াজে বেচারা মাধুরীর পাতলা ঘুম ভেঙে গেলো। সে দ্রুত উঠে পড়ে আমার কাছে এলো। মাধুরী পড়ে-যাওয়া জিনিসপত্তরগুলো টেবিলে তুলে দিচ্ছে। তিন শক্তিমান গার্জেনের কাঁচে ভেঙেছে।

মাধুরী আমার উত্তেজনা বাড়াতে চায় না। সে সহজভাবেই বলছে, "কালকেই আমি ছবিগুলো নতুন করে বাঁধিয়ে আনবো। তুমি কিছু ভেবো না।"

আমি দেখছি মাধুরীর ছবিখানাই বড় জোর বেঁচে গিয়েছে। ঠাকুর-মা-স্বামীজী দুনিয়ার লোককে রক্ষা করলেও নিজেদের সামলাতে পারলেন না।

মাধুরী ভেবেছে আমার চোখে ঘুম এসেছে এবং মুহূর্তের অসাবধানতায় অভিধানখানা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মাধুরী আমার হাতটি ধরে পরম স্নেহে বলছে, "চলো। শোবে চলো। কাল আবার লিখবে। শরীর যখন বিশ্রাম চায় তখন তাকে কষ্ট দিতে নেই।

মাধুরী, শোনো আমার ঘুম আসেনি। আমি একটা 'একসাইটিং' পরিণতির ঝলক মুহূর্তের জন্য দূর-দিগন্তে দেখতে পেলাম। আমি তোমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম। ধরো, গল্পের নায়ক। ধরো সে একজন লেখক, ধরো সে যদি তার এক চরিত্রকে খুন করে। ঠিক ভেবেচিন্তে নয়, কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে কিছুটা নিজের অজান্তে। ঠিক নেশার ঘোরে নয়, এই এমনি—ছোটবেলার একটা দুর্বলতায়। এই মৃত্যুটা হবে ভীষণ নাটকীয়, অথচ আসবে অতি ধীরে ধীরে। হত্যার হিংস্রতা থাকবে না, অথচ সমস্ত দেহযন্ত্রণা থেকে মুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে অতি যত্নে একের পর এক যে ছবি মনের মধ্যে সাজিয়েছিলাম আমার স্ত্রী তা এক কথায় বাতিল করে দিলো। সে বললো, "ওসব তোমাকে মানায় না। তোমার কাছে মানুষ শান্তি চায়, পথের নিশানা চায়, তুমি কাউকে খুন করবে তা কেউ ভাবতেও পারবে না।"

"আমি নয়। আমার সৃষ্ট এক চরিত্র।" আমার অসহায় প্রতিবাদ এই গভীর রাতে মাধুরীর কানে ঢুকছে না।

সে বলছে, "ঐ একই কথা হলো। তোমার প্রত্যেকটা চরিত্রের হর্তাকর্তাবিধাতা তো তুমিই। তুমিই তো বলেছিলে, প্রত্যেকটা চরিত্রের

প্রত্যেকটা কাজের জন্যে একমাত্র লেখকই দায়ী। না, তুমি ওসব কোরো না। তুমি ছোট হয়ে যাবে।” আমাকে মোক্ষম ওয়ার্নিং দিয়ে মাধুরী আবার মশারির ভিতরে আশ্রয় নিলো। আমি ভাবছি, মাধুরীকে নাহয় বোঝা গেলো। তার চিন্তায় একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর, শ্রীমা, বিবেকানন্দ কেন এমনভাবে বেসামাল হলেন? নিজেদেরই যাঁরা রক্ষে করতে পারেন না তাঁরা দুনিয়ার সমস্ত পাপীতাপীকে কী ভাবে হোলসেল রেটে রক্ষে করবেন?

এদিকে রিপন লেনের ঘরে গরিমার সুশাসিত তনুদেহটি সুখ শয়নে অর্ধসুপ্ত রয়েছে। আমি দ্রুত তার অতিথিকে সংযত করে নিয়েছি। অনিন্দিত একবার এক মুহূর্তে ঠাকুর-স্বামীজীকে স্মরণ করুক। এই দেহ এবং এই আত্মাকে গ্লানিমণ্ডিত করার জন্য সে গরিমা-সান্নিধ্যে আসেনি। দেহ এবং আত্মার দুই স্ট্যাটাস। আত্মা কালিমামুক্ত স্টেনলেস ইস্পাতের মতো, সারাক্ষণ ঝক ঝক করছে—সেখানে কলুষতা স্পর্শ করে না। দেহের কথা অন্য—সেখানে সাবধান না হলেই ময়লা লাগে। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট এইসব বিখ্যাত কোম্পানির কাপড়কাচা পাউডারের ক্ষমতা? যা সমস্ত মলিনতা দূর করে নোংরা বস্ত্রখণ্ডকে চকচকে ঝকঝকে করে তোলে? হে ঠাকুর, আপনারাই তো আমাদের কাপড়-কাচা পাউডার, ডিটারজেন্ট সাবান! আমাদের নিরমা, আমাদের সার্ফ, আমাদের সানলাইট। আপনারা থাকতে আমরা কেন চিরতরে মলিন হয়ে যাবো?

অনেক রাতে আমি অবশেষে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছি। গরিমা নাম্নী দেহবিলাসিনীর অতীত আমাকে নতুন কিছু দেয়নি। সেই ছেঁদো কথা, কেউ ঠকিয়ে ঘরের দেহটাকে পণ্যসামগ্রীতে রূপান্তরিত করছে। না, গরিমার পিছনে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের অসহনীয় জ্বালা ছিল না। সেই ছেঁদো গল্প—ভাই বোন বিধবা মাকে প্রতিপালনের আর্থিক উদ্বেগও নেই। বাংলায় ওই সব বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট আর চলবে না। দারিদ্র্যকে কলা দেখিয়ে কেউ যদি বিজয়িনী হতে পারে তা গল্প হলেও হতে পারে, দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ ইজ নো স্টোরি।

গরিমা আরও অনেক পরিণতবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। যুগল জীবনের দারুণ জ্বালা গরিমা নিজের বিবাহিতা বান্ধবীর জীবনেও দেখেছে। স্রেফ কপালে এক চিলতে লাল সিঁদুরের দাগ এঁকে রাখার অধিকার-

টুকুর জন্যে এক একজনকে কি নিদারুণ কষ্টস্বীকার করতে হয় অকারণে—একেবারেই যা নিরর্থক।

গরিমা একজন প্রফেসনাল। সে নিজের প্রচেষ্টায়, নিজের কুশলতায় কাউকে না ঠকিয়ে কারুর ওপর কোনো শোষণ না চালিয়ে, নিজের সম্মান নিয়েই ধরণীর এক কোণে নিজের খুশি মতো বসবাস করছে। গরিমা লাহিড়ি সমাজের কারও কৃপাভিখারিণী নয়। সে প্রতিষ্ঠিতা। আত্মপ্রতিষ্ঠার নিভৃত আনন্দ কুশলী প্রফেশনালদের মানসিক প্রশান্তির ভিত্তিভূমি।

তবু গরিমা এই লেখককে বেশ বিপদে ফেলছে। গরিমা যদি গরীয়সীতে রূপান্তরিতা হয় তাহলে তা নৈতিক অধঃপতনের জয় হলো। সেক্ষেত্রে সামাজিক নৈরাজ্যের তো বিলম্ব থাকে না। গল্পের খাল কেটে শারীরিক অপবিত্রতার কুমীরকে তো সমাজে ডেকে আনা যায় না।

এইবার আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি। আমাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে হবে। কিন্তু গরিমারও তো ধৈর্যের সীমা আছে। এবার সে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছে।

শোনো গরিমা। মনে করো, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো সেই হাওড়া রামরাজাতলার মোড়ে। তোমার সংসারাশ্রমের গর্ভধারিণী জননী। তুমি কী মুখ তুলে তাকাতে পারবে? মনে করো তোমার ইস্কুলের সহপাঠিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো সিনেমা হলের সামনে। তোমার বিবাহিতা বান্ধবী কি তার স্বামীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে? তোমার বোন, তোমার শুভার্থী, কেউ কি তোমার সঙ্গে দেখা হলে স্বস্তি বোধ করবে?

গরিমা খুব সহজ করে নিতে চাইছে ব্যাপারটা। সে তো বলছে, "পুরনো চেনা-জানা কারও সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথাই ওঠে না। আমি তো সংসারাশ্রমের কথা ভুলে গিয়েছি।"

গরিমার মধ্যে এখনও কিন্তু রসের অভাব হয়নি। "আমাদের তো কাউকে চেনবার কথা নয়। এই যে ঘরের মধ্যে আপনার সঙ্গে এমনভাবে আলাপ হচ্ছে, ঘরের বাইরে আপনি আমাকে চিনতে পারলেও আমি আপনাকে চিনবো না। বিপদে ফেলবো না। কেউ বুঝবে না একদিন আপনার সঙ্গে সময় কেটেছে! এই আমাদের নিয়ম। আমরা আমাদের প্রফেশনের মর্যাদা রাখি।"

তারপর আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না। কোন খেয়ালে কেন যে আমি এখানে ছুটে এসেছিলাম তা আমি নিজেই বুঝতে

পারছি না। নতুন কিছু আবিষ্কার করিনি—শুধু দেখেছি গদাধর চ্যাটার্জি এবং তাঁর ওয়াইফ সর্বত্র শিকড় গেড়ে বসে আছেন, চুটিয়ে সর্বস্তরে প্র্যাকটিস করে চলেছেন। ঠাকুরের দয়ায় মৃত্যুর পর মুক্তির যে কোনো হাঙ্গামা হবে না, সে বিষয়ে গরিমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

আমার গল্পের এখন একটা ল্যাণ্ডিং প্রয়োজন। শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে বিমানের অবতরণভূমি। আমি নতুন এক পরিবেশের সন্ধানে সামান্য একটা দরজার সামনে একজন পুরুষ ও রমণীর মুহূর্তের ব্যবসায়িক লেনদেনের ইঙ্গিত থেকে টেক-অফ্ করে অনেক পথ এগিয়ে এসেছি। আমি কড়ি দিয়ে এক রমণীর সান্নিধ্যসময় ক্রয় করে দুর্গম অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এবার শুধু অবতরণভূমি প্রয়োজন।

অথচ গরিমা এবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বুঝছে না, আমি এখনও কেন আমার প্রকৃত প্রাপ্য বুঝে নিচ্ছি না।

অশেষ ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। আরেক রাত্রির সাধনায়, আমি অবশেষে অনিন্দিত এবং দেহসর্বস্ব গরিমাকে অবতরণভূমিতে নিরাপদে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছি। আমি আমার নতুন উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদের শেষ শব্দটি লিখে ফেলেছি। গরীয়সী গরিমাকে যখন আমি ঘৃণা করতে যাচ্ছি পরম অবসাদের মুহূর্তে, তখন সে বলেছে যে নিজেকে সে ব্যর্থ মনে করে না, কারও থেকে সে ছোট নয়। কারণ মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে তাকেই তো সে আনন্দ দেয় দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে। নতুন এই দৃষ্টিকোণ আমাকে সৃষ্টির উল্লাস দিয়েছে—সাধারণ রমণীর কাছ থেকে আমি অসাধারণ বাণী শ্রবণ করেছি। দেহপসারিণী রমণীও তুচ্ছ নয়, মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পবিত্র কাজেই তো সে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।

মাধুরী জেগে উঠেছে। সে যেমন শুনেছে আমার শেষ লাইন লেখা হয়েছে সে তখনই ভীষণ খুশি হয়ে উঠেছে।

মাধুরী জানে এবার আমি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠবো। আমার রসবোধ ফিরে আসবে, আমি হাসাহাসি করতে পারবো।

মাধুরীর মহৎ গুণ সে আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করে না আমি কেমন করে গল্প শেষ করলাম, কেমনভাবে আমার চরিত্রদের জন্ম-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিললো।

আমার বন্ধু ইন্দ্রভূষণের এইসব বিষয়ে ভীষণ কৌতূহল সে জানতে উন্মুখ কোন চরিত্রের কপালে শেষ পর্যন্ত কী ঘটলো। কিন্তু মাধুরীর কোনো ব্যস্ততা নেই। সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বসে আছে তার স্বামী পৃথিবীর কারও ওপর কোনো অবিচার করবে না, এমন কি নিজের তৈরি চরিত্রদের ওপরও না।

প্রসবের পর জন্ম-যন্ত্রণার শেষ হবে এই তো স্বাভাবিক। আমার ক্ষেত্রেও চিরকাল তা হয়ে এসেছে। আমি লেখা চলাকালীন ছট ফট করেছি, ধৈর্যচ্যুতিও ঘটেছে আমার, নিজের ওপর বিশ্বাসও হারাতে বসেছি কখনও কখনও, কিন্তু যেমনি আমি শেষ পাতার শেষ লাইনে উপস্থিত হয়েছি আমি অন্য রকম হয়ে গিয়েছি, আমার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে।

এবার কিন্তু মাধুরী কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না আমার। সে বলছে, "কী হলো তোমার? যা কষ্ট পাবার তা তো পেয়ে গিয়েছো। যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে।"

এই শেষ কথাটা আমার বুকের মধ্যে একটা তীরের মতো এসে বিঁধেছে। মাধুরী কেন যে আমায় এমনভাবে কষ্ট দিতে চায়!

মাধুরী দেখেছে, আমার রাত্রে ঘুম আসতে চায় না। আমি এখনও সেই লেখা চলাকালীন উত্তেজনার আগুনে জ্বলে পুড়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। আমি লিখি না, কিন্তু চুপচাপ বসে থাকি। সারারাত ধরে বিশ্লেষণ করি চরিত্রগুলোর

মাধুরী বুদ্ধিমতী। সে এক একদিন জেগে উঠে আমাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। "তোমার লেখা তো সম্পাদকের কাছে চলে গিয়েছে। বিশেষ সংখ্যায় 'আনন্দসঙ্গিনী' তো প্রকাশিত হলো বলে। বিনোদনের সময় এগিয়ে আসছে পৃথিবীতে, সেইসময় তোমার গল্পটাও লোককে নিশ্চয় আনন্দ দেবে। শুধু তারা জানবে না অপরকে আনন্দ দিতে গিয়ে তুমি নিজে কত কষ্ট পেয়েছো।"

আমার বন্ধু ইন্দ্রভূষণও বাড়িতে এসেছে। বলেছে, "কী হলো তোমার ব্রাদার? প্রসবপরবর্তী সূতিকায় ভুগবে না কিছুতেই।"

মাধুরীর সঙ্গে কথা বলে ইন্দ্রভূষণ বুঝেছে, এবার আমি নতুন পথে যেতে গিয়ে বড় বেশী কষ্ট পেয়েছি। মাধুরী বলেছে, আসলে ওর উদ্বেগ কাটবে না যতক্ষণ না পাঠকরা রায় দিচ্ছে।

"সম্পাদককে পাঠাবার আগে একবার পড়ে দিলে না কেন, বোনটি

আমার ?" মাধুরীকে পরামর্শ দিয়েছে ইন্দ্রভূষণ।

আমি কারো কথা কিছুই বুঝতে পারি না। আমার মনের মধ্যে কীরকম এক ভয় প্রবেশ করছে। একবার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পূজাসংখ্যায় লেখা প্রকাশের আসন্ন মুহূর্তে এইরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন, পাঠকদের হাত থেকে রক্ষে পাবার জন্যে কোনো অজানা ঠিকানায় পালিয়ে যাবেন।

আমিও এবার পালাতে চাই। কিন্তু কোথায় পালাবো ? আমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ছে ঐ হতভাগা ইন্দ্রভূষণের ওপর। কী দরকার ছিল, দিল্লির ওই মিস্টার নরহরি ব্যানার্জির রিকশ থেকে নেমে রিপন লেনের বাড়িতে প্রবেশের ঘটনাটা আমাকে বলবার ? ওটা না শুনলে আমি তো অন্য কিছুর অনুসন্ধান করতে পারতাম। গরিমা লাহিড়ির জীবনের সঙ্গে ওইভাবে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হতো না। আমি নিজেও কেন নতুন হবার লোভে মত্ত হলাম ? কত গভীর দীঘি আছে যেখানে কোনো পরিবর্তন হয় না, মানুষও কোনো পরিবর্তন প্রত্যাশা করে না। সব লেখককেই কেন বা নদীর মতো হতে হবে ?

আমার লেখা ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যায় আজ বোধহয় প্রকাশিত হবে। মাধুরী যা বলেছিল, তাই আমি মেনে নেবার চেষ্টা করছি—যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে।

আজ মনে পড়েছে আমার সঙ্গে মাধুরীর সম্পর্কের কথা। মাধুরী না-হলে আমার এই সাহিত্য ধারা সংসার-মরুপথে কবে কোথায় হারিয়ে যেতো ! মাধুরী, তোমার অশেষ দয়া। পক্ষীমাতার মতো তুমি সাহিত্য-শাবককে সযত্নে রক্ষা করে এসেছো সব রকম সাংসারিক দুর্যোগ থেকে।

মনে পড়ছে কত কথা। আমি কালজয়ী বিপুলপ্রভাবশালী জনচিত্তবিজয়ী কথাকার হবার সৌভাগ্য অর্জন করিনি। কিন্তু যতটুকু হয়েছি তা সম্পূর্ণ হয়েছি তোমার দয়ায়।

মাধুরী, তোমার মনে পড়ে ? তুমিই বললে, "চাকরি ছেড়ে দাও, মন দিয়ে লেখো।"

আমি বললাম, "এ-দেশে দ্বিতীয় কোনো বৃত্তি না রেখে লেখক হওয়া নিরাপদ নয়।"

মাধুরী তুমি বললে, "তোমার বউয়ের চাকরিটা তো চলে যাচ্ছে না!"

মাধুরী, তুমি ওই কুমারেশ মিত্তিরের কথাটা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলে—পার্টটাইম লেখকরা লেখকই নন। সকালবেলায় কসাইয়ের

কাজ করে বিকেলে পুরোহিতের প্রফেসন চালানো যায় না।

আমি পাঠকের প্রত্যাশা কিছুই পূরণ করতে পারতাম না যদি-না মাধুরী তুমি আমাকে তুচ্ছ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে।

মাধুরী কী মধুরভাবেই এতোদিন ধরে চাকরি এবং সংসারের বোঝা মনের খুশিতে বয়ে গেলো, যাতে আমি স্বাধীন হতে পারি যারা পরাধীন, যারা অপরের দাসত্ব করে তারা যে লেখক হতে পারে না, তা এখন আমি বুঝি—একমাত্র স্বাধীন মানুষদেরই লেখক হবার স্বাধীনতা রয়েছে।

আমি ভাবছি কখন ইন্দ্রভূষণ আসবে। লেখা পড়ে সে-ই প্রথম ছুটে আসে চিরদিন। ঠিক তারপরেই আমি মাধুরীর মতামতটা পেয়ে যাই।

ইন্দ্রভূষণ অফিসের কাজে পাটনায় গিয়েছিল। সেখানেই ম্যাগাজিন কিনে নিয়েছে, তারপর হৈ-চৈ করে বাড়ি ফিরলো।

"হাতে হাত দাও, ব্রাদার! এ যেন নতুন এক লেখকের আত্মপ্রকাশ। তুমি ফাটিয়ে দিয়েছো!"

মাধুরীও এসে আলোচনায় যোগ দিয়েছে। ইন্দ্রভূষণ তখন তার বোনকে বলে যাচ্ছে, "এই গাছে যে এই ফল ধরে তা আমার কল্পনাতে ছিল না। তোমার স্বামী-দেবতা এবার অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। আমি ভেবেছিলাম তোমার লেখক-স্বামীর সৃষ্টিশক্তি শুকিয়ে যাচ্ছে। এক একটা গাছ আছে—ভাল ফল দেয়, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।"

মাধুরীও যে গল্প পড়ে ফেলেছে তা আমি বুঝতে পারছি। ইন্দ্রভূষণ হাঁড়ির খবর নিয়ে এসেছে। "ক্লিক করে গিয়েছে। অফিসে অনেকেই খু-উ-ব প্রশংসা করছে। বলছে, উনি যে অমন অপ্রত্যাশিত বেপরোয়া উপন্যাস লিখতে পারবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি।"

আমি নিজে কিন্তু স্বস্তি বোধ করতে পারছি না। আমি লেখার প্রশংসা পছন্দ করি না এমন নয়। কিন্তু এবার মাধুরী এবং ইন্দ্রভূষণ আমাকে এইভাবে ঘিরে-না ধরলেই ভাল করতো।

"ইন্দ্রভূষণ, তুমি ট্রেন জার্নির শেষে অফিস করে সোজা চলে এসেছো। এখন তুমি বাড়ি যাও!" কিন্তু সে-দিকে তার কোনো খেয়াল নেই।

ইন্দ্রভূষণ বললো, "আমার ভীষণ ভাল লেগেছে, ওই গরিমা মেয়েটাকে তুমি ছোটও করোনি আবার খুব বড়ও করোনি। শেষে

সমস্ত দুঃখ অপমানের মধ্যেও যে বলেছে, 'আমার কোনো কষ্ট নেই, অনিন্দিতবাবু। কেন কষ্ট থাকবে শুধু শুধু? কেন শুধু শুধু ছোট হয়ে যাবার যন্ত্রণায় ভুগবো?' "

আমি দেখছি ইন্দ্রভূষণ হুড় হুড় করে প্রায় মুখস্থ বলে যাচ্ছে আমার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসের শেষ কয়েকটি লাইন।

মাধুরীও এখন ইন্দ্রভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর ইন্দ্রভূষণ বলছে, "ওই যে গরিমা, তার অনাবৃত দেহকে আবার আবৃত করে নিয়ে ঠাকুর স্বামাজীর ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, 'আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আমরা ছোট হতে যাবো কোন দুঃখে? মানুষকে আমি আনন্দ দিই। মানুষের কত কষ্ট, মানুষের ওপর কত চাপ। মানুষকে আনন্দ দেওয়াটা কাজ নয়? আপনি বলুন।' ওইখানেই তুমি হাইটে উঠে গিয়েছো। মাইডিয়ার ব্রাদার, একদিন তুমি এই রকম লিখবে এই আশায় আমার বোন মাধুরী তোমার গলায় মালা দিয়েছিল ইন অ্যাডভান্স। আমার এবং মাধুরীর কোনো দুঃখ রইল না আর।"

প্রশংসা গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ কোনো কিছুর মধ্যেই যেতে পারছি না আমি। আর ইন্দ্রভূষণ বলছে, "তুমি অধঃপতিতকে কয়েকটি শব্দের মন্ত্রশক্তিতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছো। সে নিজের মূল্যবোধ খুঁজে পেয়েছে। যে-মানুষ তার মর্যাদা হারায়নি সে তো এখনও কিছুই হারায়নি।"

ইন্দ্রভূষণ এরপর বোম ফাটিয়েছে। "তুমি যে জাদু জানো, তা আমি নিজে হাড়ে-হাড়ে বুঝলাম। আগে এক একবার ভেবেছি, আমার বোন মাধুরী তোমার মধ্যে কী দেখে এইভাবে আত্মনিবেদন করলো। কিন্তু এখন আমি সব সন্দেহ ফিরিয়ে নিচ্ছি উইথ রেট্রসপেকট্রিভ এফেক্ট।"

আমাকে একজন সুপারম্যান না-করে ছাড়বে না ইন্দ্রভূষণ। কয়েকদিন ধরে আমার লেখাটার যতই প্রশংসা বাড়ছে ততই সে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে।

"এই প্রথম গল্প কি করে তৈরি হয় তা আমি নিজের চোখে দেখলাম," সে আমার সামনেই মাধুরীকে বলছে। আর আমি লজ্জা পাচ্ছি। নিজেকে গুটিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

"ব্রাদার, তুমি একটি বিস্ময়। এখন আমি বিশ্বাস করি, ভগবান

লেখকদের এমন একটা বাড়তি চোখ দেন যা দিয়ে তাঁরা অদৃশ্য সব কিছু দেখতে পান।"

"আঃ ইন্দ্রভূষণ, তুমি একটু থামো। তুমি আর ঐ ভাবে আমাকে বাড়িও না, আমার কষ্ট হয়।"

মাধুরী অবশ্য বেশ আনন্দ পাচ্ছে। "লেখাটা লিখতে গিয়ে মানুষটা কী কষ্ট পেয়েছে তা আমি নিজের চোখে অসহায়ভাবে দেখেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই যন্ত্রণা দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।"

ইন্দ্রভূষণ যাতে অভিভূত তা হলো: "সামান্য একটা ইঙ্গিত। যাকে ঠিক ঘটনাও বলা যায় না। সেই ইঙ্গিতটা আমিই দিলাম লেখককে। আর মানুষটা তার ঘরের চৌহদ্দির বাইরে পা না দিয়ে কেমন করে তাকে অসামান্য করে তুললো, যে কেউ ভাববে ওই গরিমা লাহিড়ির সঙ্গে দিনের পর দিন কাটিয়েছে লেখক।"

আমি স্বাভাবিক কারণেই একটু অস্বস্তি বোধ করছি, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে।

"ইন্দ্রভূষণ, প্লিজ ফর গড্‌স সেক তুমি প্রশংসা বন্ধ করো। লেখকরা বিধাতাপুরুষ কিনা সে নিয়ে অনেক আলোচনা তো হরিহর দে'র সাহিত্যসংখ্যায় হয়ে গিয়েছে। নিজের জমিদারিতে চরিত্রদের ওপর তিনি লাঠি ঘোরান এই পর্যন্ত।"

ইন্দ্রভূষণের থেকেও বিপদ বাড়াচ্ছে মাধুরী। আমার সম্বন্ধে যত কিছু প্রশংসা হচ্ছে তার প্রতিটি শব্দ সে বিশ্বাস করে বসে থাকছে।

"প্রশস্তিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই, মাধুরী। এ-কথা তোমার তো অজানা নয়, কত জ্ঞানগর্ভ বই পড়েছো তুমি। তুমি ওইসব কথায় পথ হারিও না, মাধুরী।"

ইন্দ্রভূষণ আজ ছাড়বে না। মাধুরী বললো, "কতদিন ঘর থেকে বেরোও না, যাও আজকে একটু বেড়িয়ে এসো।" মাধুরী প্রায় জোর করেই আমাদের দু'জনকে পথে বের করে দিয়েছে।

ইন্দ্রভূষণ আজ যেন আমাকে প্রথম আবিষ্কার করছে। ইন্দ্রভূষণ বলছে, "মানুষ কী করে এমনভাবে দেখার ক্ষমতা পায় বলো তো?"

আমি নিরুত্তর।

আমার বন্ধু ইন্দ্রভূষণ বলেছে, "আমার কল্পনার অতীত। আমি ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বললাম, আর তুমি সেইটা বুকের মধ্যে নিয়ে এমন অসাধারণ কর্ম করে বসলে, লেখার সময় আমাদের কাউকে

কিছুই বুঝতে দিলে না। আমাকে একটা বাড়তি প্রশ্ন করলে না ওই তনিমা সম্পর্কে।”

আমি নিরুত্তর থাকতেই চাই। কিন্তু কিছু না বললে ইন্দ্রভূষণ ভুল বুঝবে। ভাববে, অনেকদিন পরে পাঠকের হৃদয় জয় করে আমার গর্ব হয়েছে।

আমি বললাম, “মাধুরী তো সব জানে। সে তো আমাকে রাতের পর রাত পাহারা দিয়েছে।”

বাড়ি ফিরে এসে আমরা আবার মাধুরীর স্নেহপ্রশ্রয় লাভ করেছি। সব শুনে সে ইন্দ্রভূষণকে বলেছে, “বুঝতে আবার পারিনি! এবার লেখা নিয়ে ও কিন্তু বড্ড কষ্ট পেয়েছে। রাত জেগে-জেগে বেচারা শুধু হাতড়ে-হাতড়ে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের ছবিটাও ভেঙে গেলো। তখন অবশ্য আমার খুব ভয় হয়েছিল একটা অঘটন না ঘটে যায়, যদিও ওকে তখন কিছু বলিনি।”

আমার অস্বস্তি বেড়েই চলেছে।

ইন্দ্রভূষণ বলছে, “মাধুরী, তোমার স্বামীদেবতাটি একটি জিনিয়াস। ওরা ওই লেখার টেবিলে বসেই সব দেখতে পায়—ওদের মনের গতি সর্বত্র। অথচ যখন লিখতে বসবে তখন এমন ছটফট করবে, এমন নার্ভাস ভাব দেখাবে যে মনে হবে মাথায় কিছুই নেই। চারদিকে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।”

মনের আনন্দে মাধুরীর কথা শুনছে ইন্দ্রভূষণ। সে এবার মাধুরীকে বলছে, “লেখককে পুরস্কার দেবার সঙ্গে-সঙ্গে লেখকের বউকেও সম্মানিত করা উচিত। সৃষ্টির সমস্ত যন্ত্রণাটুকু তিনিই তো সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সামলে দেন।”

মাধুরী বড় সরল। তার ঐসব পুরস্কারের প্রত্যাশা নেই, তার শুধু প্রত্যাশা যে মুখ করে সে স্বামীকে চাকরি ছাড়িয়ে সারাক্ষণের লেখক করেছিল তা যেন রক্ষে হয়। অনেকে তখন হেসেছিল, মাধুরীকে বলেছিল—এসব বাড়াবাড়ি। পুরুষমানুষকে বাড়িতে বসিয়ে খোদার খাসি করলে সে অপদার্থ হয়ে যায়।

আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী। এমনই একদিনে মাধুরী ও আমি কারও কথা না শুনে রেজেস্ট্রী অফিসের ছাদনাতলায় নিজেদের একই

সূত্রে গেঁথে ফেলেছিলাম। মাধুরী আজ অনেক সকালে বেরিয়ে গিয়েছে। অফিস যাবার পথে সে মন্দিরে ঘুরে যাবে। যাবার আগে সে লিখে গিয়েছে—দুষ্টু মহাশয়, আমার লোক চিনতে ভুল হয় না।

আর আমি অপেক্ষা করছি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'আনন্দসঙ্গিনী' বইটার প্রথম কপিটার জন্যে। ইন্দ্রভূষণই বুদ্ধিটা দিয়েছে। বিবাহ-বার্ষিকীর দিনেই ঝটপট বইটা বের করে দাও। তারিখটা কায়দা করে বইয়ের কোথাও লিখে দিও, যাতে তোমরা বুঝতে পারলেও অন্যরা না বোঝে।

আমার এই বদখেয়ালের জন্যে প্রকাশকের অফিসে অনেকেই প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। মুদ্রাকর রাত জেগেছেন, প্রুফ সংশোধক মুহূর্তের বিশ্রাম পাননি, বাইণ্ডার অনেক গঞ্জনা সহ্য করেছেন। দু একদিন পরে বই বেরুলে মহাভারতের কী অশুদ্ধি হতো তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। ইন্দ্রভূষণ নিজেই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় বলে বেড়িয়েছে, "জানেনই তো লেখার লাইনের লোকগুলো একটু কেমন-ধরনের হয়। দেখলে বোকা-বোকা উদাসী মনে হয়, কিন্তু মাথার মধ্যে কীসব আইডিয়া যে লুকিয়ে থাকে।"

প্রকাশকের অফিস থেকে নতুন বই এসে গিয়েছে। ইন্দ্রভূষণই পরামর্শ দিয়েছে মাধুরীকে আজ তাক লাগিয়ে দেবে। মাধুরী বইয়ের পাতা খুলেই দেখবে—'মাধুরী, এ বই যাকে দেওয়া যায় তাকেই দিচ্ছি।'

মাধুরীর অতীত ছবিগুলো আমি একের পর এক সাজিয়ে নিচ্ছি বুকের মধ্যে। মাধুরীর সঙ্গে অফিসেই দেখা আমার। আমাদের টেবিলের কাছাকাছিই সে বসতো। অফিসের যত চিঠি আসতো তার বিবরণ লিখতো একটা ইনওয়ার্ড রেজিস্টারে আমি যার নাম দিয়েছিলাম 'ঘরমুখো বই'।

আমরা একটা টেবিলে বসে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দর গল্প আলোচনা করতাম। অফিসে সবাই জানতো আমার প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক হবার সাধ। দু'একজন রসিকতা করতো, "আধুনিক গল্প বড় কঠিন বিজনেস, ব্রাদার। যদি জাত লেখক হতে চাও তাহলে ওই বেলুড় এবং দক্ষিণেশ্বর কানেকশন কাট-অফ করো।"

আমি তর্ক করতাম না, কিন্তু বলতাম, "এঁদের জীবন থেকে, এঁদের বাণী থেকেও তো গল্প হতে পারে।"

"তা হবে না কেন? নিশ্চই হতে পারে—কিন্তু রামকেষ্ট মার্কা ইস্কুল এবং রিটায়ার্ড বুড়োদের শনিবারের মিটিং ছাড়া আর কোথাও তা পড়া হবে না।"

আমি তর্কের মধ্যে কোনাদিন যেতেই চাইনি, আমি চেয়েছি যতটুকু সময় আছে তার সবটুকু যেন কথাসাহিত্যের সাধনায় নিয়োগ করতে পারি।

মাধুরী, বেলুড় মঠে সেই প্রথম দেখা হওয়ার কথা আজ মনে পড়ছে। আমাকে দেখে তুমি বললে, "আপনি ? এখানে ?"

"এখানে কার না এসে উপায় আছে ?" আমি এখানে রসিকতা করেছিলাম। তারপর বলেছিলাম, "রামকৃষ্ণ শিক্ষায়তনে পড়েছি তো —সেই ছোটবেলা থেকে যাতায়াত। কখনও ইস্কুল ফাঁকি দেবার লোভে, কখনও ভোগ খাবার টানে।"

"আপনারা তো ভীষণ দুষ্টু।"

"দুষ্টু হলে কী হবে ? ঠাকুর তো পরীক্ষায় বসবার আগেই সকলকে পাশের সার্টিফিকেট ইস্যু করে বসে আছেন। ছোটছেলেরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই ঈশ্বরের কাজে লাগে।"

সেদিন বেলুড় মঠ থেকে একসঙ্গে একই বাসে আমরা কলকাতায় ফিরেছিলাম। আমরা পরস্পরকে কখন যেন একটা বিশেষ সম্মান করতে আরম্ভ করেছি।

মাধুরী সেই ছোটবেলা থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত। দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড় তার প্রিয় স্থান, বিবেকানন্দর বাণী তার প্রিয় রচনা। মাধুরীর ধারণা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ বিবেকানন্দর ভক্ত হয়ে উঠবে, মহান সব পুরুষরা রামকৃষ্ণর বাণী প্রচার করে বেড়াবেন এই ভূমণ্ডলে।

মাধুরী জানে আমার রচনায় বিবেকানন্দর চিন্তার ছায়া এসে যায়। এই নির্বীর্য হতাশাসর্বস্ব জাতকে অধঃপতনের অন্ধকার থেকে টেনে আনবার ক্ষমতা একমাত্র ঐ বীর সন্ন্যাসীর মধ্যেই রয়েছে।

মাধুরী আপিসে বন্ধুদের হাতে আমার নিগৃহীত হবার দৃশ্য দেখেছে। আমি তখনও প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক নই। কিন্তু আমার স্বপ্ন রয়েছে, আমি বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথেই মানব-উন্নয়নের বাণী প্রচার করবো। আমার বন্ধুরা বলে, "ওই সেকেলে বস্তাপচা পদ্ধতিতে একালের গল্প লেখক হওয়া যায় না। বিবেকানন্দ যা বলে গিয়েছেন তা মিটিং কা বাত। গল্পে-উপন্যাসে ওসব অচল। তুমি সময়ের অপচয় করছো ব্রাদার।"

মাধুরী ওদের সামনেই আমাকে ইঙ্গিত করেছে, লেখক তার নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে যাবে।

আমি অবশ্যই বিমুগ্ধ হয়েছি। তারপর আমাদের সেই অবস্থা বাংলায় যাকে বলা প্রেমে পড়া।

আমি তখনও একটু বোকাসোকা গোবেচারা মানুষ। ঠাকুর-স্বামীজীর চিন্তার আলোকে সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই আমার জানা নেই। এইসব লেখা আমি মাঝে-মাঝে কাগজে পাঠাই—প্রায়ই ছাপা হয়। প্রেমের আদর্শ আচরণ-সম্বন্ধে আমরা দুজনেই তেমন ওয়াকিবহাল নই—আমরা একসঙ্গে সিনেমায় যাই না, নদীর ধারে হাত ধরে ঘুরে বেড়াই না, রেস্তোরাঁয় পর্দা টেনে দিয়ে কাছাকাছি বসি না। আমরা দু'জনের মধ্যে বই বিনিময় করি, আমরা মাঝে-মাঝে মিশন হলে বক্তৃতা শুনতে যাই। আর দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড় মাঝে-মাঝে আমাদের টানে। আমরা ওখানে গিয়ে শান্তি পাই, যে-আনন্দ অন্য লোকেরা হয়তো সিনেমায় পায়।

মাধুরী জানে আমি লাজুক। অনেক মানুষের সামনে আমার মুখে কথার খই ফোটে না। তার জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই মাধুরীর। তার ধারণা, যারা ঝকমকে কথা বলে তারাই শেষপর্যন্ত আসর জয় করে না। সে আমার লেখার ভক্ত হয়ে উঠেছে। তার ধারণা আমি একদিন আমার প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করবো।

এসব প্রাক পরিণয় প্রেমের রঙিন বুদবুদ নয়। অবশেষে একদিন আমরা বিবাহিত হয়েছি। রেজিষ্ট্রারের অফিস থেকে একটা ট্যাক্সিতে কোনো রেস্তোরাঁয় না ছুটে আমরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। আমার স্ত্রী মাধুরী প্রাণভরে পুজো দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, কী প্রার্থনা জানালে মাধুরী?

আমি আন্দাজ করেছি, আমাদের বিবাহিত জীবনের সাফল্য প্রার্থনা করেছে সে। কিন্তু মাধুরী অশেষ মনোবলের অধিকারিণী। সে বলেছে, "এ-বিয়ে তো এ-জন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের যে-সম্পর্ক তা ঠাকুর তো আশীর্বাদ করবেনই। আমি চেয়েছি তুমি বড় হয়ে ওঠো, তুমি মস্ত লেখক হও। সবাই তোমাকে এক ডাকে চিনুক।"

লেখায় কেমনভাবে সবাইকে জয় করা যায় তা যদি সত্যিই জানা থাকতো! আহা! আমি অবশ্য নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করিনি।

মাধুরীর কোনো দ্বিধা নেই—সে চায় লেখাটা হবে দেশলাই কাঠির মতো, পাঠকের মনের সঙ্গে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠে অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। বেলুড়মঠের কোন বয়োবৃদ্ধ স্বামীজী কবে গোলপার্কের কোন বক্তৃতায় এই মন্তব্য করেছিলেন। মানুষকে জাতে তোলাই হলো লেখকের কাজ—বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী কোন পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, কিন্তু তা মাধুরীর নজর এড়ায়নি।

মানুষের জাত কী ? আমি আমাদের নববিবাহিত জীবনেই মাধুরীকে একদিন প্রশ্ন করেছি। মাধুরী বলেছে, "মানুষ তো ভগবান। সুতরাং দেবতার জাত এবং মানুষের জাত এক ! মানুষ একবার এই ব্যাপারটা বুঝলে তার সমস্ত দীনতা ঘুচে যাবে।"

আমার অফিসে তুষ্টু এবং ফচকে বন্ধুরাও আমাদের দার্শনিক মানসিকতার চাপা ভক্ত—কিন্তু তারা একদিন রসিকতা করেছে, "তোমাদের যা উচ্চ রুচি, তোমাদের যা ঈশ্বরপিপাসা তাতে প্রেম জানাবার স্কোপ পেলে কেমনে ভায়া ? আমরা তো ভয় পেয়েছিলাম, একদিন তোমরা দু'জনেই হয়তো সব মায়াবন্ধন ত্যাগ করে সংসারাশ্রম থেকে দূরে সরে যাবে !"

নবীন বিবাহিত জীবন এক মধুর আনন্দের ঘোরে আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি সংসারাশ্রম থেকে সরে না এলেও অফিসের দৈনন্দিন বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসেছি।

এই স্বাধীনতা আমার কৃতিত্ব নয়—মাধুরীরই দান। কিন্তু মুক্তিমূল্য দিতে হয়েছে মাধুরীকে।

দাসত্ববন্ধন থেকে আমাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নিজের ওপর আমার অতখানি বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু মাধুরীর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। আমাকে লেখার বিপুল স্বাধীনতা সে উপহার দেবে, নিজে চাকরি করে। মাধুরী বলেছে, "লেখা তো শুধু পাতার পর পাতা বোঝাই করা নয়—লেখককে ভাবতে হবে, লেখককে সংগ্রহ করতে হবে, লেখককে বিশ্লেষণ করতে হবে, লেখককে জানতে হবে অন্য কোথায় কী চিন্তা হচ্ছে।" কিন্তু এই স্বাধীনতা তো আমার মতো একজন সামান্য মানুষের পক্ষে চরম বিলাসিতা।

মাধুরী কিছুই শোনেনি, আমাকে অফিসের ঘানি টানা থেকে বের করে দিয়ে নিজে চাকরিতে আরও মন দিয়েছে।

আমার ভাগ্যদেবতা যদি অবশেষে প্রসন্ন হয়ে থাকেন, সাহিত্যের কমলবনে অবশেষে যদি আমার প্রবেশপত্র লাভ হয়ে থাকে, আমি যদি একজন গল্পলেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকি তবে তার সবটুকু কৃতিত্ব মাধুরীর।

ইন্দ্রভূষণ বলেছে, "মাধুরীকে তোমার সাহিত্যজীবনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেই বোধহয় ভাল হতো—কিন্তু কথাটা একটু কটু শোনায়। যারা স্বাধীন তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকা মানায় না।"

লাগসই একটা তুলনার জন্যে যখন ইন্দ্রভূষণ মাথা ঘামাচ্ছিল

মাধুরীর সামনেই তখন আমি 'স্থপতি' শব্দটা প্রস্তাব করেছিলাম। "প্রত্যেক জীবনেরই একটা স্থাপত্য থাকে—এই কাজটা বেশ কঠিন। সব দায়দায়িত্ব এই স্থপতির।"

ইন্দ্রভূষণ রসিক। সে বলেছে, "আর্কিটেকট্ নকসা এঁকে দেয়, আর কনট্রাকটর এসে ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে বাড়ি তৈরি করে। আমাদের মাধুরী হচ্ছে তোমার স্থপতি-কাম-কনট্রাকটর!"

মাধুরী বকুনি দিয়েছে, "স্থপতি নয়, কনট্রাকটর নয়, বাড়ি সুন্দর হলে নাম হয় বাড়ির মালিকের। তাজমহলের স্থপতির নামও তো আমরা জানি না।"

"এখানেও কোনো আপত্তি নেই।" ইন্দ্রভূষণ সরস টীকা সংযোগ করেছে। "এই সাহিত্যিকের মালিকও যে তুমি সে-বিষয়ে কার সন্দেহ আছে?"

মাধুরী বলেছে, "আঃ! ওকে আবার ভাবতে দাও, লিখতে দাও। ওর এখন অনেক দায়িত্ব, কত মানুষ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।"

এইভাবেই চলেছে। মাধুরীর প্রীতি ও দাক্ষিণ্যেই আমার সাহিত্য-জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। এই যে আমি লিখছি এবং এইসব লেখায় সমাজের কিছু উপকার হবে ভেবেই সে সুখী। আমি জনপ্রিয়তার হিমালয়শিখরে আরোহণ করিনি, সাধারণ স্তরে আমার লেখা নিয়ে তেমন কাড়াকাড়ি পড়ে না তার জন্যে অহেতুক উদ্বিগ্ন নয় মাধুরী। সে বলে, "তুমি যে মানুষকে নতুন চিন্তাভাবনার রসদ দিতে পারছো তাতেই আমার আনন্দ, তুমি তো ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছো না যে ভোটে জয়ী হতে হবে।" শ্রদ্ধায় এবং ভালবাসায় আমি বিজয়ী হই এই প্রার্থনা মাধুরীর।

মাধুরী বলে, "ঠাকুর এবং স্বামীজীর চিন্তাগুলো তুমি আরও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখো, ওগুলো তোমার কলমেই আবার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে।"

আমি মাধুরীকে বলেছি, "কোনো চিন্তা নেই। গেরুয়া বসন সন্ন্যাসীদের মিটিংয়ে ভিড়ের কিছু কমতি নেই। বহুলোক দলে-দলে আসে—কত স্পেশাল বাস দিতে হয় উৎসবের ভিড় সামলাবার জন্যে।"

মাধুরী হেসেছে। "ওতো ভক্তের ভিড়। তুমি তো টেনে আনবে তাদের যারা খবর পায়নি কিংবা এখনও সন্দেহ করে দূরে বসে আছে।"

আমি সাধ্যমতো আমার কাজ করে চলেছি। আমার লেখায় মহাপুরুষদের চিন্তাভাবনার ছায়া পড়েছে। সংসারে সবাই যে চোরদায়ে

ধরাপড়ার জন্যে এই বিশ্বসংসারে আসেনি, সবার মধ্যেই যে সম্ভাবনা রয়েছে, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিতেই যে তৃষ্ণার উপশম—এইসব কথাই আমি বলে চলেছিলাম আমার লেখার নানা পন্থায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে।

তারপর কী যে হলো এবার। আমার হঠাৎ যেন মনে হলো আমি ফুরিয়ে আসছি, আমি যেন একই চ্যানেলে অনেকদিন প্রবাহিত হয়েছি। আমার গতিপথ পরিবর্তনের প্রয়োজন।

কেন এমন চিন্তা আসে, কেন মন এমন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে তা আমার অজানা। আমি হঠাৎ কোথায় যেন শুনলাম, সৃষ্টির অপর নামই বৈচিত্র্য। আমি অন্যরকম হতে চাই। আমার থেকে তরুণতর লেখকেরা ইদানীং যে-পথে অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেছেন তা আমারও আয়ত্ত থাকা প্রয়োজন।

তাছাড়া আমি সব সময় গল্প খুঁজে পাই না। আমি যখন নতুন এক পরিবেশে নতুন ঘটনার ফাঁস বারবার খুঁজে বেড়াচ্ছি অথচ ব্যর্থ হচ্ছি ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রভূষণ ওই কাণ্ড করে বসলো। আমাকে একটা ছোট্ট ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে সে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো।

তারপর তো অনেক কিছু ঘটে গেলো। আমি নতুন পথে প্রবাহিত হয়েছি, আমি প্রমাণ দিয়েছি আমি এখনও নবীন প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, অপ্রত্যাশিতভাবে আমি কখন গতিপথ পরিবর্তন করবো তা জানবার জন্যে আমার প্রতিটি লেখার ওপর সদাসতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন।

আমি এতোদিন ধরে যে পথে ছিলাম তার থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছি। পুনরাবৃত্তি যে মহৎ শিল্পের ধর্ম নয় তা এবার বিশ্ব সংসারকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। আজ আমার সেই রচনা গ্রন্থাকারে বিস্ফোরিত হতে চলেছে—আমার বইয়ের প্রথম কপি এসে গিয়েছে। আমি তার মধ্যে মাধুরীর জন্য মধুর এক উৎসর্গপত্র রচনা করে রেখেছি।

মাধুরী এতোক্ষণে দক্ষিণেশ্বর সেরে নিশ্চয় অফিসে ফিরে গিয়েছে। বেচারা আমার জন্যে কত কষ্ট করে। আমার লেখা থেকে কিছু উপার্জন হয়, আমি সেই অর্থ মাধুরীর হাতেই সংসারের জন্যে তুলে দিই। কিন্তু তার মধ্যে যে অনিশ্চয়তার কাঁকর মেশানো আছে তা মাধুরী পরম যত্নে বেছে দূরে ফেলে দিয়েছে। মাধুরী প্রতিদিন মানুষের এই জঙ্গল ঠেলে অফিসে যায় অর্থোপার্জনের জন্য, আর আমি বাড়িতে বসে থাকি, বই পড়ি, আকাশ পাতাল চিন্তা করি। মাধুরীর ত্যাগেই একটা মানুষ লেখক হতে পারলো—অনেকক্ষণ ধরে চিন্তাসাগরে ডুব দিতে না পারলে, বহুক্ষণ ধরে কল্পনার আকাশে পাখা মেলে উড়তে না-পারলে আজকাল গল্প-

উপন্যাসের লেখক হওয়া যায় না। যেমন বিধাতা তেমন তো হবে সৃষ্টি, কোন এক সন্ন্যাসী একবার মাধুরীকে বলেছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির মান দিয়েই সৃষ্টিকর্তাকে বিচারের রেওয়াজ চলে আসছে বিশ্বভুবনে এবং সাহিত্যে।

এই সৃষ্টির আনন্দবেদনাতেই আমি বুঁদ হয়ে ছিলাম। মাধুরী জানে আমার আর কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

মাধুরী ফিরে এসেছে যথাসময়ে। মাধুরী বলছে, "অফিসে আজ তোমাকে নিয়ে খুব উত্তেজনা।"

আমি বুঝছি, ইন্দ্রভূষণ আজ আমাকে নিয়ে আবার হৈ-চৈ বাধিয়েছে। সে বলেছে, "জাত লেখকরা সত্যি বিধাতার মতো। তারা কোনো কিছু না-দেখেই নিজের চেয়ারে বসে বসেই অসামান্য সৃষ্টি করতে পারে।"

এই সব বিবরণ শুনছি, আর আমার বুকের মধ্যে অস্বস্তি একটু-একটু করে বাড়ছে। ইন্দ্রভূষণের ওপর রাগ বাড়ছে আমার। "কী বলতে চায় সে? লেখক একেবারে ভগবান হয়ে গিয়েছে!"

মাধুরী হাসছে। ইন্দ্রভূষণের বক্তব্যে কোনো অত্যুক্তি সে লক্ষ্য করছে না। "তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলে আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না।"

"কী বিশ্বাস করতে না, মাধুরী?" আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

মাধুরী আশা করছে, অনেকদিন পরে আজ আমার মধ্যে কোনো উত্তেজনা থাকবে না। গল্পকে ভূমিষ্ঠ করার সমস্ত যন্ত্রণা শেষ হয়েছে। আজ আমার বই বেরিয়েছে। নতুন সৃষ্টির নেশায় আবার বুঁদ হবার আগে আজ আমি নবজাতকের মাতৃত্বে উল্লসিত হয়ে উঠবো।

মাধুরী আমার লেখা পড়ে ফেলেছে। আমার তৃপ্ত পাঠকরা বিশেষ সংখ্যা থেকে রসাস্বাদন করে কী বলছে তাও তার কানে এসেছে।

মাধুরী ও আমি মশারির নিশ্চিন্ত প্রশ্রয়ে নিজেদের স্বেচ্ছাবন্দী করেছি। আজ আমাকে নানা-উপচারে খাওয়াবার চেষ্টা করেছে সে।

মাধুরী বলছে, "আর চিন্তা কীসের? তুমি তো নিজেকে পাল্টাতে চেয়েছিলে। তোমার পরিবর্তন তো পাঠকেরা লক্ষ্য করেছে। তারা তো বলছে—ওই মেয়েটা—" নামটা মনে করতে পারছে না মাধুরী। আমি হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেললাম—তনিমা। নামটা ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিলো।

কিন্তু মাধুরীই পরম স্নেহে আমাকে রক্ষে করলো। "তনিমা হতে যাবে কোন দুঃখে? গরিমা—গরিমা লাহিড়ি। উঃ পারোও বটে! যাকে নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত বুঁদ হয়ে রইলে, যার সম্বন্ধে পাতার পর পাতা অত বর্ণনা করলে, তার নামই ভুলে গেলে। লেখকরা বড্ড ভুলো হয়।"

আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছি। আর মাধুরী বলছে, "যারা পড়েছে তারা সবাই বলছে গরিমা খুব লাইফ-লাইক হয়েছে!"

লাইফ-লাইক? কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। "লাইফ-লাইক বলতে লোকে আজকাল কী বোঝে, মাধুরী?"

"জীবন্ত! ঠিক যেন জীবন থেকে উঠে এসেছে। ঠিক যেন রিপন লেনে খুঁজে-খুঁজে বাড়িটার সন্ধান পেলে এবং সেখানকার কলিং বেল টিপলে গরিমা লাহিড়ি নামে একজন নোংরা মেয়ে এসে সত্যিই দরজা খুলে দেবে!"

এর নামই তো মোহজাল—কল্পনার রঙিন তুলিতে একটা অবাস্তব রমণী হঠাৎ রক্তমাংসের মানবী হয়ে ওঠে। "মাধুরী, তুমি তো সৃষ্টির এইসব গোপন রহস্যের কথা জানো—একজন লেখকের সৃষ্টি-যন্ত্রণার সঙ্গে তোমার তো অনেকদিনের পরিচয়।"

মাধুরী আমার আরও কাছে সরে আসছে। "তুমি কী করে এতো তাড়াতাড়ি এইসব চরিত্রের নাম ভুলে গিয়ে গরিমাকে তনিমা করে তোলো?"

"মাধুরী, এ তো তোমার বোঝা উচিত ছিল—গরিমা লাহিড়িকে যে কোনো নাম দিয়ে আমি এই পৃথিবীতে আনতে পারতাম।"

"তনিমা নামটা মোটেই মানাতো না। মনে হতো দেহসর্বস্ব একটা নোংরা মেয়ের নরককুণ্ড ঘাঁটবার জন্যে তুমি এবার কলম ধরেছো। তুমিও ব্যবসাদার হয়ে উঠছো। পাঠককে ভক্ত না ভেবে তাকে খরিদ্দার হিসেবে দেখতে শিখেছো। খরিদ্দারই ভগবান—এই বৈশ্য মনোবৃত্তি তোমার মধ্যেও ঢুকে গিয়েছে।

বেশ তো! বেশ সুন্দর কথা বলছে আমার স্ত্রী মাধুরী। সাহিত্য নিয়ে কতবার এই শয্যার আশ্রয়েই আমরা দু'জনে কথা বলেছি।

মাধুরী বলছে, "গরিমার গল্পর শুরু থেকে লোকে মেয়েটা সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করছে। বলছে, ওর নাকি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে। মানুষটা নাকি রক্তমাংসের হয়ে উঠেছে। আমি মনে-মনে খুব হেসেছি—যে চরিত্রটা আউট অফ নাথিং আমার সামনেই রাত জেগে-জেগে তৈরি হলো তা যদি সকলের কাছে সত্যিই জীবন্ত মনে হয় তাহলে

মজা তো হবেই।”

“তুমি কিছু বলছো না কেন?” অভিযোগ করছে আমার স্ত্রী। “তোমার বই তো লেখা হয়ে গিয়েছে—আমি তো তোমাকে জানি, ঐ গরিমা সম্বন্ধে এখন থেকে তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। তুমি ইতিমধ্যেই মেয়েটার নাম গোলমাল করে ফেলে কোন এক তনিমাকে টানছো।”

আমি অস্বস্তি এড়ানোর জন্যে বলতে চাই, “তুমি বইটা কেমন দেখলে?”

মাধুরী আমার আরও কাছে সরে আসছে। “বউ বলে একটা জিনিস যে আছে তাও তো লেখার সময় মনে থাকে না তোমার।” মাধুরী আমাকে সব দিক দিয়ে লজ্জা দিতে চায়।

আমি যে বইটার চরিত্রগুলো সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি তা বুঝতে পারছে বোধহয় মাধুরী।

মাধুরী এবার বলছে, “তোমার লেখাটা পড়তে শুরু করে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। একটা সস্তা মেয়ের নোংরা কথাগুলোই তুমি অন্য সবার মতো লিখবে ভাবতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। ওই যে, মেয়েটা যেখানে বলছে, তার পেশার জন্যে তার কোনো অভিযোগ নেই, দুঃখ নেই। সে মানুষকে আনন্দ দেবার কাজেই নিযুক্ত রয়েছে, ওইখানে গরিমার সব অপরাধ ক্ষমা হয়ে গেলো।”

আমার অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে। মাধুরী বলছে, “একটা সস্তা মেয়ের মুখে এমন দামী কথা কে শুনেছে? অথচ লেকচার নয়, ওর সমস্ত জীবনের জ্বালা এবং যন্ত্রণা থেকেই কথাগুলো বেরিয়ে আসছে, মানুষকে ক্ষমা করার প্রচেষ্টায়।”

মাধুরী কী সুন্দর বিশ্লেষণ করছে, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, ঐ সস্তা মেয়েটা যখন ওই কথাগুলো নায়ককে বলেছে তখন মাধুরীও বোধহয় সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিল।

মাধুরী আমাকে গভীরভাবে কাছে টানছে। আমার বুকের মধ্যে হারিয়ে যাবার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। সে বলছে, “যতই তুমি মেয়েটার দেহবর্ণনা দিচ্ছিলে আমার ততই ভয় হচ্ছিল দেহসর্বস্ব গল্প লেখার নেশায় পড়লে নাকি তুমি? দেহবিলাসিনীর দেহটা নিয়ে তুমি শেষপর্যন্ত কী করবে?”

“তারপর?” গল্পলেখার গল্প শেষ করে আমি নিজেই যেন কোনো গল্পপড়ার গল্প শুনতে অধীর হয়ে উঠেছি।

মাধুরী বলছে, "আমি তখন থেকেই চিন্তা করছি, এবার আমার লেখক-স্বামীর অগ্নিপরীক্ষা। এই গল্পটা কোথায় সে নিয়ে যাবে? একবার মনে হলো, তোমাকে ধরে ফেলেছি!"

ধরে ফেলা! নিরীহ নিরাপদ শব্দ, কিন্তু আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

যে আমাকে ধরবে সে তার শান্ত স্নিগ্ধ হাতটা আমার চুলের মধ্যে দিয়ে একটু একটু নখের আঘাত দিচ্ছে। সে বলছে, "আমি জানি, আমার স্বামী কখনও এমন গল্প লিখতে পারে না যার মধ্যে একটা নোংরা মেয়ের নোংরা শরীর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আমার হঠাৎ মনে হলো, কদিন ধরে তোমাকে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার কবিতাটা পড়তে দেখেছি। তোমার টেবিলে বোধিসত্ত্বাবদানের কপিটাও পড়ে ছিল। আমি ভাবলাম, আমি ঠিক তোমাকে ধরে ফেলেছি।"

আবার 'ধরে ফেলা' কেন? এ-যেন লুকোচুরি খেলা চলেছে। প্রতিবারই আমি ধরা পড়ার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি।

মাধুরী বেশ শান্তভাবে কথা বলছে। সারাজীবন ধরে ঠাকুর-স্বামীজীর কৃপাভিক্ষা করে ওর ওইটুকু হয়েছে—ও স্থৈর্য হারায় না, উত্তেজনার আগুন ওকে দগ্ধ করে না।

"মাধুরী, গল্পটা সম্পর্কে তোমার বিশ্লেষণ চালিয়ে যাও। আমার খারাপ লাগছে না। জানো মাধুরী, যারা লেখে তারাও অনেক সময় তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না।"

মাধুরী বলে উঠলো, "তুমি তো এই বইয়ে একটা লাইন লিখেছো—স্রষ্টা জানেন সবই কিন্তু তার স্মরণে থাকে না!"

"উঃ! মাধুরী তুমি কি প্রতিটা লাইন তন্ন তন্ন করে পড়েছো!"

"গোয়েন্দারা যেমন করে সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে—আসামী ধরবার জন্যে!"

আবার ধরা পড়া! মাধুরী কেন বোঝে না, লেখককে ধরে ফেলাটাই পাঠক-পাঠিকার একমাত্র কাজ নয়। বরং তাকে বিশ্বাস করে শেষ পর্যন্ত যা হতে চলেছে তার জন্যে প্রস্তুত হওয়াই ভাল—তাতে রসের পূর্ণতা আস্বাদন করা যায়।

আবার গল্পতেই ফিরে আসছে মাধুরী। "আমি একবার ভাবলাম, ওই অনিন্দিত চৌধুরী, যদি আমার স্বামী হতো!"

আমার শিরদাঁড়ার মধ্যে কী যেন শিরশির করে উঠলো। "গল্পের নায়ককে তুমি স্বামী হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করলে!"

"বারে! তুমিই তো লিখেছিলে, অন্য মানুষের চরিত্র নিয়ে গল্প লেখা হয়, কিন্তু অপরের গল্পটাকে নিজের গল্প না-করা পর্যন্ত পাঠকের স্বস্তি হয় না।"

মাধুরী তারপর বলেছে, "আমি ভাবলাম, গল্পটা শেষ পর্যন্ত মহৎ কোনো উপলব্ধির শিখরে উঠে যাবে। যেমন নটী বাসবদত্তা চাইলো সুদেহী তরুণকে সুখশয়নে নিমন্ত্রণ করতে, আর তরুণ উপগুপ্ত বললেন সময় হলেই যাবো।"

একটু থামলো মাধুরী। তারপর নিজেই বললো, "ভেবেছিলাম হয়তো ভীষণ কোনো বিপর্যয়ে পড়বে এই গরিমা। যখন তার দেহ-গরিমা সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে, যখন তার গলিত শরীরের দিকে তাকাবার কেউ থাকবে না, তখন চরম সেই দুঃখের মুহূর্তে অনিন্দিত চৌধুরী নিজেই ফিরে আসবে গভীর স্নেহে এবং গরিমাকে গ্লানিমুক্ত করে সস্নেহে বলবে, আজি রজনীতে হয়েছে সময়, আমি এসেছি গরিমা।"

চমৎকার! মন্দ বলেনি মাধুরী। এই পরিণতির ইঙ্গিত আমার মাথায় আসেনি। বোধিসত্ত্বাবদানে যে বাসবদত্তার বর্ণনা আছে রাজ-নির্দেশে তার আকর্ষণীয় শরীর ক্ষতবিক্ষত। তার স্তন হস্তপদ নিতম্ব বিচ্ছিন্ন, দেহে পূতিগন্ধ। সে বড় কঠিন কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ যা সৌন্দর্যের প্রয়োজনে নিজের কবিতায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছেন। বাসবদত্তা কেন এই নির্মম শাস্তি পেয়েছে তাও চেপে গিয়েছেন।

মাধুরী বলছে, "আমি ভাবলাম, তুমিও গরিমাকে পরিচ্ছন্ন করে নেবে। হয়তো কোনো কঠিন অসুখে পড়েছে সে। কিংবা জটিল কোনো বিপদে। তাকে কেউ দেখবার নেই।"

"মাধুরী, তুমি যা বলছো তার বিপদ অনেক। আমি কোনো সন্ন্যাসীকে টেনে আনতে চাইনি রিপন লেনের ওই গলিতে। তাতে কোন সন্ন্যাসীও স্বস্তিবোধ করবেন না, আর···"

আমি এবার কথা বন্ধ করে দিয়েছি।

"কী হলো, সন্ন্যাসীর কথা তুলেও তুললে না?"

"এ যুগের মানুষ সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে, মাধুরী। দেখবে একটা লাইন আছে, অবিশ্বাস করে নরকযন্ত্রণা ভোগে আপত্তি নেই মানুষের, তবু বিশ্বাস করে স্বর্গসুখ নেবে না সে।"

মাধুরীর মনে পড়ে গিয়েছে: "তুমি একেই যুগধর্ম বলেছো। তুমি বলছো, অবিশ্বাসীরা সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করবে না—তারা প্রত্যাশা করবে, তুমি দেখাও দেবতারও দুর্বলতা আছে।"

মাধুরী আমার কথার মর্ম বুঝেছে। "তুমি ঠিকই বলেছ হয়তো। দেবতাকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে আনার মধ্যেও অনেকে আনন্দ পায়।"

তবু মাধুরীর অগাধ বিশ্বাস তার লেখক স্বামীর ওপর। "তুমি বলতে চাইছো স্রষ্টা হয়েও তোমাদের যা ইচ্ছে সেইমতো চরিত্রগুলোকে গড়ে তুলবার স্বাধীনতা সবসময় পাওয়া যায় না।"

আমি নীরব থেকেই আমাদের বক্তব্যটা সরল করতে ব্যস্ত। "আজকাল বিধাতার হাত-পা বাঁধা, মানুষ তো কোন ছার।"

কিন্তু মন ভরছে না মাধুরীর। এই গরিমাকে যদি কোনো বিবর থেকে তুলে আনতে পারতো অনিন্দিত তা হলে ভীষণ ভাল লাগতো তার। সন্ন্যাসীর গায়ে কালি লাগবার আশঙ্কা? মাধুরী বলছে, "লেখক চাইলে সব বাধা তিনি দূর করে দিতে পারেন।"

মাধুরী তার হাতখানা আমার বুকের ওপর রেখেছে। এই হাতটা বুক থেকে সরে থাকলেই যেন ভাল হতো। মানুষের হাত অনেকসময় স্টেথস্কোপের মতো বুকের খবরাখবর নেয়।

সন্ন্যাসীকে নিয়ে শুধু-শুধু ভয় তোমার। ঠাকুর কি থিয়েটারের মেয়েদের আশীর্বাদ করেননি? বিবেকানন্দ কি পতিতারমণীর গান শোনেননি?" মনে একটুও সংশয় নেই। গভীর বিশ্বাস থেকে মানুষ এমন সহজ হতে পারে।

"আমি অতবড় লেখক নই, মাধুরী। মানুষ সন্দেহ করে বসলে আধুনিক লেখকের কিছুই করার থাকে না। গল্প-উপন্যাসে বিশ্বাসের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। বই কিনবে, পড়বে, যত সময় চাইবে তত সময় দেবে, কিন্তু পাঠক কিছুতেই বিশ্বাসের চাবিকাঠিটা নিজের হাতছাড়া করবে না। পাঠকের নির্ভরতা পায়না বলেই তো অনেকের গল্পের এই দুর্দশা—কবিরা সেদিকে অনেক ভাগ্যবান। মানুষের যখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় তখন সে দক্ষিণেশ্বরে যায়, বেলুড় যায়, কবিতা পাঠ করে, গান শোনে। একবারও সে ভুল করে একালের গল্প-লেখককে সুযোগ দেয় না।"

মাধুরী ওর হাতটাকে স্টেথসকোপের মতো আমার বুকের এক এক অংশে স্থাপন করছে। "তুমি এই বইতেই লাইনগুলো চমৎকার ব্যবহার করেছো, স্বীকার করছি। পাঠকরা খুব লজ্জা পাবে। কিন্তু তুমি চুপি-চুপি নিজের কথাটা সেরে ফেলেছো। সেইজন্যেই তো তোমাকে বাহবা দিই। মিশনের মহারাজকে যখন তোমার দেওয়া বইটার প্রথম কপি পাঠাবো তখন তিনিও তোমার ওপর খুশী হবেন, আশীর্বাদ করবেন।"

"কী সর্বনাশ! রিপন লেনের গরিমা লাহিড়ির বাড়ি থেকে আবার

মঠ মিশন কেন? আবার আশীর্বাদ কেন? আশীর্বাদও অত কম দামে পাওয়া গেলে তার কোনো মূল্য থাকবে না। মহারাজ যদি মন দিয়ে পড়েন তাহলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। ওঁরা বহুল প্রচারের উন্মাদনায় ভগবানকে গ্র্যাণ্ড ক্লিয়ারেন্স সেলে তুলেছেন এমন একটা কথা কী-ভাবে লিখে ফেলেছি।

"ওটা তুমি বলোনি। তোমার চরিত্র অনিন্দিত চৌধুরী বলেছে। চরিত্রদের সব চিন্তার জন্য লেখক দায়ী নয়।" মাধুরী আমাকে শান্ত করছে। মাধুরী সত্যিই সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করে, না হলে একজন লেখকের বোঝা এমনভাবে এতবছর ধরে বয়ে বেড়ায়?

মাধুরী ঘুরে ফিরে আবার ওই অনিন্দিত চরিত্রর কথায় চলে আসছে। অথচ ওকে আমি একটুও গুরুত্ব দিতে চাইছি না। "লোকটা স্রেফ দর্শকমাত্র। কোনো মহৎ কাজ সে করেনি। নিজের সাধনায় কোনো মহৎ উপলব্ধির দ্বার সে খুলে দেয়নি—পাঠকের গাইডের কাজ করেছে সে। তাদের চুপিচুপি গরিমার শরীরের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছে। তার দেহ অনাবরণের সুযোগ করে দিয়েছে সে, এই পর্যন্ত। এই গাইড হওয়া ছাড়া কোনো কাজ নেই তার—যা কিছু দায়িত্ব সব গরিমার ওপর।"

মাধুরী বেশ মজা পাচ্ছে। "তুমিই তো বলেছো ছাপার অক্ষরে একবার প্রকাশিত হলে চরিত্রগুলো সম্বন্ধে লেখকের কোনো দায়িত্ব থাকে না। তারা যা তা তারাই প্রমাণ করে দেয়।"

মাধুরী ভুল করছে। আজকাল চরিত্রদের সম্বন্ধে লেখকের মতামত কি তা জানবার রেওয়াজ হয়েছে বিদেশে এবং এখানেও।

"বেশ বাবা বেশ। তুমি যা বলছো তা লিখে রেখো ডায়রিতে। রবিঠাকুরের মতো যখন তোমার বইয়ের গ্রন্থপরিচিতি বেরুবে তখন গ্রন্থ-সম্পাদকের কাজে লেগে যাবে। যদি কলেজের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান হয় তাহলে নোটবুক-রচয়িতাদেরও খুব উপকার হবে।"

মাধুরী ওই যে বুকের ওপর থেকে হাতটা সরাচ্ছে না, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। যেসব মানুষ সারাজীবন ঠাকুর-স্বামীজীর ওপর নির্ভর করে আছে তাদের স্পর্শকে কেমন যেন ভয় হয় আমার।

মাধুরী আজ ভীষণ আনন্দ পেয়েছে। ও বলছে, "আমি তো গোড়া থেকেই ভেবে নিয়েছি, ওই অনিন্দিত চৌধুরী যদি আমার স্বামী হয় তাহলে কী হয়?"

"কী ভয়ঙ্কর কথা!" আমি হাল্কা হবার আপ্রাণ চেষ্টা করি। "একটা অচেনা-অজানা লোককে তুমি হঠাৎ স্বামীর আসনে বসিয়ে

দিলে। আজকালকার চরিত্রদের বিশ্বাস আছে।"

মাধুরী ওর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো এবার ইসিজির বোতামের মতো আমার বুকের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

এবার মাধুরী বলছে, "আমার ভীষণ চিন্তা বাড়ছিল। আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর আমি দেখলাম তুমিই বিজয়ী হয়েছো। গরিমার সুন্দর অবতরণ হলেও, অনিন্দিত নিজেকে অধঃপতিত করেনি, সে তার শরীরের পবিত্রতা বিসর্জন দেয়নি। এমন সুন্দর ভাবে ব্যাপারটা হয়েছে যে কারও মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি, শেষ মুহূর্তে সবাই গরিমার উপলব্ধি নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে কেউ জানতে চাইছে না গরিমার ও অনিন্দিতর দেহসম্পর্কের কী হলো ?"

মাধুরী এবার আমার হাতটা খুঁজছে। আমার ডান হাতটা টিপে-টিপে সে দেখছে এই আঙুলগুলোই কেমন দক্ষভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অনিন্দিতকে শেষ পর্যন্ত অধঃপতনের ঊর্ধ্বে রেখেছে।

মাধুরী বলছে, "আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, যদি দেখি তোমার নায়ক অনিন্দিতও দেহসর্বস্ব হয়ে উঠছে তাহলে বইটার নাম পাল্টে দেবো। নাম হবে '—গরিমা ও একজন গরিলা'।"

আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছি। নাম পাল্টানো ছাড়া মাধুরী আর কী করতো জানবার জন্যে আমি চঞ্চল হয়ে উঠছি।

মাধুরী বললো, "আমি কিছুতেই তোমার ওই উৎসর্গ নিতাম না। বলতাম, অন্য যাকে খুশি তুমি বই উৎসর্গ করো, আমাকে নয়। এখন কিন্তু আমার কোনো দুঃখ নেই। কাল সকালেই আমি মিশনে গিয়ে মহারাজের পায়ের কাছে বইটা রেখে আসবো।"

আমি বলতে যাচ্ছি, "করকমলে অর্পণ করো, হাজার হোক স্বামীজীর নৈবেদ্য কারও শ্রীচরণে রাখা যায় না।"

ঠিক সেই সময় ধড়াস করে আওয়াজ হলো। কী সর্বনাশ, একটা বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার লেখার টেবিলের ছবিগুলোকে আবার মেঝেয় ফেলে দিয়েছে। ঝনঝন করে আওয়াজ। একবার সেবারে কাঁচ ভেঙেছিল, মাধুরী পরের দিনই তা পাল্টে নিয়ে এসেছিল দোকান থেকে। আবার সেই একই কাণ্ড।

আমি ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। কাঁচগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে অধঃপতিত ঠাকুর, শ্রীমা এবং স্বামীজীকে আবার টেবিলে প্রমোশন দিয়েছি। ওঁরা নির্বিকার—পতন ও উত্থানে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই তাঁদের। কোথায় কোন অদৃশ্যলোকে যে মহাশক্তির মেন সুইচ রয়েছে তাঁর সঙ্গেই

যেন এই দু'জন ভদ্রলোক এবং একজন মহিলা চিরন্তন যোগাযোগ রক্ষার অপার আনন্দে সমাধিস্থ হয়ে আছেন।

বেড়ালটাকে আমি একটুও বকতে পারছি না। ওটাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার মতো শক্তিও যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেড়ালটার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবো তাই ভাবছি, আর আমার বউ মাধুরী ওখান থেকে বলছে, "যেন রক্তারক্তি না হয়, খুব সাবধান।"

অবশ্যই, জীবনে সব ব্যাপারে সব সময় সাবধানতার প্রয়োজন। কিন্তু সে-কথা এই রাতদুপুরে আমাকে এই ভাবে শুনিয়ে কী লাভ?

ছবি তিনটে মেঝে থেকে উদ্ধারের পর, ভাঙা কাঁচ মুক্ত করে, আমার টেবিলে বসে তিন মহাপুরুষের সেবাযত্ন করছি। আমি সেইসঙ্গে গরিমার কথাও ভাবছি। ঈশ্বরের কৃপাধন্য মানবমানবীগণ, কাল আমার স্ত্রী মাধুরী নিজে আপনাদের প্রিয় উত্তরসাধকের হাতে গরিমা এবং অনিন্দিতকে অর্পণ করে আসবে।

ঠাকুর, কেন আপনি এইভাবে আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করছেন? আপনার চোখে এমন এক মাদকতা আছে যা মানুষকে প্রথমে অবশ এবং পরে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। আপনি দয়া করে আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর বরং একটু নজর দিন—সারা জীবন ধরে মিসেসের প্রতি প্রাথমিক কর্তব্যগুলি না করেও আপনি পরমহংস লেভেলে প্রমোশন পেলেন। সহস্র বঞ্চনা সত্ত্বেও আপনার বউ আপনাকে মাথায় করে রাখলেন বলেই আপনার বদনাম রটলো না, কোনো হাঙ্গামাও আপনাকে সহ্য করতে হলো না।

মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস জি ডি চ্যাটার্জি, তাঁদের ভক্ত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিস্টার এন এন দত্ত সহ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। প্লিজ, আপনারা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন, আপনাদের চোখগুলো বিখ্যাত কোম্পানির টর্চলাইটের মতো, মানুষকে কিছুতেই অন্ধকারে থাকতে দেয় না।

আমি এই মুহূর্তে নিঃসঙ্গতা প্রার্থনা করছি ঠাকুর। আমার অনুরোধ রাখুন, ওইভাবে আমার বুকের ভিতরটা এক্সরে করবেন না।

ঐ দেখুন, ওই বিছানায় শুয়ে আছে আমার সহধর্মিণী—জীবনের কোনো আনন্দে কোনো দুঃখে যাকে আমি অতিক্রম করবো না বলে চুক্তিবদ্ধ। সে আমার নায়ক অনিন্দিত চৌধুরীকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে। একজন আনন্দসঙ্গিনীর দেহ আবিষ্কার করতে গিয়ে তার

কাছে নিখিলবিশ্বের বাণী শুনেছে সে। তার মনের পরিচয় পেয়ে নিজের দেহকে কলুষিত করেনি। সে শুনেছে, ক্ষুদ্রতমের চেয়ে ক্ষুদ্র, নিম্নতমের চেয়ে নিম্ন জীবেরও মহৎ ভাবনার অধিকার আছে। গরিমা তাকে চরম নাটকীয় মুহূর্তে বলেছে—সেক্ষুদ্র কিন্তু তারও একটা ভূমিকা আছে। সে মানুষকে আনন্দ দেয়। জগতের আনন্দযজ্ঞে যারা অংশ নেয় তারা কোন দুঃখে ছোট হতে যাবে? সুদূর আকাশের নক্ষত্ররা তো পরমহংস থেকে পতিতা সকলের জন্যেই আলো পাঠায়। কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি, জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান—বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

আমি আমার উপন্যাসের চরমতম মুহূর্তে নিজের শব্দসঞ্চয়ের পরও নির্ভর না করে সবিস্ময়ে বাণীর সেই বরপুত্রকেও স্মরণ করেছি যিনি চিৎপুরের সরু গলিতে জন্মেও সর্ব খর্বতার উর্ধ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আমি পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছি, আমার সাধ্বী স্ত্রী আমার সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী আমাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে, আমি আমার চরিত্রকে কলুষিত হতে দিইনি।

কিন্তু সেদিন অপরাহ্ণে রিপন লেনের সেই ভাঙাবাড়িটায় নির্জন কক্ষে ঠিক তা ঘটেনি। আমি আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে, শেষ মুহূর্তে তনিমার সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার বাসনায়, তার দেহ ঐশ্বর্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নিজেকে কলুষিত করেছি। যা কেবল একজনকেই দেওয়া যায় তা উচ্ছিষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি যখন সব বুঝে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত ঠিক সেই সময় আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন, নির্জনে নগ্ন তনিমার মুখে শেষ কথাগুলো শুনেছি। সে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে না, তার কোনো লজ্জা নেই, গ্লানি নেই, সে নাকি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার কাজেই লিপ্ত রয়েছে।

আমি শেষ মুহূর্তে, শেষ ঘটনাটুকু সাবধানে গল্প থেকে মুছে ফেলেছি। আমি কোথাও অধঃপতনের কোনো ইতিহাস রেখে যাইনি।

"কী হলো? তুমি কীআবার লিখতে বসলে?" মাধুরী আমাকে মশারির মধ্য থেকে ডাকছে।

"মাধুরী, আমার মনে হচ্ছে, লেখার শেষটায় কিছু ভুল, কিছু মিথ্যা থেকে যাচ্ছে। আমি যদি আর একবার শেষটা লিখে ফেলার চেষ্টা করি কেমন হয়।"

মাধুরী আজ অবুঝ! সে কোনো কথা শুনবে না। সে এখনই আমাকে চায়।

আমি হুকুমের চাকরের মতো মশারির বাধা পেরিয়ে বিছানায় চলে এসেছি।

"গল্পটা নিয়ে তুমি আবার কী ভাবছো? ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। বই বেরিয়ে গিয়েছে।" মাধুরী অভিযোগ করছে।

"মাধুরী, কত লেখক কতবার গল্পের পরিণতি পালটায়। যদি অনিন্দিত ঐ গরিমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতো তাহলে কেমন হতো?"

"খুব খারাপ হতো। লোকটার সম্বন্ধে আমার এক ফোঁটা ভালবাসা থাকতো না। আমি ওর স্ত্রী হলে বাড়ি থেকে সেই যে কোথাও চলে যেতাম আর ফিরতাম না। কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে, এখন ওসব ভেবে কী লাভ? অনিন্দিতকে তুমি তো অধঃপতিত হতে দাওনি।" এই বলে অনেকদিন পরে মাধুরী আমাকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছে। "তোমার এই লেখাটা আমার সমস্ত কষ্ট শোধ করে আমার সব স্বপ্ন সফল করে দিয়েছে।" বলে সে তার নিষ্পাপ শরীর নিয়ে আমার আরও কাছে সরে এসেছে।

আর আমি নিরুপায় হয়ে মাধুরীকে অসম্মান করলেও, নিজের কাছে ভীষণ ছোট হয়ে যাচ্ছি মনে হলো। আমি ভাবলুম, আমার উচিত এই বিছানা থেকে সরে গিয়ে ওই মেঝেতে স্থান করে নেওয়া।

কিন্তু আমার ভীষণ ভয় হলো। আমি মাধুরীকে কিছুতেই হারাতে পারব না। আমি শুধু বললাম, "তুমি এখনই বইটা মিশনে মহারাজের হাতে দিয়ে এসো না। আমি ওর শেষটা আর একবার লিখে দেখি, তখন তুমি বেলুড়ে যেও।"

মাধুরী বেচারা বুঝলো না। সে বললো, "যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। তুমি বরং আর একটা বই লিখে ওই মেয়েটাকে উদ্ধারের চেষ্টা করো।"

"তুমি আমার সোনা। তুমি আমার গর্ব। ঠাকুর আমাকে দামী জিনিস দিয়েছেন," এইসব বলে মাধুরী আমাকে আদর করতে লাগলো, আর আমি নিরুপায় হয়ে আমার মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলাম।

তারপর বেশিদিন কাটেনি। ঠাকুরের মনে কী ছিল কে জানে। মাত্র তিনদিনের অসুখে মাধুরী আমাকে ছেড়ে চিরদিনের জন্যে চলে গিয়েছে।

আমি তারপর থেকে তীব্র অনুশোচনার জ্বালায় ভুগেছি। আমি মাধুরীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকবার আমার অন্যায়ের কথা বলেছি,

কিন্তু মাধুরী সেসব শুনতে পেয়েছে এমন কোনো ইঙ্গিতআমি পাইনি।

আমি ভেবেছিলুম, বইটা আবার লিখবো এবং কোনো কিছুই চেপে রাখবো না। সেই অনুযায়ী প্রকাশককে লিখিত নির্দেশও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—আমার কাছ থেকে নতুন পাণ্ডুলিপি না-পাওয়া পর্যন্ত যেন আর ছাপানো না হয়।

আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই লিখতে সফল হইনি। এবার আমি শেষ চেষ্টা করবো, মাধুরী। তোমার ছবিটা সামনে রেখে, তোমাকে সব কিছু বলে, তোমার পরামর্শ মতো আমি বইটা আবার নতুন করে লিখবো। যতক্ষণ না আমি লিখতে পারছি ততক্ষণ এই বই আর ছাপানো হবে না, এই আমার নির্দেশ।

মাধুরী, তোমার কথা মতো আমি শ্রীরামকৃষ্ণচরণেই আশ্রয় চাইবো। নিত্যদিনের তুচ্ছতায় সময় ব্যয় না করে, আমি ওঁদের কথাই বলে বেড়াবো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান নিজেই বিরাজ করছেন, মন্দির পরিষ্কার রাখো, ভাবনা কিছু নেই।

মনজঙ্গল

এবার আমার ছোটবেলার বন্ধু রাধাগোবিন্দ শিকদারের গল্প। ছোট-বেলার বন্ধুরাই প্রিয়বন্ধু হয়, রাধাগোবিন্দ সেই প্রিয়তমদের একজন।

রাধাগোবিন্দর এই গল্পের সঙ্গে একসময় আমার বিশেষ পরিচিত, ফলিত মনোবিজ্ঞানের খ্যাতনামা গবেষক ও চিকিৎসক ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জি যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়বেন তা শুরুতেই বলে রাখা ভাল। আর আছে আমার কলেজ-বান্ধবী সুহাসিনী। কুমারী বয়সে সুহাসিনী দাশগুপ্ত নামে সে অনেক সহপাঠী পুরুষ-বন্ধুর মনে হিল্লোল তুলেছিল, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

আমি টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন হয়েছে, যার কথা ভাবছি তার সম্বন্ধেই কোনো খবর হঠাৎ আমার কাছে হাজির হলো। বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় গভীর বিশ্বাসী ডাঃ সুধাকর চ্যাটার্জি এই ধরনের ঘটনাকে কাকতালীয় বলে ধরে নিতে উপদেশ দেন। কাক উড়লো এবং তাল পড়লো এর মধ্যে কার্যকারণ কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল আকস্মিকতা আছে।

রাধাগোবিন্দ সম্পর্কে যে টেলিগ্রামটা একটু আগে এসেছে সেটা অনেকটা সেইরকম। আজকের দিনটা আমার বেশ ব্যস্ত থাকারই কথা। নানা কাজ এবং অকাজ অক্টোপাশের মতো আমাকে আজকাল জড়িয়ে ধরেছে, জীবনের অপরাহ্নবেলার মূল্যবান সময় অযথা ব্যস্ততার স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। তাই আজ আমি ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করবো বলে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি।

বলা বাহুল্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সুধাকর চ্যাটার্জিও ব্যস্ত মানুষ—তাঁর চেম্বারে বহু বিচিত্র মানব-মানবীর আনাগোনা। এই ব্যস্ত পরিবেশেও সুধাকর মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালবাসেন। এবার দশদিন আগে থেকে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। আজকের বিকেলে আমার হাতে কোনো কাজ থাকবে না, সুধাকরও কোনো রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার রাখবেন না। দু'জনে প্রাণখুলে ভাবের আদান-প্রদান করা যাবে।

সুধাকর বলেন, "অসুস্থ মনের মানুষে এ দেশ ক্রমশ ভরে উঠছে—এই সমস্যা সম্পর্কে কাগজের হেড লাইন হয় না, তবু কথাসাহিত্যিক হিসেবে ব্যাপারটা আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন।"

আমি বলি, "মূল্যবোধের বিপর্যয় আমাদের সাহিত্যেও সমস্যা

আনছে—সুস্থ মানুষ এবং সুস্থ আদর্শের কথা গল্প-উপন্যাসেও বিরল হয়ে উঠছে।"

পঁয়তাল্লিশ বছরের সুধাকর চ্যাটার্জি মানুষ হিসেবে আমাকে ভীষণ আর্কষণ করেন। কিন্তু ব্যস্ত মানুষের নাগাল চাইলেই পাওয়া যায় না। কত রোগীর কত সমস্যা সমাধান হচ্ছে তাঁর চেম্বারে। এই বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপের পরেই আমি বুঝতে শুরু করেছি, মন জিনিসটা দেহের ইঞ্জিনের মতো। এও বুঝেছি, মন বিগড়োলে বেজায় বিপদ—মনের গায়ে মলম লাগে না, তাই মনের চিকিৎসা বেশ কঠিন এবং ধৈর্যসাপেক্ষ।

সুধাকরের সঙ্গে গল্প করার লোভ হলেই দেখা করা চলে না। ওঁকে বলি, "আপনার সময়ের অনেক দাম। আমার জন্যে কেন আপনি একজন রোগীকে বঞ্চিত করবেন? পেশার ক্ষতি করবেন?"

সৌভাগ্যক্রমে সুধাকর নিজেও আমার সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পান।

তিনি আমার কথা শুনে হেসে বলেন, "মাঝে-মাঝে সময়ের অপচয় এবং রোজগারের ক্ষতি হওয়া ভাল! সারাক্ষণ মানসিক রোগী পরিবৃত হয়ে থাকলে মনের ডাক্তারও মানসিক রোগী হয়ে উঠতে পারে—এ-দেশে একাধিক এমন কেস দেখতে পাবেন। একজন বিখ্যাত মানসিক ডাক্তারের বউ গতকালই চুপি-চুপি আমাকে বলছিলেন, 'আমার কর্তাটি কেমন হয়ে যাচ্ছেন, ওঁর বোধহয় চিকিৎসার প্রয়োজন'।" এরপর সহৃদয় সুধাকর জানিয়েছেন, "গল্প লেখকদের সঙ্গে গল্প করতে আমার সারাক্ষণ ইচ্ছে হয়।"

"হবেই তো!" আমি বিনীতভাবে নিবেদন করেছি। "আমাদের এই সমাজে একমাত্র গল্পলেখকরাই তো লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাগল বলে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত।"

সুধাকর চ্যাটার্জি হেসে বললেন, "মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ লোক পৃথিবীতে একজনও নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ লোককে কাচের ঘরে রাখতে হবে, কারণ এই পাগল দুনিয়ার চাপে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়তে পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না।"

ডাঃ চ্যাটার্জির মুখেই শুনেছি, মানসিক অসুস্থ মানুষের সংখ্যা এদেশে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। "দেহের অসুখে লজ্জা নেই, কিন্তু মনের অসুখে এখনও ভীষণ সঙ্কোচ এদেশে," সুধাকর চ্যাটার্জি দুঃখ করলেন। "আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, বন্ধুবান্ধব না-থাকলে অনেক মানসিক রোগী টপ করে সেরে যেতো। কিন্তু নির্দয় মানুষের ভয়ে রোগ চাপতে

গিয়ে অসুখ বেড়েই চলেছে।"

সুধাকর এবার অনেকদিন পরে আমাকে সময় দিয়েছেন। বলেছেন, "সকাল এগারোটা নাগাদ পালিয়ে আসুন, টানা তিনটে পর্যন্ত লাগাতার আড্ডা চলবে।"

সুধাকরের এক-একটি কথা আমার মনে দাগ কেটে যায়। যেমন "যারা বেশী সরল এবং যাদের মন বেশী সুস্থ তাদেরই মানসিক রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী। যারা মিথ্যে কথা বলতে পারে না, যারা লোক ঠকাতে চায় না, তারা আমাদের এই জটিল নগর-সমাজে ভীষণ বিপদে পড়ে যাচ্ছে! আমার এক রোগী বিখ্যাত অ্যাকউনটেন্সি ফার্মে কাজ করতেন। তিনি একদিন সোজা গিয়ে মালিককে বললেন, 'এতো চোরকে প্রশ্রয় দেন কেন?' চাকরিটা গেলো এবং ভদ্রলোক এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে বাড়ির লোকের রাতের ঘুমও উধাও। এখন ধরুন, এঁর কোনো দোষ নেই—ছোটবেলা থেকে শুনেছেন চুরি করা অপরাধ। কিন্তু কী করে চুরি করা যায় তার বুদ্ধি প্রকাশ্যে কেনা-বেচা চলে এ-কথা ভদ্রলোক ভীষণ সুস্থ বলে মানিয়ে নিতে পারলেন না। একদিন কোম্পানির সীনিয়র পার্টনারকে গিয়ে বললেন, 'এসব কী করছেন? চোরের বন্ধু তো বাটপাড়!' এক কথায় চাকরি গেলো। যদিও পার্টনার বুঝেছেন এটা মানসিক কেস, তবুও দয়া দেখাতে সাহস পেলেন না। আমাকে বললেন, 'অ্যাকাউনটেন্সি ফার্ম, বুঝতেই পারছেন, পরের সিক্রেট নিয়ে আমাদের কাজকারবার, এখানে আমরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে পারি না'।"

যে-লোকটা আর একটা সুযোগ পেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতো—সে চাকরি হারিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লো।

"যে-দেশে সুস্থ লোকেরই কোনো সম্মান নেই, সেখানে মানসিক অসুস্থ মানুষের কথা কে ভাববে বলুন?" দুঃখ করলেন ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জি। "ফলে আমাদের সমস্যা বাড়ছে। সমাজ যতই জটিল হয়ে উঠছে ততই মনের অসুখ বাড়ছে—এদের কথা বলবার জন্যে কেউ নেই। যাদের বাড়ির লোক অসুস্থ তাঁদেরও অনেক সময় কোনো সহানুভূতি থাকে না। তাঁদের ধারণা, যারা ভীষণ স্বার্থপর তারাই একসময় মানসিক রোগাক্রান্ত হয়।"

সুধাকর চ্যাটার্জি আমাকে বলেছিলেন, "চলে আসুন চেম্বারে। রোগীর পরিচয় গোপন রেখেই দু'একটা ঘটনা বলবো আপনাকে। বুঝবেন, বাঙালী সমাজ এখন আর সহজ নেই; পশ্চিমের মতোই

ভাই-বোন, মা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, অফিসার-কর্মচারির সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। মানুষ লুকিয়ে-লুকিয়ে মানসিক চিকিৎসকের কাছে ছুটে আসছে—জানাজানি হলে শুধু রোগী নয়, তার ভাই-বোন, বাবা-মা সবাই মার্কামারা হয়ে যাবেন, বিয়ের সম্পর্ক করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। অথচ এই মনের রোগ যেমন আসে তেমন চলে যায়। আমরা তো মনকে অপারেশন করে বাদ দিই না, বা ভাঙা মন প্লাস্টারও করি না—মনের গায়ে ইঞ্জেকশনও চলে না। আমরা শুধু মানুষের কষ্টের কারণটা আবিষ্কারের চেষ্টা করি।"

ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জির একটা কথা আমি ডায়রিতে লিখে রেখেছি। "এই যে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা বলে গিয়েছেন, নিজেকে জানো—নো দাইসেল্ফ—ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। নিজেকে আবিষ্কার করলেই অনেক মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।"

সুধাকর চ্যাটার্জির ওখানে যাবো বলেই আজ সেই ভোরবেলাতেই লাইব্রেরি ঘরের দরজা বন্ধ করে খাতা কলম নিয়ে বসেছি। নতুন একটা গল্পের ভিত্তি স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘরের দরজা বন্ধ হলেই স্মৃতির বাতায়ন খুলে যায়। আজ আমার কারণে-অকারণে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে রাধাগোবিন্দ শিকদারের কথা।

নিতান্ত অকারণেই রাধাগোবিন্দ আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে না। আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের মুহূর্তে, যখন আমার বিশেষ কোনো বন্ধু ছিল না, তখন রাধাগোবিন্দ আমাকে বিবেকানন্দর বাণী সম্বন্ধে অবহিত করেছিল।

ব্যাপারটা এই রকম : সেই কবে বনগ্রাম মহকুমায় জন্মে বিধাতার বিচিত্র খেয়ালে বাবার সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশন পেরিয়ে হাওড়ার বাসিন্দা হয়েছি। কৈশোরের শেষপর্বে এবং যৌবনের প্রারম্ভে পিতৃদেব অকালে আকস্মিকভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শুরু হলো আমার অন্ধকার জীবনপর্ব। বিরাট সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমি তখন দিশেহারা। আমি তখন ধরে নিয়েছি, পদে-পদে আঘাত ও অপমান প্রাপ্তির নামই জীবনযুদ্ধ। সংগ্রাম মানেই যে পরাজয়, এমন এক দুর্ভাবনা তখন আমাকে পরিপূর্ণ গ্রাস করতে চলেছে।

সেই সময় রাধাগোবিন্দ আমাকে বিবেকানন্দর লেখা একটা বই দিয়েছিল। বলেছিল, "তুই রাখ যতদিন খুশি।" রাধাগোবিন্দর দেওয়া

বইটা আর ফেরত দেওয়া হয়নি—দীর্ঘ বাণীর এক কোণে আবিষ্কার করেছিলাম জীবন সম্পর্কে সন্ন্যাসীর অবিচল ধারণা : সতত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের নামই জীবন।

খুব উপকার হয়েছিল আমার, কারণ সেই সময় একবার আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল। আমার জানাশোনা এক বন্ধুর দিদি গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন। অপরিণত আমি ওই সহজ পন্থার প্রলোভনে পড়ে গিয়েছিলাম। রাধাগোবিন্দর দেওয়া বইটা আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিলো। সতত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন একজন সন্ন্যাসী। 'আত্মপ্রকাশ' ও 'আত্মবিকাশ' কথা দুটি যে সেই সংকটকালে হঠাৎ বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছিল তা রাধাগোবিন্দকে আমি কখনও লজ্জায় বলিনি।

আমার মনে পড়ছে, রাধাগোবিন্দর দেওয়া বইটা হাতে নিয়ে আমি তখন নিজেকে বারবার প্রশ্ন করছি, আত্মপ্রকাশ কাকে বলে? জীবনের মরুভূমিতে যেখানে অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন ছিল না সেখানেও বীজের মধ্য থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। পুরাতন আধারকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেই তো আত্মপ্রকাশের মহোৎসব, সুতরাং আমি কেন আত্মবিনাশের কথা ভাবছি? অসংখ্য দুঃখ ও অপমানের মধ্যে পদে-পদে পরাজয়কে অবজ্ঞা করেই তো আমাকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, রাধাগোবিন্দর মাধ্যমে আমাকে তখনকার মতো বাঁচিয়ে দিলেন। আত্মপ্রকাশ অপেক্ষা আত্মবিকাশ যে কঠিনতর তা জীবনের সেই ভোরবেলাতেই আমি অনুভব করলাম।

অনেকদিন ভেবেছি, সুযোগ মতো রাধাগোবিন্দর কাছে আমি স্বীকার করবো কেন আমি তার কাছে ঋণী, কেন আমৃত্যু আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবো। কিন্তু সঙ্কোচ আমাকে ঘিরে ধরেছে, আমি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাকে কিছুই বলতে পারিনি।

রাধাগোবিন্দ জানে না, তার দেওয়া বই থেকে আত্মোপলব্ধির পরেই আমার জীবনের প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয়েছে। মানুষের এই পৃথিবীতে হেরে যাবার জন্যে আমরা আসিনি এখন বিশ্বাস নিয়েই অন্ধ আবেগে আমি এগিয়ে চলেছি। তখন আমার জীবন পথের পাথেয় বিবেকানন্দর বাণী এবং আমার মায়ের আশীর্বাদ। শত দুঃখের মধ্যেও আমার মা তখন আমাদের জড়িয়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

খেয়ালী রাধাগোবিন্দর একটি ছড়ার-খাতার কথাও মনে পড়ছে।

সেই খাতাটাও আমার মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে আজও আমার কাছে রয়েছে।

রাধাগোবিন্দর খাতায় দুটো ছড়া আছে:

"মা নেই যার
ঘাটে নেই নাও তার।"

আর একটি ছড়া মনের মধ্যে ছবির মত আজও আঁকা রয়েছে। যেন বনগ্রামের সেই ভাঙা বাড়িতে আমার মা ও আমাকে দেখেই কবি লিখেছেন:

"এক পিঠে ভিজে মার
গুয়ে আর মুতে,
আরেক পিঠে কাঁপে মার
মাঘ মাইয়ার শীতে।
মার অঙ্গের বস্তর খানি
যাদুর অঙ্গে দিয়া,
সারা রাত পোহায় মায়
অগ্নি বুকে লইয়া।"

মায়ের সঙ্গেও রাধাগোবিন্দর খুব আলাপ ছিল। আমার সমস্ত সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে তার সঙ্গেই মা বেশী গল্প করতেন এবং দু'জনের প্রিয় ছড়া আদান-প্রদান করতেন।

চরম দুঃখের দিনে, যখন আত্মীয় এবং বন্ধুরা আমাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, তখনও রাধাগোবিন্দর নিয়মিত যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে।

একটা বিশেষ দিনের ছবি আজ হঠাৎ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তার আগে পিতৃহীন সংসারে ভয়ঙ্কর অভাব আসতে পারে এই আশঙ্কায় আত্মহননের কথা ভেবেছি, কিন্তু একবার ছাড়া কখনও পালে বাঘ পড়েনি।

আমি তখন মাঝ-পথে লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটে সামান্য চাকরি করছি। মাইনের দিন, টাকা-পয়সা নিয়ে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীট থেকে হাওড়ায় ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেলো। দোষটা আমার নয়, আমার মালিকই শেষ মুহূর্তে কয়েকটা জরুরী কাজ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। পৌনে-আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখলাম, শোচনীয় পরিস্থিতি। বাড়িতে চালও নেই তরকারিও নেই। ছুটলাম সঙ্গে-সঙ্গে নবকুমার নন্দী লেনের বাজারে—জায়গাটা বেশী দূরে নয়। ফিরে

এলাম দশ মিনিটের মধ্যে—কিন্তু সেদিন আমার সহায়সম্বলহীন মায়ের মধ্যে যে অপমান, লজ্জা ও বেদনার ছবি দেখেছিলাম সংসারের শত সাফল্যেও তা আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

আমি একলা বসে থাকলে আজও আমার মায়ের সেই মুখটা দেখতে পাই—সন্তানরা অনাহারে রয়েছে, আমি উপার্জনে বেরিয়ে তখনও ফিরিনি। পয়সার যে অমন অবস্থা তাও সকালে মা বলেননি, তাহলে সব কাজ ফেলে রেখে মাইনে নিয়েই ফিরে আসতাম। কিন্তু এই ছিল আমার মায়ের স্বভাব—সংসারের দৈন্যের কথা মুখ ফুটে ছেলের কাছে বলতেও কষ্ট পেতেন।

সেই সন্ধ্যাবেলায় যখন নবকুমার নন্দী লেন বাজার থেকে চাল কিনে দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরছি তখন রাধাগোবিন্দর সঙ্গে আমার দেখা।

রাধাগোবিন্দ আমাকে বললো, "কী ব্যাপার তোর? অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় আড্ডা মারছিলি? মাসীমা ভেবে-ভেবে সারা। ত বলি মাসীমা, চিন্তা করবেন না, আপনার এই ছেলে আড্ডাবাজ, গল্প সেরে ঠিক সময়ে ফিরবে, ততই মাসীমার চিন্তা বেড়ে যায়। বোধ য় দুপুরে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। তাই আমিই তোকে খুঁজতে বেরোলাম।"

অন্য কেউ হলে এড়িয়ে যেতাম, কিন্তু রাধাগোবিন্দকে মিথ্যে বলতে পারলাম না। "বাড়িতে আজ চাল ছিল না। রান্না হতো না এই অবস্থা। একত্রিশ দিনের লম্বা মাসগুলো আমি দেখতে পারি যাদের মাস মাইনে তাদের সবচেয়ে প্রিয় ফেব্রুয়ারী—আটাশ দিনে মাস। তার ওপর পয়লা তারিখটা রবিবার। এর ফলেই মায়ের লক্ষ্মীর ভাঁড়ারও মরুভূমি হয়ে গেলো।"

রাধাগোবিন্দ কেমন সহজভাবে বলেছিল. "তাড়াতাড়ি বাড়ি যা, কাল তোর সঙ্গে দেখা হবে। আবার যেন কোথাও জমে যাস না।"

রাধাগোবিন্দর সেদিন অভিমান হয়েছিল। "আমার পকেটে তখনও আড়াই টাকা ছিল, মাসীমার কথায় কিছুই বুঝতে পারলাম পারলে তখনই চাল নিয়ে যেতাম, তারপর ঘাড় ধরে তোর কাছ থেকে দাম আদায় করতাম!"

দুমুঠো খেতে পাওয়াটা এখনও আমার কাছে তাই ভীষণ আনন্দের। খাবার জোগাড় হয়েছে, কোনোরকম দেরি হয়নি, এই বোধটা আমার কাছে এখনও ভীষণ সুখের। ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও মা, বলে যারা রাস্তায় ভিক্ষে করে তাদের থেকে নিজেকে অনেক নিরাপদ

দূরত্বে রাখতে পেরেছি ভাবতে আমি এখনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

আজ লেখার টেবিলেই খাবার এসেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে আমি অতীতের কথা ভেবে চলেছি। আমার মনে পড়ছে, রাধাগোবিন্দ ও মায়ের মধ্যে ছড়া বিনিময়ের কথা।

রাধাগোবিন্দ বলছে,

"যে করে পরের আশ
সে খায় বনের ঘাস।"

মা খুব খুশি হয়ে হাসিমুখে উত্তর দিচ্ছেন :

"চাওয়া কিছু অপরের
মুখপানে চেয়ে,
না-খেয়ে পরাণে মরা
ভাল তার চেয়ে।"

এই সব চিন্তার সময়েই আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এলো। কিন্তু সংসারের বর্তমান অধিকর্ত্রী টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিলেন না। এ-বাড়িতে সকলের টেলিগ্রামভীতি আছে। দুঃসংবাদ ছাড়া টেলিগ্রাম আর কিছু বহন করে আনে না এমন আশঙ্কা আমার মায়েরও ছিল। তাই মায়ের নির্দেশ, খাওয়ার সময় কাউকে টেলিগ্রাম দেবে না। খাওয়া শেষ হোক তারপর যা হয় হবে।

খাওয়া শেষ করে, টেলিগ্রামটা আমি খুলে ফেললাম। এতো কাছ থেকে এইরকম বার্তা আমি অবশ্যই প্রত্যাশা করিনি। এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় সুহাসিনী টেলিবার্তা পাঠিয়েছে, আমি যেন অবশ্যই তার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করি।

সুহাসিনীর সঙ্গে যোগাযোগ? রাধাগোবিন্দর মুখটা আমার চোখের সামনে ঝলক দিয়ে উঠলো। সুহাসিনী-রাধাগোবিন্দ এই পর্ব তো অনেক দিনের ব্যবধানে আমাদের প্রত্যাশার বাইরেই সমাধান হয়েছে

আমি টেলিগ্রামটা কয়েকবার পড়লাম। নিশ্চয় বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে, না-হলে সুহাসিনী তো আমাকে এমনভাবে খবর পাঠাতো না

একটু রাগও হচ্ছে। দূরের লোকেরাই তো চিরকাল টেলিগ্রাম পাঠায়। রিকশায় এসে যে খবর দেওয়া যেতো তার জন্যে টেলিগ্রামের এই ব্যবহার মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কীভাবে বহন করবেন কে জানে? কিন্তু মনে-মনে সুহাসিনীর উপস্থিত-বুদ্ধিরও তারিফ করলাম বাংলার বাইরে থেকে-থেকে সুহাসিনী বেশ স্মার্ট হয়ে-উঠেছে। অথচ একসময় কী ভীতু এবং বোকা ছিল এই সুহাসিনী। একবার

কলেজ থেকে ফেরবার সময় হঠাৎ কী কারণে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় আমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সুহাসিনীর কী কান্না!

সুহাসিনীকে সামলাতে আমাকে বেশ ভুগতে হয়েছিল। "বাস বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে? কলকাতায় এখনও তো দাঙ্গা শুরু হয়নি।"

আমার একটা ক্লাশ তখনও বাকি ছিল, কিন্তু সুহাসিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে আমাকে সেই ক্লাশ বন্ধ রেখে বলতে হলো, "কোনো চিন্তা নেই, আমার সঙ্গেই হাওড়ায় ফিরবে।"

সেবার হাঁটতে-হাঁটতে আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। বাড়ি পৌঁছে সুহাসিনীকে বলেছিলাম, "কী হলো? বাড়ি ফিরলে তো? হঠাৎ বিপদ এলে ঠাণ্ডামাথায় তার মোকাবিলা করা প্রয়োজন, কেঁদে কোনো লাভ হয় না।"

এসব কতদিন আগেকার কথা। এখন কোন ছেলেমেয়ে বিশ্বাস করবে, কলেজ-পড়া নবীনা বাড়ি ফেরবার দুর্ভাবনায় পথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে পারে? এখন ছেলে-মেয়েরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মেশে, পরস্পরের সান্নিধ্য পায়। আমাদের সময় ছিল উল্টো, একটা কোনো প্রয়োজনে কোনো সহপাঠিনীর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাওয়াটাই ছিল ভাগ্যের ব্যাপার

তার কিছুদিন পরের এক ঘটনাও মনে পড়ছে। সুহাসিনীর সঙ্গে প্রথম বেরোবার পরে রাধাগোবিন্দর সেই সরস মন্তব্য। রাধাগোবিন্দ বলেছিল, "পিতৃপুরুষ অনেক ভেবে চিন্তে যেসব কথা বলে গিয়েছিলেন তা একেবারে মূল্যহীন ভাবিস না। অনেক ঠেকে, অনেক রিসার্চের পর তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন—পথে নারী বর্জিতা।"

আমাদের তখন আদর্শবাদের যুগ। নারীকে সর্বস্তরে সমান অধিকার দেওয়ার জন্যে আমাদের রক্ত তখন টগবগ করছে।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছি, "কেন? বিবেকানন্দ, নিবেদিতা এঁরা তো উল্টোকথা বলছেন। অতবড় তামিল লেখক সুব্রহ্মণ্য ভারতী মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলেন সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে, নিবেদিতা প্রথমেই তাঁকে বকুনি লাগালেন, 'বউকে সঙ্গে আনোনি কেন?' তাছাড়া স্বামীজীর সঙ্গেও তো সিস্টার নিবেদিতা কতবার পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরেছেন।"

রাধাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলেছিল, "পূর্বপুরুষরা যে বাণী দিয়েছেন তার ওপর আপীল নেই। তাঁরা জানতেন, রাস্তায় বেরুবার সময়ে মেয়েরা পাক্কা চটি ছাড়া কিছু পরবে না। সুহাসিনীকে নিয়ে সেবারে যা কাণ্ডটা ঘটলো। আমার সঙ্গে হেঁটে আসতে গিয়ে, মাঝরাস্তায় চটির স্ট্র্যাপ পটাং!

এমন জায়গায় ব্রেকডাউন যেখানে ধারে-কাছে কোনো মুচি বসে নেই।"

কোনো মহিলাকে নিয়ে বেরুবার হাঙ্গামা এই প্রথম হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে রাধাগোবিন্দ। সে বললো, "মেয়েদের সঙ্গে বেরুতে হলেই নিজের থলেতে এক জোড়া বাড়তি চটি রাখবে এবং সম্ভবহলে ফার্স্ট এড বক্স!"

"আবার ফার্স্ট এড বক্স কেন? আমি দুষ্টুমি চেপে রেখেই জিজ্ঞেস করি।

রাধাগোবিন্দ বললো, "চটি হাতে নিয়ে, কোনোরকমে কণ্ডাক্টরের হাতে-পায়ে ধরে একটা বাসে ওঠা গেলো। ওমা! একটু পরেই লেডিজ সীটে এক মহিলা পেট্রোলের গন্ধে প্রথমে বমি করলেন, তারপর জ্ঞান হারালেন। পেট্রোলের গন্ধ একমাত্র মেয়েদেরই কেন কাত করে তা বলতে পারিস?"

আমার পাশে তখন বসেছিল তমোনাশ চৌধুরী। অবস্থাপন্ন ঘরের ভাল ছেলে। সুদর্শন। সুহাসিনীর ওপর একটু দুর্বলতাও ছিল। সে বলেছিল, "ভগবান, বমি রোগটা বামাজাতকে একটু বেশীই দিয়েছেন!"

সুহাসিনীকে আমরা সেই সময় আমাদের আসরে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেলাম। সুহাসিনী আন্দাজ করলো, আমরা ওকে নিয়েই কোনো আলোচনা করছি। সে বললো, "কালকে একটা ফাঁড়া গেলো। চটিটা এমনভাবে ছিঁড়লো!"

ফাঁড়া আরও বড় বিপদকে বলে, আমি সুহাসিনীকে মনে করিয়ে দিই। পথে চটি ছেঁড়াটা মেয়েদের একটা নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা!

সুহাসিনীর প্রতিবাদঃ "নিত্তনৈমিত্তিক বললেই হলো! আমার জীবনে এই প্রথম ঘটলো!"

ফচকে তমোনাশের মন্তব্যঃ "রাস্তায় চটির স্ট্র্যাপ না-ছিঁড়লে মেয়েই হয় না। আমার সাত পিসি, তিন মাসী এবং তেরো জন খুড়তুতো বোনের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আমি এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে এসেছি!"

রাধাগোবিন্দ তখন কোন মতামত দিলো না। পরে সাহস পেয়ে মুখ খুললোঃ "আমি প্রধানমন্ত্রী হলে অর্ডিনান্স করে রাস্তায় মেয়েদের চটিপরা বন্ধ করে দেবো। এদেশের পথঘাটের যা অবস্থা সকলকেই পর্বতারোহণের বুট পরতে হবে!"

সুহাসিনী রেগে উত্তর দিয়েছিল, "পরেছে! মেয়েরা চটি পরবেই শাড়ির সঙ্গে গোদা বুট মোটেই মানায় না।"

এই কথা শুনে রাধাগোবিন্দ ফোড়ন কেটেছিল, "মানানোর ব্যাপার

নিয়ে মেয়েরা বড্ড মাথা ঘামায়। রাস্তায় যা সব স্বামী-স্ত্রী দেখি! ক'জনের সঙ্গে ক'জনের ম্যাচ করেছে? তবু সেই মেয়েরাই শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করবার জন্য পাগল।"

এসব কতদিন আগেকার কথা। তারপর সুহাসিনীর জীবনে এবং ভারতবর্ষে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এখন সুহাসিনী আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নিশ্চয় রাধাগোবিন্দ সম্পর্কে কোন আলোচনা আছে।

সুহাসিনীর পাঠানো আর্জেন্ট টেলিগ্রামের কথাই ভাবছি। যখন নিজে কোথাও যাওয়ার উপায় থাকে না, যেখানে টেলিফোনের সুবিধে নেই, সেখানে কাছাকাছি টেলিগ্রাম পাঠানোর বুদ্ধিটা সুহাসিনী ভালই বের করেছে। ওর বাড়ির পাশেই পোস্টাপিস—পাশের বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে না এমন কথা তো কোন আইনে লেখা নেই। এখানে সুবিধে হলো, ছোটাছুটি করতে হলো না, অথচ সামান্য খরচে খবরটা ঠিক জায়গায় পাঠানো গেলো।

দেখা হলে, সুহাসিনীর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে—সেই বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কান্নাকাটির সময় থেকে সুহাসিনী অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কী এমন ঘটলো যে এইভাবে টেলিগ্রামে পাঠাতে হলো? সুহাসিনীর সঙ্গে অনেক গল্প করেছি, অনেক রসিকতার বিনিময় হয়েছে। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ অবশ্য ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। যার সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে সে আমার খবরাখবর রাখতো সে তো এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যেই। সুহাসিনী আমাদের প্রাক্তন সহপাঠিনী। সুতরাং তার সঙ্গে হালকা রসিকতা করা চলে। আমি বলছি, "তুমিও তোমার প্রাণেশ্বরের মধ্যে একদা আমি ছিলাম একটা হাইফেন। সমাস অথবা সন্ধি হয়ে যাবার পরে হাইফেন ক তুলে দিতে হয়।"

সুহাসিনীর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কে বলে শুধু কমবয়সী যুবতীদেরই লজ্জায়-রাঙা মুখ সুন্দর? যারা সুহাসিনীকে এখনও লজ্জা পেতে দেখেনি তারাই এই কথা বলে।

টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে দোটানায় পড়ে গিয়েছি। একদিকে সুহাসিনী, অন্য দিকে ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জি।

শেষ পর্যন্ত সুধাকরকে টেলিফোন করলাম। আমার ভাগ্য ভাল সুধাকর নিজেই ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আজ এক মহিলা পেশেন্ট ভীষণ ভোগাচ্ছেন। সকাল থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে, পৃথিবীতে কোনো পুরুষই নাকি নিরাপদ নয়। প্রত্যেক পুরুষ তাঁকে বিষ খাইয়ে মারবার

চেষ্টা করছে। কয়েকদিন সাইকিয়াট্রিস্টরা ঘুমের ওষুধে ওঁকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ডিপ্রেশন ছাড়া কোন ফল হয়নি। এখন তাঁকে একটা নার্সিং হোমে পাঠিয়েছি, যাচ্ছি দেখতে।”

সুধাকর চ্যাটার্জি ক্ষমা চাইলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যদি আরেক দিন করা যায়। আমি খুশী হয়ে টেলিফোন নামিয়ে দিলাম।

আবার বাধা। আকাশ জুড়ে মেঘ ছিল সেই সকাল থেকে। কিন্তু এখন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এলো। এই বৃষ্টি দেখতে খুব ভাল লাগছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে। কিন্তু শহরে বৃষ্টির দৌরাত্ম্যও আমার অজানা নয়।

এখন বাইরে বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি নিজের পড়ার চেয়ারে বসে সুহাসিনীর কথা ভাবছি। কান টানলে যেমন মাথা আসে, সুহাসিনী প্রসঙ্গ মানেই রাধাগোবিন্দ।

রাধাগোবিন্দ শিকদার। সেই প্রথম ক্লাশ নাইনে আমাদের ইস্কুলে ছেলেটি যখন যোগ দিলো তখন থেকেই কত কথাই মনে পড়ছে।

নতুন ছেলেটিকে সনৎবাবু স্যার যখন নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং সে যখন বললো, রাধাগোবিন্দ শিকদার, তখন অঙ্কের মাস্টারমশায় হিসেবে তিনি খুব খুশী হলেন। “রাধানাথ এবং রাধাগোবিন্দের মধ্যে তফাৎ নেই বললেই চলে।”

আমাদের হরিময় বলে উঠলো, “নাইটিন টোয়েন্টি ডিফারেন্স।”

স্যর প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। পরে যেমনি তর্জমা শুনলেন, উনিশ-বিশ তফাৎ, তখন খুব হাসলেন। বললেন, “তোমরা জানো রাধানাথ শিকদার পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ চিহ্নিত করেছিলেন?”

“পাহাড়ের মাথায় উঠে নিশ্চয় মেপেছিলেন।” বোকা হরিময়ের প্রশ্ন: “ভদ্রলোক অত লম্বা টেপ কোথায় পেলেন স্যর?”

সনৎবাবু বললেন, “মাথায় উঠে নয়, স্রেফ অঙ্ক কষে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা বের করেছিলেন রাধানাথ শিকদার। নাম হওয়া উচিত ছিল রাধানাথ পর্বত, কিন্তু সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার তখনকার বড় সায়েব স্যর জর্জ এভারেস্টের সম্মান বাড়লো।”

হরিময় বলে উঠলো, “আপনি ভাববেন না স্যর। আমরাও প্রতিশোধ নেবো, রাধাগোবিন্দ শিকদারকে ডাকবো এভারেস্ট শিকদার বলে।”

ক্লাশে হাসির রোল উঠলো। তারপর সনৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে তুমি কী জানো?"

রাধাগোবিন্দ তরতর করে বলে গেলো, "মস্ত লোক ছিলেন। ইংরেজের চাকরি করেও ভীষণ তেজস্বী ইণ্ডিয়ান ছিলেন। পরে বড় সরকারী চাকরি ছেড়ে কলেজে অঙ্কের মাস্টারি নিয়েছিলেন।"

"ঠিক বলেছো," ভীষণ খুশী হলেন সনৎবাবু স্যর। "অধ্যাপক হবার আগে বিনা মাইনেতে ইস্কুল মাস্টারি করেছেন। একজন সায়েব গরীব এক কুলিকে বেগার খাটাতো, তার প্রতিবাদ করে রাধানাথ রাজরোষে পড়লেন। ম্যাজিসট্রেটের কোর্টে তাঁর যখন শাস্তি হলো তখনও সিপাহী বিদ্রোহী হয়নি। আমরা ৮৪৩ সালের কথা বলছি।

"রাধানাথ শিকদার সাহিত্যসেবীও ছিলেন", বলে উঠলো রাধা-গোবিন্দ শিকদার।

আরও খুশী হলেন সনৎবাবু। "ঠিক বলেছো। মেয়েদের জন্য মাসিক-পত্রিকা বের করেছিলেন, এবং সেখানেই বেরিয়েছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

রাধাগোবিন্দ উৎসাহ পেয়ে বলে উঠলো, "ওঁর বাবার নাম তিতুরাম শিকদার।"

নাম শুনেই ক্লাশে হাসির হুল্লোড় উঠলো। সনৎবাবু স্যর হাসতে বারণ করলেন। তারপর জানা গেলো রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে দূর সম্পর্কে কী এক আত্মীয়তা আছে রাধাগোবিন্দ শিকদারের।

কিন্তু রাধাগোবিন্দ শিকদার অঙ্কে উইক! এর পরে সনৎবাবু স্যর যখন রেগে যেতেন তখন বলতেন, "তোর নামটা পাল্টে নে। এভারেস্ট শিকদার হয়ে যা তুই।"

রাধাগোবিন্দ মাথা নিচু করে থাকতো এবং বন্ধুদের কেউ ওই নামে ডাকলেই ভীষণ রেগে যেতো। হরিময়ের সঙ্গে তো কথাই বন্ধ হয়ে গেলো রাধাগোবিন্দর।

আমি কখনও ওকে এভারেস্ট বলে ডাকতাম না, তাই আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল রাধাগোবিন্দর।

মনের দুঃখে সে আমাকে বলতো, যখন আমারও খুব নাম হবে, তখন ওই নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করা বেরিয়ে যাবে।"

ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়, আমি ভাবতাম। সত্যি যদি রাধাগোবিন্দ কখনও বিখ্যাত হয় তখন হরিময়ের লজ্জার শেষ থাকবে

না। তখনও আড়ালে এভারেস্ট শিকদার বলে রসিকতা করা বেরিয়ে যাবে।

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে আমার ভাব বেড়ে যাচ্ছিল। বিকেলে আমরা দু'জনে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরোতাম। রাধাগোবিন্দ আমায় জিজ্ঞেস করতো, "তুই বড় হয়ে কি হবি?" এ এক ভীষণ প্রশ্ন। বলেছিলাম, "বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।" রাধাগোবিন্দ বলতো, "তুই আর হাসাসনি। তুই কী হতে চাস তার জন্য বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?" আমি বলতাম, "বাবা-মাকে জিজ্ঞেস না-করে কোনো কিছু করতে নেই।"

খুব বিরক্ত হতো রাধাগোবিন্দ। বলতো, "চিন্তাতে কখনও পরাধীন হবি না। তুই তো বাবা মায়ের অসম্মাসজনক কিছু করছিস না। তুই শুধু ঠিক করবি, কী হতে চাস।"

আমার ভাবনা শুরু হলো। মনের মধ্যে লোভ ছিল, "ইস্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হই। কিন্তু সে গুড়ে বালি, অন্তত আট-দশটা ছেলে আমার থেকে এগিয়ে আছে। অঙ্কে যারা দুর্বল তারা কোনদিন ইস্কুলের পরীক্ষায় কিছু করতে পারবে না।"

বাদাম খেতে-খেতে রাধাগোবিন্দ জিজ্ঞেস করতো, "কী রে কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

আমি প্রশ্ন এড়াবার জন্য জিজ্ঞেস করতাম, "রোজ-রোজ বাদাম কেনবার পয়সা তুই কোথায় পাস রে?"

রাধাগোবিন্দ বললো, "মা জননী সাপ্লাই করেন। বাবা শুনলে রাগ করবেন কিন্তু মার কাছে পয়সা চাইলেই হলো।"

তার মানে রাধাগোবিন্দর মা ছেলেকে খুব ভালবাসেন, আমি ভাবতাম। আমার মাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেও বাদামের পয়সা বেরুবে না! এক একদিন আমি বোকার মতো ভেবেছি, আমার মা আমাকে যত ভালবাসেন রাধাগোবিন্দর মা নিশ্চয় তার থেকে রাধাগোবিন্দকে অনেক বেশী ভালবাসেন। তখন জানতাম না, রাধাগোবিন্দর সৎ মা। ভাইবোনেরা সবাই বৈমাত্রেয়।

রাধাগোবিন্দর মধ্যে তাই নিঃসঙ্গতা ছিল। যাই হোক, রাধাগোবিন্দর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা এবং কৌতূহল ছিল, আমার মতো বর্তমানকে নিয়ে হাবুডবু খাবার আদেখলপনা মন তার ছিল না।

রাধাগোবিন্দ বাদাম চিবোতে-চিবতে জিজ্ঞেস করতো, "কীরে,

ভবিষ্যতে কী হতে চাস তুই ?”

আমি তখন বলেছিলাম, “অঙ্কের মাস্টার হতে পারলে ভাল হতো, সব ব্যাটাকে গোল্লা খাওয়াতাম! কিন্তু সে যখন হবার নয় তখন আমি ব্যারিস্টার হবো।”

“ব্যারিস্টার হতে চাস কেন ?” সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করতো রাধাগোবিন্দ।

“জানিস, চিত্তরঞ্জন দাশের কত টাকা ব্যারিস্টারিতে রোজগার ছিল ? মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ?”

“সেই উপার্জিত টাকার সব তিনি দান করে দিতেন,” রাধাগোবিন্দ সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে মনে করিয়ে দিলো।

“আমিও দেবো, তবে সবটা নয়। নিজের হাতে দশ হাজার টাকা রেখে দেবো, আর আমাদের ইস্কুলের ছাত্রদের জন্য বাদাম ভাজা ফ্রি করে দেবো। প্রতি ছাত্র প্রতিদিন এক ছটাক বাদাম পাবে।”

রাধাগোবিন্দ খুশী হলো। “ব্যারিস্টারি বাদামের জন্যে তোর তখন খুব নাম হয়ে যাবে! যদি তুই এখনই সি আর দাশ হতিস তা হলে আমার খুব সুবিধে হতো। মায়ের কাছে প্রত্যেকদিন পয়সা চাইতে হতো না ”

“প্রত্যেকদিন বাদাম খাওয়ার কী দরকার ?” আমি মৃদু বকুনি লাগাতাম রাধাগোবিন্দকে।

রাধাগোবিন্দ বলতো, “আমার নিজের মা মরে যাবার পরে আমি দিদিমার কাছে থাকতাম। মামার বাড়িতে আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে প্রতিদিন তিনি বাদাম ভাজা দিতেন। সেই অভ্যেসটা রয়ে গিয়েছে, নতুন মায়ের কছে এসেও বাদাম ভাজা চাইতাম। একবার না পেয়ে খুব কাঁদলাম, তারপর থেকে মা কখনও না বলেন না!”

দিদিমার কাছে থেকে-থেকে রাধাগোবিন্দ আর একটা জিনিস আয়ত্ত করেছিল অসংখ্য ছড়া তার মুখস্ত!

যেমন আমি বললাম, “সি আর দাশের মতো ব্যারিস্টার হলে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না, কেবল সুখ!”

রাধাগোবিন্দ সঙ্গে-সঙ্গে সেই অপরিণত বয়সে ছড়া কাটলো:

“সুখ নয় ধনে
সুখ হয় মনে।”

রাধাগোবিন্দর দিদিমা নাকি প্রতিদিন এই কথা বলতেন।

পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়ের সি আর দাশ হওয়ার প্রস্তাবে খুব

খুশী রাধাগোবিন্দ। "নিজের স্বপ্ন সফল করার জন্য কী ভাবে এগোবি ভাবছিস ?" রাধাগোবিন্দ আমাকে প্রশ্ন করেছিল।

আমি চিরকালই হাঙ্গামা এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী। মুখে বাদাম পুরতে-পুরতে বলেছিলাম, "কপালে যদি ব্যারিস্টারি লেখা থাকে তাহলে সব কিছুই আপনা-আপনি হয়ে যাবে।"

"মোটেই না, মোটেই না!" ব্যস্ত হয়ে উঠলো রাধাগোবিন্দ। "অবহেলায় কিছু হয় না দিদিমা বলতেন,—

হেলায় কর্ম নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নিধনে
যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দধি-বিনে।"

"একান্ত দায়ে না-পড়লে আমার যে কোন কাজ করতে ইচ্ছে করে না ভাই," আমি রাধাগোবিন্দর কাছে আমার দুর্বলতা অকপটে স্বীকার করেছি।

রাধাগোবিন্দ সঙ্গে-সঙ্গে ছড়া কেটে বলেছে, "তোর অবস্থাটা হলো ঃ

লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি
পেটের জ্বালায় খাই,
লজ্জা শরম আছে বলে
কাপড় পরে যাই।"

রাধাগোবিন্দ আমাকে সত্যিই ভালবাসতো। সে একদিন বলেছিল, "একবার যখন জেনে গিয়েছি তুই কী হতে চাস, তখন আমি মাঝে-মাঝে চাপ দিয়ে যাবো। তুই কিছু ভাবিস না। এই দুনিয়াতে ঃ

যেমন মতি
তেমন গতি।
যেমন গাওনা
তেমন পাওনা
যেমন রাঁধা
তেমন কানু।
যেমন কর্ম
তেমন ফল!"

আমিও যথাসময়ে রাধাগোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেছি, "তুই কী হতে চাস রাধাগোবিন্দ ?"

রাধাগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছে, "আমার লক্ষ্য একটাই, ওই

রাধানাথ শিকদারের তুলনায় রাধাগোবিন্দ শিকদারকে ইতিহাসে বিখ্যাত করে তোলা!"

"রাধানাথ শিকদারের নাম তো এতো বছর পরেও লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তুই ওঁকে 'বিট' করবি কী করে?" আমি বন্ধুর জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ি।

রাধাগোবিন্দ বললো, "খুব শক্ত কাজ, কিন্তু আমাকে ট্রাই নিতেই হবে ভাবছি, এভারেস্ট পর্বত চুড়োয় উঠে রাধানাথের হিসাবটা ভুল প্রমাণ করলে কী হয়?"

তখনও এডমণ্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগের কথা পৃথিবীর কেউ শোনেনি। এভারেস্ট তখনও অপরাজিত, ম্যালরি ও আর্ভিং-এর গৌরবময় ব্যর্থতার কথা আমরা বইতে পড়ে চলেছি। ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে।

আমি বলেছি, রাধাগোবিন্দ শিকদারের বাল্যবন্ধু হিসেবে আমিও তাহলে খুব বিখ্যাত হয়ে যাবো।" এভারেস্টের উচ্চতা যে উনত্রিশ হাজার কয়েক শ ফুট তা আমাদের মুখস্ত ছিল,। "আমি বলেছিলাম, "তোকে তাহলে মস্ত একটা ফিতে, অন্তত তিরিশ হাজার ফুট লম্বা, সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এভারেস্টকে হাতে-নাতে না মাপা পর্যন্ত কী করে বলা যাবে নিখুঁত মাপ কতো?"

"যদি কোনো কারণে এভারেস্ট জয় না করতে পারিস তাহলে তুই কী হবি?" আমি আবার জানতে চেয়েছি। সব সময় হেরে যাবার ভয় থাকে আমার মনে।

রাধাগোবিন্দ বিরক্ত হয়েছে, "সব সময় যদি-ফদির কথা তুলবি না। খেলা শুরু হবার আগেই হারের কথা ভাবতে তোর তুলনা নেই। যদি এভারেস্ট বিজয়ী না হতে পারি, তা হলে আমি বাংলা ছড়ার অভিধান রচনা করবো। দেশের সমস্ত লোকের মুখে-মুখে রাধাগোবিন্দ শিকদার সঙ্কলিত 'ঠাকুমার ছড়া' ঘুরবে।"

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে দূর থেকে আমরা হরিময়কে।দেখতে পেলাম। আমাদের গোপন আলোচনা সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হলো। "শত্রু আগত ওই!" বিড়বিড় করলো রাধাগোবিন্দ।

হরিময়ের সঙ্গে ছড়ায় কথা বললো রাধাগোবিন্দ। শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ডবল অর্থের এই কবিতা এক সময় নাকি গ্রামে-গ্রামে আবৃত্তি হতো:

"হাসতে গিয়ে কান্না এলো

কাঁদতে গিয়ে হাসি।
দূর থেকে তোমায় আমি
বড্ড ভালবাসি।”

বোকাসোকা হরিময় ভিতরের অর্থ না-বুঝেই খুব খুশী হলো। বললো, “ভাই এভারেস্ট, দূর থেকে কেন? কাছে এসেও আমরা এবার থেকে দু’জনকে ভালবাসবো।” এবার আমার চোখের সামনে দু’জনের কোলাকুলি হলো।

কবিতাটা হরিময়ের খুব ভাল লেগেছিল, কয়েকবার আওড়ে চারটে লাইন মুখস্ত করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরের দিন হৈ হৈ কাণ্ড।

হরিময় বললো, “রাধাগোবিন্দ, তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ ফর হোল লাইফ। তুমি আমাকে শত্রু বলেছো, দিদিমার মুখে শুনলাম।”

রাধাগোবিন্দ টুক করে ফোড়ন কাটলো:

“আপন যেমন
জগৎ তেমন!

আমি তোমার বন্ধু হিসেবে কোলাকুলি করেছিলাম। তুমি যেমন, ঠিক তেমন মানে করে নিয়েছো!”

হরিময়ের সঙ্গে সেই যে কথা বন্ধ হলো, আর রাধাগোবিন্দর সঙ্গে মিলন হলো না স্কুলজীবনে।

রাধাগোবিন্দ দুঃখ করেছে, “আমি যদি ক্লাশের ফার্স্ট বয় হতাম তাহলে দেখতিস এই হরিময় আমার সঙ্গে আবার ভাব করতো!”

রাধাগোবিন্দ পড়াশোনায় নিতান্ত খারাপ নয়। কিন্তু পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারটা এক সময় অলীকস্বপ্নে রূপান্তরিত হলো। রাস্তায় বেরিয়ে আমারই চোখের সামনে কলার খোসায় এমন হাঁটু ভাঙলো যে বেশ কয়েকমাস তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো। ইস্কুলের পড়া বলে দেবার জন্যে আমি প্রায়ই ওর বাড়িতে যেতাম। দু’জনে অনেক কথাবার্তা হতো। তারপর একটা লাঠি বগলে নিয়ে রাধাগোবিন্দ আবার ইস্কুলে আসা শুরু করলো।

রাধাগোবিন্দর চোখে তখন জল। “পাহাড়ে চড়া আমার শেষ হয়ে গেলো। হাঁটুতে কোন জোর নেই—তিন তলার সিঁড়ি ভাঙতেই তিরিশ মিনিট লেগে যায়!”

আমি বলেছি, “ভগবানে বিশ্বাস রাখ, রাধাগোবিন্দ। গীতায়

পড়েছিস তো—মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম্, যৎকৃপা-তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

"দূর ওসব কথার কথা!" রাধাগোবিন্দ আমাকে বলেছে। "রাধানাথ শিকদারকে হারানো আমার পক্ষে এজন্মে সম্ভব হবে না। আমি ভাবছি তোর মতো আমিও ব্যারিস্টার হই।"

"খুব ভাল কথা!" আমি ব্যাপারটা স্বাগত জানাই। দু'জনে এক সঙ্গে কোর্টে যাওয়া যাবে।

রাধাগোবিন্দর মনে পর মুহূর্তেই দ্বিধার উদয় হলো। "কিন্তু একই লাইনে দু'জন! সেটা ভাল হবে?"

"খারাপ কী?" আমি বলি। "তুই এক পক্ষের আর আমি অপর পক্ষের ব্রীফ নেবো। দু'জনে কোর্টে খুব লড়ায় হবে, তারপর বাবার বন্ধু অনাদি উকিলের মতো বিকেলে দু'জনে গল্প করতে-করতে একই রিকশায় চড়ে বাড়ি ফিরে আসবো।"

"ওরে রাস্কেল রিকশা নয়, তোর তখন মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার। ওই টাকা আয় হলে কেউ রিকশা চড়ে না।"

ঠিক আছে। তুই হাইকোর্ট থেকে তোর গাড়িতে চড়বি, আমি আমার মোটর গাড়িতে চড়বো। দু'জনে দু'জনের দিকে হাত নাড়বো।"

আমার কথা শুনে রাধাগোবিন্দ খুব খুশী হয়েছে। বলেছে, "দেখা যাক।"

এভাবেই আমরা দু'জনে কলেজের আই-এ ক্লাশে এসে ঢুকেছি। ইতিমধ্যে আমার ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে। একদিন রাত্রে মার কান্নায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। একতলা থেকে দোতালায় উঠে দেখলাম বাবা নেই। আমাদের সবাইকে অনাথ করে তিনি ওপারে চলে গিয়েছেন, যেখানে সংসারের অভাব অনটনের কোন সংবাদ পৌঁছয় না।

বয়স তখন নিতান্ত কম। তাই কলেজে আসতে বাধ্য হয়েছি। কলেজে না পড়ে বাড়িতে চুপচাপ থাকলেই বোধহয় ভাল হতো। সেই সময় সবাইকে আমি এড়িয়ে চলতাম, কিন্তু রাধাগোবিন্দ আমাকে ত্যাগ করেনি। সুযোগ পেলেই আমাকে পাকড়াও করতো।

সবচেয়ে অসুবিধে হতোরাস্তায়। আমি অবশ্যই ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে যেতাম, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস থেকে কোন বন্ধু দেখলে লজ্জা হতো তাই এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু রাধাগোবিন্দ আমাকে ছাড়বার পাত্র নয়। সে আমাকে দেখলেই নিজেও সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে উঠতো।

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে কতদিন কলকাতার কলেজ থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত চলে এসেছি। পয়সা বেঁচেছে, গল্পও হয়েছে। রাধাগোবিন্দ বাদাম খাবার পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি। আমাকে অনেক বাদাম দিয়েছে। আমার বাদাম কেনার ক্ষমতা নেই—লজ্জা হতো।

রাধাগোবিন্দ জানে আমার পক্ষে ব্যারিস্টার হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবু সে বলতো, তুই কেষ্টবিষ্টু হবি তখন তো তুই আমাকে কাজু বাদাম খাওয়াবি!"

আমি আমার বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। সে বুঝতে পেরেও আমাকে মনোকষ্ট দেয়নি। হাঁটতে-হাঁটতে রাধাগোবিন্দ বলছে, ওসব কথা রাখ। 'এখন একটু পদ্য আলোচনা করা যাক।"

রাধাগোবিন্দ তখনও বিপুল উৎসাহে তার প্রবাদ সংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাধাগোবিন্দ বলতো, "অনেক ছড়ার প্রথম লাইনটা সবাই জানে, কিন্তু পরের লাইন কারও মনে নেই।" সেই সব শূন্যস্থান পূরণ করে খুব মজা পেত রাধাগোবিন্দ।

যেমন :

"সবুরে মেওয়া ফলে
বেসবুরে আগুন জ্বলে।"

"জানতিস পরের লাইনটা?" রাধাগোবিন্দ জিজ্ঞেস করতো। আমি খুব মজা পেতাম।

মাঝে-মাঝে রাধাগোবিন্দকে বোকা বানাবার চেষ্টা করতাম। " 'শুভস্য শীঘ্রম্'···পরের লাইনটা কী হবে বলো তো বাছাধন?"

"অশুভস্য কাল হরণম্!" তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল রাধাগোবিন্দ। ভগবান ওকে প্রখর স্মৃতিশক্তি দিয়েছেন। ব্যারিস্টার হওয়া ওকেই মানাবে। স্মৃতিই শক্তি, বাবার কাছে একবার শুনেছিলাম।

রাধাগোবিন্দর রসবোধও ভুলবার নয়। সে বলতো, "হাঁটতে হাঁটতে কাব্য অনুশীলন করলে স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায়। আসলে সে পায়ে হেঁটে ট্রামে-বাসে ভাড়া বাঁচানোর প্রচেষ্টায় আমাকে সাহায্য করতে চাইতো।

এই পায়ে হাঁটার অভ্যেসটাও কাজে লেগে গেলো সেবার যখন কলেজ থেকে বেরিয়ে কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় সুহাসিনী বললো, "কী হবে

বলুন তো ? ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেলো হঠাৎ।"

সুহাসিনী দাশগুপ্ত! অষ্টাদশী সুহাসিনী হাওড়ার একই বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আমার সঙ্গে বাসে উঠতো। ভীষণ গম্ভীর ছিল সুহাসিনী। তার সেই মুখখানি এবং কালো টানাটানা চোখ দুটি আজও আমি দেখতে পাই। সুহাসিনী ছিল সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায় একটু লম্বা, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। কিন্তু সেই শ্যামবর্ণের এমন উজ্জ্বলতা ছিল যা আমার দৃষ্টি আর্কষণে বাধ্য করতো। সুহাসিনীর সেই বয়সেও চোখে চশমা ছিল, তার ওপর আবার রোদ এড়ানোর জন্যে ধূসর অ্যাটাচমেন্ট ব্যবহার করতো সে। সব মিলিয়ে আমাদের সেই বয়সে এক অনুপম দেহ-স্থাপত্যের অধিকারিণী এই সুহাসিনী দাশগুপ্ত!

কতদিন একই সঙ্গে আমরা দুজনে বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করেছি। আমাদের গন্তব্যস্থলও যে এক তাও আমাদের জানা। তবু বাক্যবিনিময় হয়নি। কখনও-কখনও এমনও হয়েছে, বাস আসায় আমি পা-দানিতে আশ্রয় করে নিয়েছি, সুহাসিনী পারেনি। আমার মনে কোন লজ্জা হয়নি, যথা সময়ে কলেজে এসেছি।

সেই সুহাসিনীর সঙ্গেই পাকে-চক্রে আমার আলাপ জমে উঠলো। কী এক কারণে ট্রাম-বাস হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় কলেজ গার্ল সুহাসিনীর মনে সে দিন প্যানিক। "কী হবে!" অচেনা দূরত্ব ভেঙে ফেলে বিপদের সময় চেনামুখের কাছে এগিয়ে এলো সুহাসিনী।

হেঁটে হাওড়া স্টেশন—আমার অভিজ্ঞতাটা কাজে লেগে গেলো। বললাম, "কোন ভয় নেই। এখান থেকে হাওড়া এমন কিছু দূরে নয়।"

এসব কতদিন আগেকার কথা। সহপাঠিনীর সঙ্গে একসঙ্গে পথচলা এখন অত্যন্ত স্বাভাবিক! কিন্তু আমাদের সময় অন্য এক যুগের কথা।

অনেক বছর পরে সুহাসিনী নিজেও সায়েবগঞ্জের অতিথিশালায় সে দিনের কথা স্মরণ করে বলেছিল, "ভীষণ ভয় লেগে গিয়েছিল, শংকর। হ্যারিসন রোড ধরে চিৎপুর পেরিয়ে বাড়িতে পৌঁছান তখন বিরাট এক দুশ্চিন্তা। তারপর ভয় হলো, হুট করে সামান্য জানা একটা লোককে সঙ্গী হতে বললাম।"

অতিথিশালায় সেদিন অন্য কয়েকজন কবিবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মৃদু হেসে মুখ টিপে জিজ্ঞেস করলেন, "পথে কোন বিপদ ঘটে নি তো?"

"বিপদ বলে বিপদ। সুহাসিনী তখন হাস্যময়ী ছিল।

কবি বন্ধুরা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "বলুন, বলুন—গোপন কথা সব ফাঁস হয়ে যাক। লেখার মধ্যে ইনি কথায়-কথায় মহাপুরুষদের টেনে আনেন, চান্স পেলেই আদর্শবাদের কেত্তন গান এবং নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতা বলে জাহির করেন! আমরা ভাবছিলাম এসব টু গুড টু বি ট্রু! নিশ্চয় কোথাও অঙ্কের গোলমাল আছে—কারণ মিটমিটে শয়তান ছাড়া কেউ গল্প লেখক হতে পারে না। একজন কবি প্রকাশ্যে বলে উঠলেন—"এতে যদি আমার কোমরে দড়ি ওঠে তা উঠবে, আমি পরোয়া করি না!"

সুহাসিনীর দেখলাম সেদিনকার কথা ভালই মনে আছে। সে বললো, "আমি যত আস্তে আস্তে চলছি, শংকরবাবু ততই হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে যখন চোখের বাইরে চলে যাচ্ছেন তখন আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তারপর দেখলাম, একটু এগিয়ে গিয়ে শংকরবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছেন! ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজছেন।"

"না খুঁজে উপায় আছে? যদি ঘরের মেয়েকে ঘরে না পৌছতে পারি তা হলে কপালে অনেক ভোগান্তি হতো।" আমি রসিকতায় ইন্ধন জোগাই।

কবি বন্ধুরা সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেদিন শেষ পর্যন্ত নিরাপদে বাড়ি পৌঁছতে আপনি সফল হয়েছিলেন?"

"হয়েছিলাম! তবে অনেক কষ্টে।"

"অনেক কষ্টে মানে বিপদ এড়াবার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল আপনাকে?" কবি বন্ধুরা আমাকে আজ ছাড়বেন না।

সুহাসিনী উত্তর দিলো, "ওঁর হন হন করে এগিয়ে যাবার জন্যে আমার কষ্ট।"

আমি বললাম, "সব ব্যাপারে তড়বড় করাই আমার অভ্যাস। আপনার মনে আছে, ধীরে সুস্থে পথ না-চলার জন্যে আমাদের বন্ধু রাধাগোবিন্দ একবার ফোড়ন কেঠেছিল—

শূয়র, কুকুর, ভারী
তিন না চলে ধীরি ধীরি।"

এর মধ্যে আমাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা হয়েছিল তা জানবার জন্য হৈ হৈ করে উঠলেন কবি-বন্ধুরা।

সুহাসিনী আমাকে রক্ষা করলো। ওঁদের দিকে তাকিয়েই সে বললো, "জলের ভারীর সঙ্গেই ওঁর তুলনা চলে। ওঁর সংসারের দায়-

দায়িত্বের কথা তখনই আমি ওঁর বন্ধু রাধাগোবিন্দ শিকদারের মুখে শুনেছিলাম।”

রাধাগোবিন্দর কথা বিস্তারিতভাবে তখনই আবার উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু অতগুলো স্বল্পপরিচিত লোকের সামনে সুহাসিনী লজ্জা পেলো। আমি তখনও ভেবেছিলাম, সময়ের স্রোতে সুহাসিনী সব ভুলে গিয়েছে। তার জীবনে এখন রাধাগোবিন্দর কোন স্থান থাকবার কথা নয়—পৃথিবীর এই তো নিয়ম।

রাধাগোবিন্দ নিজেও একবার ছড়ায় বলেছিল :

রজকের কাজ কোথা উলঙ্গের কাছে
কাটা গাছে জল দিয়া কিবা ফল আছে ?”

আরো মনে পড়লো, এই সুহাসিনীর সঙ্গে আমিই রাধাগোবিন্দর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।

আমরা তিন জনে মাঝে-মাঝে কলেজ থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এসেছি। এই সময়ে রাধাগোবিন্দ পুরুষমানুষের সংগ্রামের উল্লেখ করেও ছড়া কেটেছে :

“পুরুষের দশ দশা
কখনও হাতী কখনও মশা।”

তখন আমার খারাপ অবস্থা। নিদারুণ আর্থিক অভাবে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি সবার থেকে, সামনে কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। রাধাগোবিন্দর মুখে শোনা প্রবাদটা তখন এবং আমার সমস্ত দুঃখের দিনে শক্তি জুগিয়েছে। আমি যেন রাধাগোবিন্দকে বার বার বলতে শুনেছি, “আজ মশা বলে পুরুষ যে আগামী কাল হাতী হতে পারে না এমন কোনো কথা নেই।”

কিন্তু হাতীর যখন মশার দশা পড়ে তখন কে বা তারে মনে রাখে? নইলে রাধাগোবিন্দর কথাও তো সুহাসিনীর মুখে একবার উঠলো না।

সায়েবগঞ্জে সেই যে সুহাসিনীর সঙ্গে অনেকদিন পরে সাহিত্যের কল্যাণে দেখা হলো সেখানে যথাসময়ে আবার ফেরা যাবে। এখন এই মুহূর্তে যৌবনের সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাল লাগছে, যখন কলেজে পড়ছিলাম।

আমার মনে তখন বিন্দুমাত্র সুখ নেই। যৌবনের যা ধর্ম তা এখন আমার ধারে কাছে আসতে সাহস পায় না, আমার তখন একমাত্র চিন্তা কীভাবে টাকা রোজগার শুরু করা যায়। উপার্জন ছাড়া আমার

মা এবং ভাইবোনেদের কী অবস্থা হবে তা ভাবতে আমার গা শিউরে উঠছে।

রাধাগোবিন্দর মুখেই অনেকবার শুনেছি,

"সঙ্গ দোষে
লোহা ভাসে।"

ব্যাপারটা কীভাবে হয় তা রাধাগোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেছি।

"ওরে মূর্খ," রাধাগোবিন্দ ব্যাখ্যা করেছে, "কাঠের সঙ্গে সঙ্গ করলে লোহাও ভাসবে—যেমন আমার মতো ফচকের সঙ্গে মিশে তুইও ফচকে হয়ে যেতে পারিস।"

রাধাগোবিন্দ তখন বাড়ি থেকে পয়সা পেতো বেশ। জোর করে আমাকেও মাঝে-মাঝে রেস্তোরাঁয় অথবা কফি হাউসে নিয়ে যেতো। সঙ্গে অবশ্যই থাকতো সুহাসিনী। বলাবাহুল্য, সুহাসিনীর সঙ্গে পরিচয়ের গল্পটা আমিই রাধাগোবিন্দকে বলেছিলাম। রাধাগোবিন্দ প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, ভেবেছে আমি গল্প বানাচ্ছি।

একদিন সুযোগ বুঝে দিলুম দু'জনের আলাপ করিয়ে। রাধাগোবিন্দ ভয় পাচ্ছিল, আমি না ওকে বিপদে ফেলে দিই। আমি তা করিনি। শুধু বলেছি সুহাসিনীকে, "আমার বন্ধু রাধাগোবিন্দ শিকদার—বিখ্যাত রাধানাথ শিকদারের বংশধর। এই বন্ধুও হাওড়ায় থাকে। যদি কখনও কোনো অসুবিধায় পড়েন এবং আমার খোঁজ না পান তাহলে এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।" আমাদের ছাত্রজীবনের সেই অধ্যায়ে কথায়-কথায় আন্দোলন হতো। আচমকা ট্রাম বাস বন্ধ হওয়া রেওয়াজ চলেছে তখন।

"পাড়ার গয়লাকে বিশ্বাস করবেন তবু এই শ্রীমানের কথা খাঁটি বলে ধরে নেবেন না!" রাধাগোবিন্দ আমার সম্বন্ধে রসিকতা করে সুহাসিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। "প্রথমতঃ রাধানাথ শিকদারের বংশধর নই আমি, ওঁদের সঙ্গে লতায় পাতায় একটা সম্পর্ক আছে এই পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত ট্রাম বাস বন্ধ হলে, ওই শ্রীমান থাকলেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, তাতে আপনার ক্ষতি হবে না!"

তারপরে ওদের দু'জনের মধ্যে জানাশোনা বেড়ে গিয়েছিল। কারণ ওই ছেঁড়া চটি পর্ব। ওরা দু'জনে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরছিল—এমন সময় পটাং করে সুহাসিনীর চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়লো। কাছাকাছি কোথাও মুচি নেই, কিন্তু রাধাগোবিন্দ বুদ্ধি করে ওকে নিয়ে বাসে উঠে পড়লো। সেখানেও বিপত্তি। পেট্রোলের গন্ধে লেডিজ সীটের এক মহিলা ব

করে ফেললেন। সেই বমির গন্ধে সুহাসিনীও বমি করে ফেলে এমন অবস্থা। তখন বাধ্য হয়ে ওরা আবার বাস থেকে নেমে পড়লো। তারপর রাধাগোবিন্দর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। পকেটে বই কেনবার কয়েকটা টাকা ছিল। সেই টাকা নিয়ে প্রায় জোর করেই সুহাসিনীকে সঙ্গে করে বাটার দোকানে ঢুকে সঙ্গিনীকে নতুন চটি পরিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে এলো।

পরের দিন সুহাসিনী সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিল রাধাগোবিন্দকে এবং সেই সঙ্গে চটির টাকাটা ফেরত পাঠিয়েছিল।

সেই খবর গোপনসূত্রে পেয়ে তমোনাশের কী দুঃখ! তমোনাশ তখন সুতপার মন জয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে নেই। তমোনাশ আকারে একটু ছোট, সে কফি টেবিলে দুঃখ করে বললো, "তুমি তো মাঠে নেমেই চটির গোল করলে। আমার যে কী অবস্থা হবে!"

"তোমার কোনো চিন্তা নেই! শাস্ত্র বলছে, বেঁটেরা ভীষণ স্ত্রী ভক্ত হয়!"

সঙ্গে-সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল তমোনাশ। রাধাগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ যে ছড়া কেটেছিল তা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি আসে—

"নুন টুকটুকি লেবুর রস
গেঁড়া ভাতার মাগের বস!"

ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছিল তমোনাশ। রাধাগোবিন্দর উত্তর: "শত শত বছর আগে গ্রামের বৃদ্ধারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলেছেন। আমার ওপর রাগ কেন বাছা? আমি কী বানিয়ে বলছি? আমি নিজের কানে দিদিমার মুখে এই ছড়া শুনেছি!"

তমোনাশ এর কিছুদিন পরে তপতীর ভালবাসায় গদ-গদ। একদিন সে বন্ধুদের শুনিয়েছে, তপতী তাকে দেখে বাস থেকে নামার সময় মিষ্টি হেসেছে।

রাধাগোবিন্দ সঙ্গে-সঙ্গে বললো, "ওই হাসি উপভোগ করছো করো। কিন্তু ঋষিবাক্য মনে রেখো:

নদীর ধারে চাষ, বালুর ধারে বাস
সু অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস
এর ওপর যার বিশ্বাস,
তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস।"

তমোনাশের তখন মিষ্টি হাসিতে মন এতই নরম যে রাগ করেনি

সে, বরং আমাদের হু'জনকে কফি খাইয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "ভগবান করুন, সময় আসুক, তখন সুহাসিনীকে যদি এই ছড়াটা আমি না শুনিয়েছি তো আমার নাম তমোনাশ নয়।"

"তোর ভাল করতে গিয়ে কীল খেলাম।" রাধাগোবিন্দর উত্তর। "এই তুঃখেই গ্রামের কবি বলেছেন :

বুনলাম ধান, হলো তিল.
ফললো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কীল!"

আমি বললাম, "ওসব কথা ছাড়ো। তপতীর মন তমোনাশ ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছে। ভাবভঙ্গীতেই তো বোঝা যাচ্ছে।"

কপট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো রাধাগোবিন্দ :

"বেল পাকিলে কাকের কি,
ঠোকরাইলে তার পাইবে কী?"

লজ্জা পেয়ে তমোনাশ বললো "তোরা যা ভাবছিস তা মোটেই নয়। তপতীর সঙ্গে আজ শুধু পড়াশোনার কথা হলো।"

রাধাগোবিন্দ এই সুযোগ হেলায় হারালো না। নিরীহ গোবেচারার মতো সামান্য সুর দিয়ে বললো,

"মন আছে যার কেয়া বনে
কী করবে তার কেত্তনে?"

তমোনাশ স্বীকার করলো, "কী হবে ভাই? আজকাল কিছুই ভাল লাগে না আমার।"

রাধাগোবিন্দ হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদকের ভঙ্গীতে বললো, "কিছু ভেবো না ব্রাদার—

যদি হরি পদে থাকে মন
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।"

আমার দুঃখ তখন বাড়ছে। কিন্তু অসংখ্য দুঃখের মধ্যেও রাধাগোবিন্দ ও সুহাসিনীর সান্নিধ্য আমার ভাল লাগতো।

আমি তখন বুঝতে পারছি ছাত্রজীবনের বিলাসিতা আমার শেষ হতে চলেছে। বেশীর ভাগ সময় আমি টিউশনি করি। কলেজে এসেও আমি চাকরির খোঁজ করতে বেরিয়ে যাই। কোথাও কোনো ফল হয় না, বাঙালীর চাকরির বাজার চিরকালই খারাপ। চেনাজানা না-থাকলে এ-শহরে কেউ কাউকে অন্ন সংস্থানের সুযোগ করে দিতে চায় না।

রাধাগোবিন্দই আমার দুঃখ কিছুটা বুঝতো। আমাকে বলেছিল,

"এই শহর সম্বন্ধে একখানা ঢাকাই প্রবাদ শুনে রাখ, মনে বল পাবি।

মাটি, বেটি, মিথ্যেকথা
এই তিন নিয়ে কলকাতা।"

রাধাগোবিন্দ ও সুহাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণেও মাঝে-মাঝে যোগ দিয়েছি আমি। কলকাতার কত অঞ্চল আমরা তিনজনে এক সঙ্গে চষে বেড়িয়েছি।

পৃথিবীতে যত রকম বিষয় আছে ততরকম আলোচনা হয়েছে আমাদের মধ্যে। সুহাসিনীর নিজের পছন্দ সিনেমা এবং গান। আর রাধাগোবিন্দ ডুবে থাকতো নতুন-নতুন প্রবাদ ও ছড়ার সন্ধানে। তিন দিনের ছুটিতে সে একবার দিদিমার ওখানে ঘুরে এলো।

সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলো, "দিদিমা এবার নাতিকে কী দিলেন?"

"অনেকগুলো ছড়া!" নাতির উত্তর। নতুন ছড়া পেলে রাধাগোবিন্দর আনন্দের শেষ থাকে না।

নতুন সংগৃহীত ছয়েকটা প্রবাদ আমাদের শুনিয়ে দিলো রাধাগোবিন্দ। সে বললে, "সোজা সরল বক্তব্য—কিন্তু এই গ্রাম্য বচনের মধ্যে অনেক বড়-বড় সত্য লুকিয়ে আছে। যেমন বৃদ্ধা মায়ের দুঃখ—

বেটা বিওলাম
বউকে দিলাম।
ঝি বিওলাম
জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী
পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি।

বাঙালী মায়ের দুঃখ এর চেয়ে সুন্দরভাবে কোথাও প্রকাশিত হতে দেখেছিস?"

বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে রাধাগোবিন্দ এবার বললো, "মানুষের স্বার্থ কী রকম শোনো, সুহাসিনী—

নেবার বেলায় পরিপাটি
দেবার বেলায় ফাটাফাটি।"

সুহাসিনী বললো, "স্বার্থপরতা সম্পর্কে আমার মা একটা ছড়া কাটেন:

নিতে পারি, খেতে পারি
দিতে পারি না।

বইতে পারি, কইতে পারি
সইতে পারি না।"

সেবার সুহাসিনী তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গেলো। ক'দিন কলেজ কামাই হলো। বেশ কয়েকদিনের ব্যবধানে রাধাগোবিন্দর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। বেড়াতে বেরিয়ে সুহাসিনী বললো, "এতো রাগের কী আছে? কোনারক থেকে চিঠি তো দিয়েছি।"

রাধাগোবিন্দর উত্তরটা সুহাসিনী কোনদিন ভুলতে পারে নি:

"চিঠিতে কি পুরে মন বিনা দরশনে?
শিশিরে কি ভিজে মন বিনা বরিষণে?"

সুহাসিনীকে বিদায় দিয়ে আমি ও রাধাগোবিন্দ সেদিন আরও অনেকক্ষণ গল্প করেছি। রাধাগোবিন্দ বলেছে, "কী যে করলি তুই! কেন সুহাসিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি?"

"ভালই তো, খারাপ কী?" আমি সরল মনেই রাধাগোবিন্দকে বলি।

রাধাগোবিন্দ উত্তর দিলো, দিদিমার খাতায় লেখা আছে:

"প্রেমের এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেন চুণ,
বেশী হইলে পোড়ে গাল,
কম হইলে লাগে ঝাল।"

আমি বললাম, "কাল সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা করে দিদিমার কোটেশনটা শোনাস। ও নিশ্চয় এনজয় করবে এবং তোর বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে।"

রাধাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে শোনালো, "না হে ব্রাদার, দিদিমা বলেছেন প্রেমের ব্যাপারে সংযমের প্রয়োজন—

অতি-প্রণয় যেখানে
নিত্যি যাবে না সেখানে।
যদি যাও নিত্যি
ঘটবে একটা কীর্তি!"

তমোনাশ ও তপতী সম্পর্কে একটা গোপন খবর ছিল। তমোনাশকে পথে বসিয়ে তপতী এখন অন্য একটি বখাটে ছেলের সঙ্গে প্রায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে। "তপতীর কপালে যে দুঃখ আছে তা আমি সহজেই আন্দাজ করতে পারছি।"

রাধাগোবিন্দ আমাকে বকুনি লাগালো। পরচর্চা, পরনিন্দায়

নিজেকে নিযুক্ত করিস না। ভালবাসার পথ বড়ই জটিল বহুবছর আগে পণ্ডিতরা বলে গিয়েছেন—

যার সঙ্গে যার ভাব
মধু থুইয়া খায় গাব।"

রাধাগোবিন্দ এরপর নিজেই হাসতে শুরু করলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোর পড়াশোনা কী রকম হচ্ছে রাধাগোবিন্দ?"

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে রাধাগোবিন্দ বললো, "আমার বর্তমান অবস্থা সেই গাঁয়ের মোড়লের ছেলের মত যে তার মাকে বলেছিল :

কিঞ্চিৎ লিখণং
বিবাহের কারণং;
অধিক লিখনং,
বিদেশে মরণং!

সেই না শুনে মায়ের চোখে জল। 'রক্ষে করো বাপধন! বেশী লেখালিখি করো না।' কোন মা বিদেশে ছেলের মৃত্যু হোক চাইবেন?"

এই সময় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার জীবনের এক পর্বের শেষ হলো। ছাত্রজীবনে আমাকে ইতি টানতে হলো। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় আই-এ পরীক্ষা দিতে পেরেছি এই যথেষ্ট।

পরীক্ষায় বসবার আগেই সারাক্ষণ আমি চিন্তা করতাম কী ভাবে একটা চাকরি জোগাড় করা যায়? কোনো উপায় তখন মাথায় আসতো না। এক একবার ভেবেছি, রাধাগোবিন্দ এবং সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু সঙ্কোচ হয়েছে। তাছাড়া ওরা কী ভাবে জানবে কলকাতায় কী করে চাকরি জোগাড় করতে হয়?

শেষে এক সময় বুক ঠুকে আইজ্যাক পিটম্যানের একটা শর্টহ্যাণ্ড বই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেট থেকে কিনে নিয়েছি। শুরু হয়েছে আমার সাধনা। দিন রাত জেগে, রেকর্ড সময়ে আমি শর্টহ্যাণ্ড কিছুটা আয়ত্ত করেছি। কিন্তু মফস্বল ইস্কুলে বাংলা মাধ্যমে যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছে তারা বোতাম টিপলেই চৌকশ স্টেনো হয়ে ওঠে না। তার জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম।

কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে তালিম দেবার মতো সময়ই বা কোথায় আমার? এই সময়ে যে ব্যাঙ্কে আমাদের ব্যাঙ্কের আধুলি জমা ছিল তাও লাটে উঠলো। নাথ ব্যাঙ্ক আমাকে সত্যিই অনাথ করলো। তখন প্রায় অনাহারের অবস্থা। অবস্থা আরও সঙ্গীন হতো যদি বিবেকানন্দ ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় আমাকে দয়া না করতেন। তিনি জানতেন আমি কী রকম লাজুক। রাধাগোবিন্দর ছড়ায় যতই বলুক অভাবে স্বভাব নষ্ট, দেখেছি দরিদ্র অবস্থায় মানুষের আত্মসম্মান-বোধ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। একটুতেই গরীবের মনে বেশী আঘাত লেগে যায়।

হেডমাস্টারমশায় আমার প্রকৃতি ভালভাবেই জানতেন, তাই আমাকে ডেকে যখন চাকরির প্রস্তাব করলেন তখন যেন দায়টা ওঁরই। আমার সাহায্য ছাড়া যেন বিবেকানন্দ ইস্কুল আর এক-পা এগোতে পারবে না, সুতরাং আমাকে কাজে যোগ দিতেই হবে।

হেডমাস্টারমশায় সব জেনেশুনেও আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন তার তাৎপর্য তখন না বুঝলেও জীবনের এই অপরাহ্নবেলায় তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করি। হেডমাস্টারমশাই আজ নেই, থাকলে ভাল হতো। তাঁর পায়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসতাম। অমন স্নেহে আমাকে নিষ্করুণ পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের আশ্রয় দেবার চেষ্টা না-করলে আমার সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো হয়তো সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হতো।

অন্ন জুটছে। তবু অভিমান জমে উঠেছিল বুকের মধ্যে। ইস্কুল-কলেজের বন্ধু-বান্ধবী কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছা হয়নি। জীবনের রাজপথ ধরে সাফল্যের দিকে যারা দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাদের সঙ্গে ব্যর্থ মানুষদের যোগাযোগের কী বা প্রয়োজন? চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়াই আমাদের মতো মানুষের প্রয়োজন।

হারিয়ে যেতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু সংসারে এমন বন্ধুও হয় যারা বন্ধুর সাফল্যের মাপজোক নিয়ে ব্যস্ত হয় না। তারা তুমি বি-এ এম-এ কী পাশ করেছো কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যারা একদিন সহপাঠী ছিল তাদের সকলের সঙ্গে চিরকালের সম্পর্ক রাখতে তারা আগ্রহী। রাধাগোবিন্দ শিকদার আমার এমনই একজন বন্ধু।

যখন রাধাগোবিন্দ শুনলো আমার পক্ষে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয় তখন সে খুব দুঃখ পেলো। কিন্তু মুখ ফুটে আমাকে কিছুই বললো না। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সে আমার বাড়িতে চলে আসতো। আমরা দু'জনে পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়তাম এক একদিন এক এক পথ ধরে।

আমার খুব লজ্জা করতো প্রথম দিকে। আমি এখন একজন ব্যর্থ প্রাক্তন-সহপাঠী। আমার কোনো পরিচয় নেই, আর আমার বন্ধু-বান্ধবীরা বি-এ ক্লাশের ছাত্র। তাদের কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার হবে. কেউ হয়তো আই-এ-এস হবে। বিশ্বের সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার তাদের জন্যে এখনও খোলা রয়েছে, আর আমি কমপ্যাশনেট গ্রাউণ্ডে চাকরি পাওয়া একজন স্কুল মাস্টার। আমি স্টেনোগ্রাফি শিখেছি, যাতে কোনো ছোট্ট অফিসের অন্ধকার কোণে একখানা ভাঙা টাইপ মেসিন নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা বছর কাটিয়ে দিতে পারি।

রাধাগোবিন্দর হৃদয় ছিল স্নেহময়। কলেজের পড়াশোনা সম্বন্ধে প্রায় কোনো কথা সে তুলতো না, আমারও জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হতো। খুরুট রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা তখন ছড়ার খেলা খেলতাম। রাধাগোবিন্দর সংগ্রহ করা ছড়া নানা বিষয়ে আমার দৃষ্টি খুলে দিতো।

রাধাগোবিন্দ বলতো, "ইংরিজী অনেক প্রবাদের নিজস্ব বাংলা গ্রামে গঞ্জে ছড়ানো আছে, এদেশে ইংরিজী আসবার অনেক আগে থেকে। অর্থাৎ সব দেশেই দূরদর্শী মানুষরা একই রকম চিন্তা করেছেন।"

আমি এদেশের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অতখানি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে পারতাম না। তখন রাধাগোবিন্দ প্রমাণ দিতো।

দাঁতে বড় এলাচ চিবোতে-চিবোতে রাধাগোবিন্দ বলতো "যেমন ধর—'নো রোজ উইদাউট থর্নস্'। দিদিমার ভাষায়—

কণ্টক বিনা কমল নাই
কলঙ্ক-শূন্য চন্দ্র নাই।"

আমি বললাম, "মর্নিং শোজ দ্য ডে? এর ছড়া আছে? তবে বুঝি বাঙালীর বিদ্যে আছে।

"অবশ্যই আছে।" রাধাগোবিন্দ তড়াক করে তৎপর হয়ে উঠলো:

"যার না হয় নয়ে
তার না হয় নব্বুইয়ে।"

"লিট্‌ল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং?" আমিএবার জিজ্ঞেস করি।

রাধাগোবিন্দ পিছোবার পাত্র নয়। সে বললো, "বাংলাটা ইংরাজী থেকেও ভাল—

না-বুঝে ছিলাম ভাল
অর্ধেক বুঝে পরাণ গেলো।"

এবার রাধাগোবিন্দর উইকেট নেবার স্পেশাল চেষ্টা করলাম, "নো

পেন্‌স উইদাইট পেন্‌স ?" এইসব ইংরিজীগুলো আমাদের হিমাংশুবাবু স্যর অনেক যত্নের সঙ্গে ইস্কুলে শিখিয়েছিলেন।

একগাল হেসে রাধাগোবিন্দ আর একটা বাউণ্ডারি করলো। "শোন, গাঁয়ের মেয়েরা কী বলে—

পরিতে হবে শাঁখা
তবে কেন মুখ বাঁকা ?"

মরীয়া হয়ে রাধাগোবিন্দর দিকে আর একটা বল ছুঁড়লাম। "হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে ?"

রাধাগোবিন্দ আমার মুখের দিকে তাকালো। কারণ সে জানে আমার ডায়রির আষ্টে-পৃষ্ঠে আমি ওই কথাটাই লিখে রাখি।

রাধাগোবিন্দ বললো, "এর বাংলাটাও বেশ ভাল—

যেখানে বাসনা-রথ
সেখানে সিদ্ধির পথ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো রাধাগোবিন্দ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তুই কি বিশ্বাস করিস যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে পথও আছে ?"

"হিমাংশুবাবু স্যরের মুখে যখন কথাটা প্রথমে শুনেছিলাম তখন থেকে বিশ্বাস করেই এসেছি। স্যর তো মিথ্যে কথা বলতেন না। কিন্তু এখন কথাটা বিশ্বাস হয় না ভাই। তবু এই কথা বছরের পর বছর চালু থাকবে, তুই দেখে নিস রাধাগোবিন্দ। কারণ ওইটুকু বিশ্বাস না-থাকলে মানুষ কী ভাবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ?"

কী ভেবে রাধাগোবিন্দ বললো, "যে সব কবিতা তোকে বলি সেগুলো মনে রাখিস। তুই একদিন এসব হয়তো কাজে লাগাতে পারবি।

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছে। আমি ইতিমধ্যে পয়সার প্রয়োজনে ইস্কুল ছেড়ে এক মাড়োয়ারি কোম্পানীতে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং-এর কাজ করছি। চাকরি থাকবে কিনা জানিনা, কিন্তু হেডমাস্টার মশায় সাহস দিলেন, "তিরিশ টাকা মাইনে বেশী যখন তখন নিয়ে নাও। তেমন কিছু হলে ইস্কুলে আবার ফিরে আসবে।"

নতুন অফিসে আমি কাজ করছি। পাট এবং গানি ব্যাগের ফাটকার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে আমার। আমি রাধাগোবিন্দকে বলেছি, "যাদের একমাস মাইনে না-পেলে চলবে না, তারা আমার মতো সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স খোঁজে। আমি ভাগ্যবান, হেডমাস্টার মশায়কে পেয়ে গিয়েছি।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "সনৎবাবু স্যর একবার বলেছিলেন যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করেও যে কোনো জায়গাতেই পৌঁছনো যায়। এই ফটফট টাইপ থেকেই তুই হয়তো স্পেশাল কোনো জায়গায় পৌঁছবি।"

আমি কথা বাড়াইনি, কারণ চোখের জল চেপে রাখা হয়তো কষ্টকর হবে। আমি বললাম, "যাদের বর্তমানই নেই তাদের আবার ভবিষ্যৎ। ওসব কথা থাক, তুই বরং দু'একটা গ্রাম্য ছড়া বল। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, গ্রাম্যপ্রবাদে কিছু বক্তব্য আছে। মানুষকে অনেক নির্ভেজাল জ্ঞান দেয় তোর সংগ্রহগুলো।"

রাধাগোবিন্দ শোনালো :

"বিপদ যখন আসে, তখন উড়ে আসে
যায় যখন, যায় পা ঘষে ঘষে।"

"গরীব মায়ের সম্বন্ধে যদি কোনো ছড়া থাকে তো একটু ছ্যাখ," আমি রাধাগোবিন্দকে অনুরোধ করি।

"সে আর এমন কি শক্ত! বাঙালী মায়ের অন্ধ সন্তানস্নেহের কথাই শুনেছিস, কিন্তু মা ইচ্ছে করলেই যে কড়া হতে পারেন তার প্রমাণও ছড়ায় রয়েছে :

বয়স্ক ছেলে যদি করে বাপের অন্ন ধ্বংস
বাড়ি হইতে তাড়াও তারে পৃষ্ঠে মারিয়া বংশ।"

"আরও একটু হাসা, রাধাগোবিন্দ। মার্চেন্ট অফিসে ন'টা পাঁচটা পাটের গাঁটের ডেসক্রিপশন টাইপ করা যে কী যন্ত্রণা তা যদি জানতিস!"

রাধাগোবিন্দ হেসে বললো, "সেই গাইয়েকে স্মরণ কর, যাকে দেখে লেখা হয়েছিল—

কী করবে কীর্তনীয়া লয়েছে বেতন
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম তাই উলুবনে কেত্তন!"

আমার মুখে বোধহয় একটু হাসি ফুটেছিল। রাধাগোবিন্দ তাই দেখে খুশী। সে বললো, "শোন বউ আর ননদ নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। ননদকে কুমীরে নিয়ে গেলো। এতো বড়ো ব্যাপার, কিন্তু নিজের দায়িত্বটি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বউ কায়দা করে ইনিয়ে-বিনিয়ে শাশুড়ীকে রিপোর্ট দিচ্ছে যেন কিছুই হয়নি—

ভাল কথা মনে পড়লো আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ!
জলের ভিতরে তোমাদের কি কুটম আছে?"

এই ভাবে আরও কিছুদিন চলেছে। রাধাগোবিন্দ আমাকে ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না।

সুহাসিনীর খবর জিজ্ঞেস করেছি তাকে। ওরা দু'জনে তখনও একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

আমার কথা শুনে রাধাগোবিন্দ বললো, "আমার সম্বন্ধে সুহাসিনীর বর্তমান মনোভাব—

যারে রত্নভেবে যত্ন করি চিরদিন
কে জানে সে গিল্টি-করা ভিতর ভরা টিন।"

"ইয়ারকি রাখ," আমি বকুনি দিয়েছি রাধাগোবিন্দকে।

"সুহাসিনী মেয়েটি বেশ ভাল। ওকে কখনও কষ্ট দিস না," আমি রাধাগোবিন্দকে সাবধান করে দিয়েছি।

কিন্তু তখন কে জানতো যে ভবিষ্যতের গর্ভে সুহাসিনীর জন্যে অনেক কষ্ট লুকানো আছে? সুহাসিনীর চিঠি রাধাগোবিন্দই একদিন বয়ে নিয়ে এসেছে, সে লিখছে, "আপনার বন্ধুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে—চিঠিতে কি পুরে মন বিনা দরশনে?" অনেকদিন দেখা হয় না, তাই একদিন দেখা করবার প্রস্তাব দিয়েছে সুহাসিনী।

কিন্তু আমার দেখা করার মুখ নেই। আমি ওদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছি। রাধাগোবিন্দকে আমি জানিয়েছি, "চিঠিতে লিখবো না, সুহাসিনীকে বলিস, আবার দেখা হবে যখন পড়াশোনা শেষ করে, কেষ্টবিষ্টু হয়ে তোরা দু'জনে ঘরসংসার পাতবি। তখন হয়তো আমাকে নেমন্তন্ন করার কথাই তোদের মনে থাকবে না।"

রাধাগোবিন্দ একটু লজ্জা পেলো, বললো, "গাছে কাঁঠাল না দেখেই তুই গোঁফে তেল লাগাতে শুরু করলি! সুহাসিনীকে আমি সামান্য একটু জানি এই পর্যন্ত। পড়াশোনা নিয়ে আমরা দু'জনেই ব্যতিব্যস্ত।"

রাধাগোবিন্দর শেখানো ছন্দে আমি উত্তর দিলাম, তুইতো বলেছিলি—

পেটে ক্ষুধা, মনে লাজ
সেই পিরীতে কোন কাজ?"

পাছে রাধাগোবিন্দ রেগে ওঠে তাই বললাম, "সুহাসিনীর সঙ্গে তোর ভবিষ্যতটা আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, রাধাগোবিন্দ।"

ফচকে রাধাগোবিন্দ বলে উঠলো—

"এত সুখ যদি কপালে
কাঁথা কেন তব বগলে?"

এই লাইন দুটো আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। জীবিকার সন্ধানে যেখানেই চাকরি নিতে যাই সেখানেই মানুষের সঙ্গে ভাব হয়। সর্বত্রই দেখেছি ভাগ্যকে জানবার চরম কৌতূহল। অফিসের কোণে কোণে কাউকে না কাউকে একজন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাণী দিচ্ছেন। জুট অফিসেও একজন আমার হাত দেখে বললেন, "আপনি তো এখানে থাকবার লোক নন। আপনার ভাগ্য ভাল মশাই।"

আদালতী পাড়ায় পরবাসীয়া জামদার পেটের দায়ে, বাড়তি পয়সা রোজগারের জন্য মাঝে-মাঝে রাস্তায় হাত দেখতে বসতো। আমার কাছে পয়সা না নিয়েই সে বলেছে, আমার ভাগ্যে নাকি অনেক সুখ আছে। প্রতিবারই আমি রাধাগোবিন্দর কথাটা পুনরাবৃত্তি করতাম—

এতো সুখ যদি কপালে
কাঁথা কেন তব বগলে ?

ঈশ্বর ইচ্ছে করে আমাকে কষ্টে ফেলেছেন। আমার দায়দায়িত্বের বোঝা হাল্কা হতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু রাধাগোবিন্দ শিকদারের বগলেও যে কাঁথা উঠবে কোনোদিন তা আমার হিসেবে ছিল না।

আমি তখন ভাবছি, ওদের বি-এ পাশের সময় এসে গেলো। তারপর দুটো বছর এম-এ পড়া। তারপর রাধাগোবিন্দ ছোটবেলার এভারেস্ট চূড়ায় ওঠার স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু ভাল কাজ করুক। ইতিমধ্যে এভারেস্টের মাথায় হিলারী এবং তেনজিং উঠে পড়েছেন। ওখানে রাধাগোবিন্দ শিকদারের প্রথম হবার সুযোগ নেই। এখন বরং ভালভাবে এম-এ পাশ করে রাধাগোবিন্দ আই-এ-এস হোক।

আমি ওকে বলেছি, "তোর কথা জানি না, কিন্তু সুহাসিনীকে ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়াইফ হিসাবে চমৎকার মানাবে! তুই কিন্তু ব্যাপারটা উড়িয়ে দিস না।"

পরে মনে হয়েছে এসব কথা রাধাগোবিন্দকে বলা আমার উচিত হয়নি। বেচারা কোনো কথা ভোলে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাধাগোবিন্দ যে একটা বিরাট ব্যঙ্গ হয়ে উঠবে তা কে জানতো ?

রাধাগোবিন্দ অবশ্য দুঃখের মুহূর্তেও নিজের রসবোধ হারায়নি। আমার কথা শুনে একদিন সে বলেছিল, "তুই অযথা চিন্তা করিস না—

যার নাই মান
তার আবার অভিমান !"

নিজের দুঃখ ভুলবার জন্যে রাধাগোবিন্দ এরপর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত কষ্ট ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে সে বলেছিল :

"মনরে শখ কর
পয়সা নাই, কর্জ কর।"

আমি সেবার সব কথা রাধাগোবিন্দকে মুখে বলতে পারি নি। চিঠিতে লিখেছিলাম, "ভাই রাধাগোবিন্দ, ঘরপোড়া গোরু হিসেবে তোকে কি নতুন কথা শোনাবো? আমাকে চরম দুঃখের মুহূর্তে যা বলেছিলি আমি তাই তোকে আবার শোনাই—

যে সয়
সে রয়।"

রাধাগোবিন্দর ভাগ্যবিপর্যয়ের সেই ছবিটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। মে মাসের কোনো সময়, যখন সমস্ত কলকাতা দারুণ তাপে ফাটছে, তখন রাধাগোবিন্দর কপাল পুড়লো। বি-এ পরীক্ষা শুরু হবার কয়েক দিন আগেই রাধাগোবিন্দর বাবা হঠাৎ দেহরক্ষা করলেন।

যখন খবর পেয়েছি তখন বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ সব শেষ। রাধাগোবিন্দর সৎ মা এক ঘরে বসে কাঁদছেন, আর রাধাগোবিন্দ পাথরের মতো বসে আছে। ওর ছোট ভাই সংসারে কী হয়েছে তা পুরোপুরি না বুঝে বল খেলায় মত্ত হয়ে আছে।

রাধাগোবিন্দর বর্তমান অবস্থা এবং কয়েক বছর আগে আমার অবস্থা প্রায় এক। শুধু তফাতের মধ্যে এ-বাড়িতে যারা পিতৃহীন হয়েছে তারা রাধাগোবিন্দর বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, আমার মতো নিজের মায়ের ছেলেমেয়ে নয়। রাধাগোবিন্দর দুটি ভাই এবং তিনটি বোন।

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক কি রকম তাও আমার জানা নেই। দু' একবার মনোমালিন্য হওয়াটা আশ্চর্য নয়।

রাধাগোবিন্দকে নিয়ে আমি বাড়ির বাইরে চলে এলাম। তার আগে আমাকে দেখে সে বলেছিল, "তুই এলি?"

"কেন? আসবো না কেন?" আমি একটু বকুনি লাগাই বন্ধুকে।

রাধাগোবিন্দ বললো, "অনেকেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে।"

মনে-মনে বললাম, "সে কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। বাবা যখন চলে গেলেন তখন আমার নিকট আত্মীয়রা ভয়ে পথ মাড়াতেন না। প্রথম-প্রথম দুঃখ হতো, অভিমান হতো, রাগ হতো, কিন্তু তারপর সব সয়ে গিয়েছিল। এখনও আমাদের বাঁচার লড়াই চলছে, কিন্তু কোনোক্রমে আমরা খেতে পাচ্ছি। এখন আমি টিউশনি করি, অফিসে চাকরি করি। অফিস আওয়ারের বাইরে অন্যত্র

কাজ করেও দু' পয়সা রোজগার করি।"

এই একই দিনে দু'বার চাকরির একটা ইংরিজী নাম আছে—'মুন শাইনার'—চাঁদের আলোয় যারা শোভা পায়। অর্থাৎ যারা চাঁদ ওঠবার পরেও কাজ করে। বড়তলা স্ট্রীটে দুখানা কোম্পানীতে আমি কাজ করতাম সন্ধ্যাবেলায়। আমাদের সহকর্মী ছিলেন অম্বিকা চট্টরাজ। তিনি শনি রবি মিলিয়ে চার জায়গায় চাকরি করতেন, বাড়ি ফিরতেন শেষ ট্রেনে। মাসে দু-তিন দিন ট্রেন মিস করে সারারাত স্টেশনে বসে থাকতেন। স্ত্রীকে বলা ছিল, বাড়ি না ফিরলে চিন্তা কোরো না। মনে রেখো, খবর না থাকা মানেই ভাল খবর, খারাপ খবর হলে ঠিক জানতে পারবে।

অম্বিকা চট্টরাজকে দেখতাম আর ভাবতাম, এর পরেও বাঙালীর কর্মবিমুখ বলে বদনাম!

অম্বিকাবাবু কাজকে ভয় পেতেন না। সারাক্ষণ হাসিখুশী থাকতেন। বলতেন, "বাপের দুটি, নিজের তিনটি—মোট পাঁচটি মেয়েকে পার করতে হবে। কিন্তু কারও কাছে মাথা নোয়াবে না এই অম্বিকা চট্টরাজ।"

যা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল তাকেই ক্রমশ সম্ভব করে তুলছিলেন অম্বিকাবাবু। পয়সা বাঁচাবার জন্যে পাঁউরুটি ছাড়া কিছুই খেতেন না ভদ্রলোক। সঙ্গে পকেটে করে বাড়ি থেকে চিনির পুরিয়া আনতেন। বলতেন, "কম পয়সায় বেস্ট খাবার। ইংরেজ শালারা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে, কিন্তু এই পাঁউরুটি উপহার দেবার জন্যে ওদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া যায়।"

অম্বিকাবাবুকে দেখতাম এবং আমি অনুপ্রেরণা পেতাম। ভদ্রলোক সব সময় সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাতায়াত করতেন। পয়সা বাঁচাবার জন্যে অম্বিকাবাবু আবার মাসিক কুপন কিনে নিতেন। তাতে আরো কিছু সাশ্রয় হতো।

আমি একদিন রাধাগোবিন্দকে চায়ের দোকানে নিয়ে এলাম। যে-রাধাগোবিন্দ আমাকে এতোবার চা খাইয়েছে সেই দোকানে চা খেতে চায় না, লজ্জা পায়। অর্থের অভাব মানুষকে বড় দুর্বল করে তোলে।

রাধাগোবিন্দ ছড়াকাটা যেন ভুলেই গিয়েছে। সে বললো, "না ভাই, চায়ের হাঙ্গামা করিস না—বাইরে একবছর খাওয়া বারণ।"

"নেমন্তন্ন খাওয়া বারণ, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে খেতে তো হবেই। চায়ে কোনো দোষ নেই, রাধাগোবিন্দ।"

এবার রাধাগোবিন্দর সমস্ত ব্যাপারটা শুনলাম। ওর বাবা প্রায় কিছুই রেখে যাননি। ভাড়া বাড়িতে বাস। বাবার মৃতদেহের সামনে বিমাতাকে কয়েকবার অজ্ঞান হতে দেখে রাধাগোবিন্দর মাথা ঘুরতে লাগলো। "বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যতদিন আমি আছি ততদিন তোমার চিন্তা নেই। মৃতদেহ ছুঁয়ে এই প্রতিজ্ঞা না-করলে মা বোধ হয় আমার ওপর ভরসা রাখতে পারতেন না।"

অভাব-অনটন ও আকস্মিক আর্থিক বিপর্যয় বাঙালী পরিবারকে যে কতখানি নিষ্ঠুর করে তোলে তার বিস্তারিত বিবরণ বাংলাভাষায় কখনও লেখা হয় না।

রাধাগোবিন্দ বললো, "তুই তো কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিস, গল্প লেখার নেশা তোর তো এখনও আছে। তুই আমার দিদিমাকে নিয়ে একটা স্টোরি করতে পারিস। আমার মরা মায়ের মা—অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু এবারে আমাকে মামার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কী বললেন জানিস? '—দরকার হয় তুই এই বাড়িতে থেকে যা। অন্য লোকের পাথর জল থেকে তুলতে গিয়ে তুই কেন নিজের বিপদ ডেকে আনবি' ?"

রাধাগোবিন্দ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন দিদিমা নিজের নাতিকে বাঁচাবার জন্যে বললেন, "আবার বিয়ে করবার সময় তোর বাবা যাদের পরামর্শ নিয়েছিল তারা বুঝুক। তোকে-আমাকে জিজ্ঞেস করে কি সতীশ আবার ছাদনাতলায় গিয়েছিল?"

"ওদের কে আছে দিদিমা?" রাধাগোবিন্দ উত্তর দিয়েছিল।

"কেন বউয়ের বাপের বাড়ি?"

"তাদের অবস্থা আরও খারাপ। না-হলে কেউ দ্বিতীয় পক্ষে মেয়ে দেয়?"

দিদিমা বিরক্ত হয়েছিলেন। "তোর অত বুঝে কাজ নেই। তোর নিজের দুঃখ দেখে কে?" বহুদিন আগে মরে যাওয়া কন্যার দুঃখে এরপর দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। "ওরে খুকী তুই কোথায়? ছেলের কথা ভাবলি না, হতভাগী তুই চলে গেলি!"

রাধাগোবিন্দকে বলেছিলাম, "তীরে এসে তরী ডোবানো চলবে না। পরীক্ষাটা কোনোরকমে দিয়ে দে, এই দেশে গ্র্যাজুয়েটের অন্য সম্মান।"

রাধাগোবিন্দ বি-এ পরীক্ষা দিলো। কিন্তু পারিবারিক মানসিক দুশ্চিন্তায় ফলাফল মোটেই ভাল হলো না, কোনোরকমে পাশ করলো।

সে-নিয়েও রাধাগোবিন্দর মনে দুঃখ। কিন্তু আমি বললাম, "নামের পাশে শুধু লিখবি বি-এ, কত নাম্বার পেয়েছিস, কোন ক্লাশ হয়েছে, এসবের হিসেব তো কেউ চাইবে না।

রাধাগোবিন্দকে আমি এখন ভরসা দিতে চাই। সংসারের সমরাঙ্গনে তাকে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হবে। শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধে বাঙালীরা কখনই নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগের মনোবল পায় না।

চাকরির সন্ধানে রাধাগোবিন্দ অনেক ঘুরেছে। চেনাশোনা বহুলোকের আপিসেই সে তদ্বির করেছে, যেমন একদিন আমি করেছিলাম।

কোথাও একটু ভদ্র ব্যবহার আছে, কোথাও সেটুকুও নেই। কেউ দেখা না-করেই হাঁকিয়ে দেয়, কেউ সব শুনে মিষ্টি করে বলে, খবর পাঠাবো। এই খবর অবশ্য কেউ কোনোদিন এই কলকাতা শহরে পেয়েছে বলে আমার জানা নেই।

রাধাগোবিন্দ নিজে আমার কাছে আসে না। আমি নিজেই মাঝে মাঝে ছুটির দিনে খোঁজ-খবর করতে যাই। আমার দুঃখ-দিনের বন্ধু রাধাগোবিন্দ।

দুঃখ যে এতো ছোঁয়াচে তা আমার জানা ছিল না। যে আমার সঙ্গে মেশে সে কষ্ট পায় এই তো দেখে এলাম। ইস্কুলে, কলেজে কত সহপাঠী-সহপাঠিনী ছিল, যারা আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি তারা বেশ সুখে রয়েছে।—সেদিন আমার এক কলেজ বান্ধবীকে ট্যাক্সি নিয়ে প্রমোদভ্রমণে যেতে দেখলাম। কলেজে এই মেয়েটিকে আমার ভীষণ ভাল লাগতো। কিন্তু ভালবাসার বিলাসিতা আমার মতো দায়িত্বচক্রে জড়িয়ে-পড়া মানুষের জন্যে নয়, এই ভেবে মনের ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করিনি। ভালই করেছি, কিছুদিন আগে তার মনের মতো বিয়ে হয়েছে—স্বামী বিলিতি কোম্পানিতে অফিসার। আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে সে অশেষ দুঃখ পেতো। যাকে পছন্দ করি তাকে দুঃখ দিতে কে চায়?

রাধাগোবিন্দ বেচারা! সুহাসিনীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কী হলো? সুহাসিনী কী রাধাগোবিন্দর এই খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিল?

কোথায় যেন পড়েছিলাম, "এদেশে মেয়েদের বন্ধুত্ব যেন কাচের চুড়ি—তাত সইতে পারে না, ধাক্কা সইতে পারে না।" কাচের চুড়িতে দাগ পড়ে না, তার আগেই ফেটে যায়। রাধাগোবিন্দর সংগ্রহে একটা কবিতা ছিল—

"দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়,
তবুও নারীর মন পুরুষ কি পায় ?"

সুহাসিনী ইচ্ছে করলেই কি পুরুষবন্ধুদের মতো রাধাগোবিন্দর দিকে এগিয়ে আসতে পারে ? আমি নিজেও ভেবেছি। দোষটা সম্পূর্ণ সুহাসিনীর ঘাড়ে চাপানো যায় না। এদেশে মেয়েদের অবস্থাই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। মেয়েরা হয় তৈজস, না-হয় অলঙ্কার, না-হয় দায়িত্ব। মেয়েরা কখনও সহযাত্রিনী নয়।

রাধাগোবিন্দ একবার মজা করে শুনিয়েছিল :

"ফচকে-মেয়ের চুলবুলানি
জোয়ান-মেয়ের ছাতা
বুড়ো মেয়ের পুরান কথা
আধ বয়সীর মাথা।"

মেয়েদের চুলবুলানি, বুক, চুল এই সব নিয়েই বাঙালী-পুরুষের চিরন্তন ভাবনা-চিন্তা। মেয়েদের সখী হিসেবে, সঙ্গিনী হিসেবে ভূমিকা সৃষ্টির কোনো ব্যস্ততা নেই এই সমাজে। দুর্গতিনাশিনী বলে যাঁর সামনে প্রতিবছর ঘণ্টা নাড়া হয় তিনি মানবী নন, দেবী।

সুহাসিনী পুরুষ হলে নিশ্চয় এই সময় রাধাগোবিন্দর কাছে ছুটে আসতো। কিন্তু এসব আলোচনা করে লাভ নেই। রাধাগোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেছি, "সুহাসিনীর চিঠির উত্তর দিয়েছিলি ?"

"পাগল নাকি ? কথায়-কথায় অবিবাহিতা মেয়েদের চিঠি লেখা মানে তাদের বিপদ বাড়িয়ে দেওয়া। আমারও বোন আছে, আমি বুঝি।"

আমি একবার বাসে সুহাসিনীর মুখোমুখি হয়েছিলাম। সুহাসিনীকে শুনিয়ে দিয়েছিলাম, "রাধাগোবিন্দর একটু সেট-ব্যাক হয়েছিল কিন্তু আবার সব ঠিক হতে চলেছে। খুব ভাল একটা চাকরি পেয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা এবং তখন নিশ্চয়ই ওর কোনো চিন্তা থাকবে না।"

এম-এ পড়া সম্বন্ধে কী একটা কথা তুলেছিল সুহাসিনী। আমি বলেছিলাম, "মাস্টারি ছাড়া আর কোথাও এম-এ পাশের স্পেশাল সম্মান নেই। বাঘা-বাঘা আই-সি-এস এবং আই-এ-এস অফিসারদের অনেকেই কেবল বি-এ পাশ।"

"রাধাগোবিন্দ কি আই-এ-এস পরীক্ষা দেবার কথা ভাবছে ? জানতে চেয়েছিল সুহাসিনী। আমি ইচ্ছে করেই এমন এক রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করেছিলাম যে শ্যামাঙ্গিনী ওই বৈদ্যযুবতী ভাবে

পারে ভাগ্যপরিবর্তনের কোনো বিশেষ গোপন প্রচেষ্টা চলেছে এবং সেই অতর্কিত আক্রমণে দুঃখদিনের আকস্মিক অবসান অসম্ভব নয়।

আমি ভেবেছি, রাধাগোবিন্দ যদি আই-এ-এস পরীক্ষা দেয় কেমন হয়? আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকে দেখেছিলাম যিনি আত্মোন্নয়নের সঙ্গে ভাইবোন এবং মায়ের প্রতি তাঁর কর্তব্য সানন্দে পালন করছেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। রাধাগোবিন্দ এমন হতে পারবে না কেন? আমার মতন তার তো শিক্ষাগত বাধা নেই। আমার তো ইউনিভার্সিটির ছাপ নেই—রাধাগোবিন্দর আছে।

রাধাগোবিন্দ কিন্তু তখন অভাব, অনটন ও অনিশ্চয়তার পাঁকে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। "যত নড়াচড়ার চেষ্টা করছি ততই যেন নিচে নেমে যাচ্ছি আমি," রাধাগোবিন্দ একদিন আমার কাছে দুঃখ করেছিল।

"তুই আমার কাছে আসিস না কেন? আমি অভিযোগ করেছি।

"তোর নিজের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রয়েছে," রাধাগোবিন্দ শান্তভাবে উত্তর দিয়েছে।

এরপর একদিন রাধাগোবিন্দ বললো, "যার কেউ নেই তার হরি আছেন, শুনেছিলাম। ডাহা মিথ্যে কথা। যেখানে সন্দেশ বাতাসা পাবার চান্স হরি কেবল সেখানেই যান।

"তুই তো আমাকে বলেছিলি—

আগে দুখ
পরে সুখ।"

ফোঁস করে উঠলো রাধাগোবিন্দ। "একদম বাজে কথা। গাঁয়ের লোকগুলো কিছুই জানে না। যেখানে সুখ সেখানে চিরকালই সুখ, যেখানে দুঃখ সেখানে চিরকালই দুঃখ। শুনে রাখ—

টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে
হাতি দিয়ে হাতি বাঁধে।

এদেশে টাকাতেই টাকা আসে।"

আমারও মনে পড়লো, নিজে উকিল হয়েও আমার বাবা বলতেন—

"টাকা যার
মামলা তার।"

রাধাগোবিন্দ আবার ওই কথাটা তুললো। "যার কোনো সহায়

সম্বল নেই তার কেউ আছে কিনা ?”

আমি বললাম, “নিশ্চয়ই আছেন। না হলে আমরা এখনও বেঁচে আছি কী করে ? অনেকদিন আগে এক চায়ের দোকানে রেসের ঘোড়া নিয়ে ছ'জন লোকের মধ্যে প্রবল তর্ক হচ্ছিল। তখন নিরুপায় হয়ে আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম এবং এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, অসহায় মধ্যবিত্তকে ভগবান দেখবেন এমন গ্যারান্টি দিতে পারবো না। তবে গড না দেখলেও 'ম্যান' দেখেন। ছ'জন ম্যানের নাম তিনি দিয়েছিলেন, মরে গিয়েও যাঁরা অসহায়দের অশেষ উপকার করে চলেছেন। এঁরা হলেন মহাত্মা হ্যানিম্যান ও মহাত্মা পিটম্যান। যে-বাঙালীর কোনো গতি নেই সে হ্যানিম্যান পড়ে হোমিওপ্যাথি করে, না-হয় পিটম্যান পড়ে স্টেনো হয়, চাকরি একটা জুটে যায়।”

রাধাগোবিন্দ বললো, “নিয়ে আয় তোর পিটম্যানের বইখানা আজই হাতে খড়ি হোক। আমি যদি তিন মাসে স্টেনোগ্রাফার না হই তাহলে দোষ মাস্টারের।”

আমি মনে-মনে বললাম, “তিন মাসে কেউ পিটম্যান-বৈতরণী পার হতে পারে না। একটা বছর লেগে যাবে। তা লাগুক, সময় যে কত তাড়াতাড়ি কেটে যায় তা আমরা অনেকেই বুঝতে চাই না।”

রাধাগোবিন্দর শর্টহ্যাণ্ড শেখা চললো প্রবল উৎসাহে। কয়েকটা টিউশনিও আমি জোগাড় করে দিয়েছি রাধাগোবিন্দকে।

রাধাগোবিন্দ তখন ছড়া, কবিতা, প্রবাদ সব ভুলতে বসেছে। শুধু জিজ্ঞেস করে, “টাইপিং এবং শর্টহ্যাণ্ডে কত গতি হলে চাকরি পাওয়া যায় ?”

আমি বলি, “স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ ৪০-১২০। অর্থাৎ টাইপে চল্লিশ এবং শর্টহ্যাণ্ডে প্রতি মিনিট ১২০ শব্দ।”

অধৈর্য হয়ে উঠতো রাধাগোবিন্দ। “১২০ শব্দ ইংরিজীতে কত জন লোক কলকাতায় বলতে পারে ?”

“তাতে কিছু এসে যায় না, ব্রাদার। ইংরিজীর দৌড়ে যাই হোক, লোক নেবার সময় বাজিয়ে নেবে, এই তো ছুনিয়ার নিয়ম। তারপর হয়তো তার শর্টহ্যাণ্ডে মরচে পড়বে, মিনিটে দশটা শব্দ বলেই ইণ্ডিয়ান সায়েব ধন্য হয়ে যাবেন।”

পাগলের মতো শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং প্র্যাকটিশ চালিয়ে যাচ্ছে রাধাগোবিন্দ। একদিন রেগেমেগে সে বললো, “ওই লোহার যন্তরে

মিনিটে চল্লিশ স্পীড ওঠে না।"

আমি মেশিনে বসে টাইপ শুরু করলাম। মিনিটে ষাট শব্দ ছাপা হচ্ছে! রাধাগোবিন্দ বললো, "বাপরে, এ তো ঝড় তুললি! মনে হলো রামরাজাতলা স্টেশন দিয়ে বম্বে মেল পাশ করছে।"

আমি বললাম, "এ কিছুই নয়। এই মেশিনে ওয়ার্লড রেকর্ড প্রতি মিনিটে ১৭০ শব্দ। ভদ্রমহিলার নাম মার্গারেট ওয়েন!"

"মহিলা না মা দুর্গা? দশ হাতে টাইপ করেছিলেন?"

"ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে রেকর্ড হলো মিনিটে ২১৬।"

"রক্ষে করো বাপধন—ভুলেও তোর কাছে টাইপের কথা তুলবো না। কিন্তু ওই শর্টহ্যাণ্ডে ইকড়িমিকড়ি চামে চিকড়ি লিখছি আশি স্পীডে, কিন্তু পড়তে পারছি না।"

আমি বললাম, "তুই এবং আমি জন্মাবার আগে ১৯২২ সালে একজন স্টেনোগ্রাফার ভদ্রলোক মিনিটে ৩৬০ শব্দ লিখতেন। আর এক ভদ্রলোক টানা পাঁচ ঘণ্টায় ৫০,০০০ শব্দ লিখেছিলেন, অর্থাৎ গড়ে প্রতি মিনিটে ১৬৬ শব্দ।"

"লোক দুটো মরে গিয়ে বেঁচে গেলো," রাধাগোবিন্দ বলে উঠলো।

"কেন? কী হলো?"

"বেঁচে থাকলে, আমি নিজের হাতে ওদের খুন করতাম! মন্তরের চোটে ভেল্কি দেখিয়ে নিজেদের স্টেনো বলে চালাবে, তা হচ্ছে না!"

রাধাগোবিন্দর যন্ত্রণা দেখি এবং আমি কষ্ট পাই। ভাগ্যগুণে আমিও ওই দুঃখের সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি। এখন আমি মনোবল নিয়ে কাজ করতে পারি। কিন্তু রাধাগোবিন্দকে সাহায্য করার পথ খুঁজে পাই না।

সুহাসিনীর কথাও প্রায় মনে পড়ে। একবার খেয়ালের বশে রাধা-গোবিন্দর খবর দেবার জন্যে সুহাসিনীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ওরা উঠে গিয়েছে। ভাবলাম, ভালই হয়েছে। হাওড়ার ট্রামে-বাসে হঠাৎ দেখা হয়ে আর বিব্রত হবার সম্ভাবনা রইলো না।

মনে-মনে সুহাসিনী সম্পর্কে একটু খারাপ ধারণাও হয়েছিল। কলেজের প্রেম এক ধরনের বিলাসিতা, আমি ভেবেছি। তখন আমি জানতাম না, সুহাসিনীর সঙ্গে রাধাগোবিন্দর দেখা হয়েছিল। সে-কথা আমি জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে সাহেবগঞ্জের সাহিত্য সভায়। তখন ভাগ্যেচক্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আমার দুঃখের দিন তখন শেষ হয়েছে। যে-দুঃখ আমাকে অশেষ

যন্ত্রণা দিয়েছে সেই দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করেই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আমি সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেছি। এসব অবশ্যই হিসেবের মধ্যে ছিল না। আমি ভেবেছিলাম সারাজীবন আমাকে টাইপিং করে যেতে হবে। অপরে বলবে এবং আমি লিখে যাবো, আমার নিজস্ব বলতে কিছুই থাকবে না। কিন্তু ভাগ্যের খেয়াল। আমি এক সময় টুক করে রাত-কলেজে নাম লিখিয়ে বি-এ পাশের রবারস্ট্যাম্প লাগিয়ে ভদ্রলোক সেজেছি। আমার পদ পরিবর্তনও হয়েছে। ভাগ্যচক্রে গলায় টাই এঁটে আমি সায়েব সেজেছি। আমার টেবিলে একটা বৈদ্যুতিক বেল আছে, সেটা বাজালেই একজন স্টেনোটাইপিস্ট খাতা হাতে হাজির হন আমারই ডিক্টেশন নিতে। বিশ্বাস হয় না কখনও কখনও—মনে হয় টু গুড টু বি ট্রু। কিন্তু নিজের আত্মজীবনী লিখতে বসিনি আজ। কলম ধরেছি আমার প্রিয়বন্ধু রাধাগোবিন্দ শিকদারের জীবনের তিনটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করতে।

রাধাগোবিন্দ আজ সংসারের চাপে অভাবে অনটনে কেমন হয়ে গিয়েছে। সে আর কথায়-কথায় ছড়া কাটে না। কিন্তু একদিন যে সব মূল্যবান কথা সে বলতো তা আমি নিয়মিত ডায়রিতে লিখে রেখে ধনী হয়ে উঠেছি।

এক সময় রাধাগোবিন্দ এক-একটা বিষয় ধরতো এবং হুড়মুড় করে ছড়া বলে যেতো। অনেক গ্রাম্য প্রবাদের একটা লাইন মুখে-মুখে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে, কিন্তু পুরো ছড়াটা কারও খেয়াল নেই। সেই অপ্রচলিত অংশ উদ্ধার করে রাধাগোবিন্দ আনন্দ পেতো। যেমন ঃ

"আহ্লাদে আটখানা
লেজামুড়ো নিয়ে দশ খানা।"

প্রথম লাইনটা আমি জানতাম, দ্বিতীয়টা অজানা। যেমন ঃ

"ধর্মের কল বাতাসে নড়ে
পাপ করলে ধরা পড়ে।"

রাধাগোবিন্দ বলতো, "দ্বিতীয় লাইনেই প্রকৃত শিক্ষাটা রয়েছে। ওটা ভোলার মানে হয় না।" যেমন ঃ

"মনের অগোচরে পাপ নাই
মায়ের অগোচরে বাপ নাই।

"মা সম্পর্কে নতুন আলো ফেলছে এই শেষ লাইনটা।" রাধাগোবিন্দ তখন আমাকে বলতো। এখন কোনো আলোচনাতেই তার উৎসাহ নেই।

রাধাগোবিন্দর ছড়াই সেদিন রাধাগোবিন্দকে মনে করিয়ে দিলাম—

"কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান,
বাপের বাড়িতে থাকলে
মেয়ের অপমান।"

রাধাগোবিন্দ এবারেও কোনো উৎসাহ দেখালো না। অর্থের অভাবে মানুষটা যে এইভাবে শুকিয়ে যাবে তা কে জানতো?

এই রাধাগোবিন্দই অনেকদিন আগে ইয়ারকি করে আমাকে শুনিয়েছিল ঃ

"ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা
বউকে মেরে নাই রক্ষা।"

এখন সে বলে, "ওসব বাজে কথা রাখ। একটা ছোট চাকরি ধরে দিতে পারিস? আমি মাকে বলেছি, সামনের মাস থেকে অন্তত তিরিশ টাকা সংসারে দেবো।"

আমার মনে পড়লো এই রাধাগোবিন্দই মজা করে বলেছিল—

"অভাবে স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরণে
ঝরায় ক্ষেত্র নষ্ট
স্ত্রী নষ্ট মারণে।"

অভাবে সত্যিই স্বভাব নষ্ট—নিজের জীবনে যতটুকু বুঝতে বাকি ছিল এবার রাধাগোবিন্দর মধ্যে তা সুস্পষ্ট দেখলাম।

রাধাগোবিন্দ আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙ্গিয়েছিল। 'যত মত তত পথ' রামকৃষ্ণদেবের মহামূল্যবান বাণী বলেই এতদিন জানতাম। ওই বাণী লিখে আমরা কথায়-কথায় রামকৃষ্ণের উল্লেখ করেছি। রাধাগোবিন্দই বলেছিল, "ওই কথা গ্রামে-গ্রামে অনেক আগে থেকেই চলেছে—

নানা মুনির নানা মত
যত মত, তত পথ।"

অবস্থার চাপে পড়ে রাধাগোবিন্দ যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কোনো ব্যাপারে উৎসাহ নেই, সব সময় চাকরির চিন্তা। সংসারের দায়িত্ব মানুষকে কীভাবে অবশ করে তোলে তা যারা দেখতে চায় এই অভাগা বাংলা তাদের আদর্শ গবেষণাক্ষেত্র।

রাধাগোবিন্দর মন অবশ্যই শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং-এ নেই। কিন্তু প্রাণের দায়ে বিদ্যাটা সে শিখে ফেলেছে।

রাধাগোবিন্দ বলে, "বড্ড বেশী পরনির্ভরতার কাজ! অন্য একজন ভাবছে এবং আমি তার ভাবনা লিপিবদ্ধ করছি, ব্যাপারটা তেমন টানে না আমাকে। কিন্তু ভিখিরিদের চাল পছন্দ করবার সুযোগ পৃথিবীর কোন দেশে আছে?"

অবশেষে শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে রাধাগোবিন্দর। আমি ভেবেছিলাম, এবার বড় কোনো অফিসে রাধাগোবিন্দর একটা চাকরি জুটে যাবে।

কিন্তু রাধাগোবিন্দর ভাগ্য খারাপ। এক জায়গায় চাকরি খালির খবর পাঠালাম। ওকে বললাম, "শর্টহ্যাণ্ড চাকরির একটা সুবিধে হাতে-হাতে চান্স। খাতা নিয়ে যাও, পাঁচ মিনিট ডিক্টেশন লেখো। দশ মিনিটে টাইপ করে ফেলো। লোকে সঙ্গে-সঙ্গে বুঝবে একে দিয়ে কাজ চলবে কিনা। সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নেই এ-লাইনে।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "এ লাইনে তাহলে প্রতিযোগিতার উন্মাদনা নেই?"

আমি বললাম, "আছে, কিন্তু খুব কম। আমার মতো নার্ভাস লোকও তো এই খাতা হাতে পরের পর অনেকগুলো চাকরি পেয়ে গেলো। খোদ সায়েবের কাছেই তো আমার ট্রেনিং হয়েছে। অথচ আমি যে একজন একনম্বর টাইপিস্ট তা বলা চলে না।"

রাধাগোবিন্দ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বলেছি, "টাইপ ইস্কুলের গগনবাবু আমাকে একটা গোপন পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভুল কম করার দিকে নজর দেবে, তাতে যদি স্পীড কম হয় তাও ভাল। মনে রাখবে, জিনিসটা অফিস থেকে বাইরে যাবে তা নির্ভুল হওয়া চাই, স্পীড নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই ওই ভর্তির দিনটুকু ছাড়া।"

রাধাগোবিন্দ সব কথা শুনেছে। তারপর মনে করিয়ে দিয়েছে, "প্রতিযোগিতার উন্মাদনার কথা বলছিলি।"

আমি: "সে কখনও কখনও। একবার এক আই-সি-এস ইণ্ডিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের গল্প শুনেছিলাম।"

গল্প শুনতে রাধাগোবিন্দ খুব ভালোবাসতো। জিজ্ঞেস করলো, "কী গল্প?"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা সেই ভদ্রলোকের স্টেনোর কাছে শোনা। এই ইণ্ডিয়ান সায়েব তখন বেনারসে পোস্টেড। তাঁর অফিসে একজন

স্টেনো নেওয়া হবে সেজন্যে বেশ কয়েকজন লোক পরীক্ষা দিতে এসেছে।"

রাধাগোবিন্দ এই পরীক্ষার কথা শুনলেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে। সে জিজ্ঞস করলো, "কী হলো সেই পরীক্ষায় ?"

ওকে শান্ত করবার জন্যে আমি বললাম, "কী হবে আবার পরীক্ষায় ? সায়েব পাঁচমিনিটের একটা ডিক্টেশন দিলেন সবাইকে। দেখা গেলো, দশজন প্রতিযোগীর মধ্যে দুজনের ফল ভাল, তাঁরা মাত্র একটি করে ভুল করেছে।"

"তখন ?" রাধাগোবিন্দর উত্তেজনা বাড়ছে।

"তখন কী আর হবে ? সাহেব ওই দুজনকে আবার ডিক্টেশন দিলেন একটু স্পীড বাড়িয়ে।"

আমি দেখেছি রাধাগোবিন্দর চিন্তা আরও বেড়ে চলেছে এবারে কী হলো জানবার জন্যে তার প্রবল কৌতূহল।

আমি বললাম, "ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এ-বারে ও একই কাণ্ড ! দু'জনেরই একটি করে ভুল হয়েছে।"

ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব তখন হাল ছাড়লেন না। বললেন, "ফাইনাল রাউণ্ডের প্রতিযোগিতা হোক ?"

দু'পক্ষই রাজী। সুতরাং আরও একটু বাড়তি স্পীডে ডিক্টেশন দেওয়া হলো।

"কে জিতলো ? জানতে চাইছে রাধাগোবিন্দ।

আমি বললাম,"এ-বারেও 'টাই'। দু'জনেই দুটো করে ভুল করেছে। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, আমাকে পাঁচমিনিট সময় দাও।"

"পাঁচ মিনিট সময়! সে তো দু'জনের কাছে নিশ্চয় পাঁচ ঘণ্টা মনে হচ্ছে।" রাধাগোবিন্দর উত্তর।

"ঠিক ধরেছিস। তখন মনে হয় পকেটে কোন ঘুমের ওষুধ থাকলে ভাল হতো। ওষুধের জোরে অজান্তেই সময় কেটে যেতো। যাই হোক, পাঁচমিনিট পরেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ডাক পড়লো। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, স্টেনো হিসাবে আপনাদের দু'জনের তুলনা নেই। আপনাদের মধ্যে একজন আমার ভায়ের কাছ থেকে সুপারিশপত্র এনেছেন, আর একজন কিছুই আনেনি। সুতরাং যিনি আনেননি আমি তাঁকেই নিলাম।"

অবাক হয়ে গেলো রাধাগোবিন্দ। বললে, "এ তো উল্টো সাসপেন্সের গল্প! সবাইতো জানে যে লোক আত্মীয়ের সুপারিশে এসেছে তারই চাকরি হবে। তুই বলতে চাস এদেশে এখনও এই ধরনের সুবিচার হয়!"

আমি বললাম, "যে ভদ্রলোক চাকরিটা পেয়েছিলেন তিনি নিজেই আমাকে গল্পটা বলেছিলেন।"

রাধাগোবিন্দ এই গল্প থেকে মনোবল পাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু উল্টো ফল হলো। রেলের এক অফিসে পরীক্ষা দিতে গেলো সে। বিকেলে ফিরে এল শুকনো মুখ করে।

পাঁচ মিনিটে ডিক্টেশন নিয়েছিল রাধাগোবিন্দ ঠিকই। "তারপর টাইপরাইটারে বসে সমস্ত লেখা ব্লাংক হয়ে গেলো, আমি শর্টহ্যাণ্ডের একটা দাগও খাতায় দেখতে পেলাম না।" রাধাগোবিন্দ কাউকে না বলে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এরপর বুঝলাম, প্রতিযোগিতায় বসলে রাধাগোবিন্দর মানসিক উত্তেজনা বেড়ে যায়। ওকে প্রতিযোগিতাবিহীন পরিবেশে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে।

এবার আমি অন্য ফন্দি আঁটলাম। ভগবানের দয়ায় তখন আমি ভাল চাকরিই করছি। দুপুরের চাকরি ছাড়াও বিকেলে কিছু পার্ট টাইম (চাঁদের শোভা!) আছে।

এঁদেরই একজন অফিসের কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ায় সারাক্ষণের একজন লোক চাইছিলেন। মিস্টার হীরালালকে আমি বললাম, "একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক দিচ্ছি।"

"নতুন লোক পারবে কি?" মিস্টার হীরালালের প্রশ্ন।

এ পৃথিবীতে সবাই মাখা-ভাতটি পছন্দ করেন। প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা চাইছেন। কিন্তু কাজ না করতে দিলে অভিজ্ঞতা কেমন করে হবে? মালিকদের সে-কথা বলে লাভ নেই, তাঁরা যা চাইছেন তাই নেবেন।

আমি মিস্টার হীরালালকে বললাম, "আপনি চিন্তা করবেন না, দরকার হলে আমি সন্ধ্যেবেলায় এসে কাজ সামলে দেবো।"

রাধাগোবিন্দর চাকরি হলো। কিন্তু ভীষণ অভিমানও হলো তার। "তুই নিজের কাজ সামলাতে পারিস না, আবার আমার বোঝা বইবি।"

"পৃথিবীতে কেউ কারও বোঝা বয় না, রাধাগোবিন্দ। যে যার ভাগ্যে করে খায়। শুধু গাড়িতে স্টার্ট দেবার সময় একটু ঠেলাঠেলি প্রয়োজন হয়।"

"তোর কথা আলাদা," রাধাগোবিন্দ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছে। "তুই তো খেলা দেখাবি মনে হচ্ছে। চাকরিতে উন্নতি করছিস, ঋণ করে নাইট কলেজ থেকে ডিগ্রি জোগাড়ের তালে রয়েছিস,

তার ওপর তুই গল্প লেখা শুরু করেছিস।"

"আমার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা একটা পদ্যে তুই নিজেই অনেক দিন আগে আমাকে বলেছিলি—

মরা মালঞ্চে ফুটলো ফুল
টেকো মাথায় উঠলো চুল।"

"তাই নাকি? বলেছিলাম বুঝি? এখন আমার কিছুই মনে পড়ছে না ভাই," রাধাগোবিন্দর স্বীকারোক্তি আমার কষ্ট বাড়িয়ে দিলো। অবস্থার চাপে পড়ে মানুষ তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেললে তার থেকে দুঃখের কিছু থাকে না।

"তুই আগে কী সুন্দর কবিতা বলতিস," আমি মনে করিয়ে দিই রাধাগোবিন্দকে।

"সে তো গ্রাম্য কবিতা, কবিদের নাম কেউ জানে না। আর তুই নিজে লেখক হবাব দুঃসাহস দেখাচ্ছিস," রাধাগোবিন্দ সস্নেহে বললো "দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ।"

আমি বললাম, "লেখার মধ্যেই আমি আমার সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি খুঁজে পাই রাধাগোবিন্দ। জীবনে যেসব প্রত্যাশা ছিল তার কিছুই তো পূরণ হলো না—লেখার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আমি যা হতে চেয়েছিলাম তা হয়ে যাই! মনে হয় আমি কারও দাসত্ব করছি না। সংসারের এঁটো বাসন মাজবার জন্যে আমার জন্ম হয়নি, স্বয়ং ঈশ্বর আমার কপালে জয়টীকা এঁকে দিয়েছেন।"

এসব ইমোশানের কথা। নিতান্ত প্রিয়জন ছাড়া কোথায় এসব অনুভূতির মূল্য আছে?

আমি রাধাগোবিন্দকে বলেছি, "অন্ধ আবেগে আমাদের দু'জনকে এগিয়ে যেতে হবে, রাধাগোবিন্দ। ঈশ্বর আমাদের যে-পরীক্ষায় ফেলেছেন সে-পরীক্ষার পড়া তৈরী করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না, আমারা আরও এগিয়ে যাবো।"

কী ছেলেমানুষী! কথাগুলো তখন কী ভাবে বলেছি, ভাবতেও এখন লজ্জা লাগে। কিন্তু অবস্থার চাপে আমরা দু'জনেই তখন কিছুটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। আমাদের উৎসাহ দেবার এবং অনুপ্রাণিত করার মতো কেউ তখন কাছাকাছি নেই। যারা একদিন রাধাগোবিন্দর সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো সেইসব সুহাসিনীরা তখন বেপাত্তা।

রাধাগোবিন্দ কিন্তু ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে আমাকে তখন বলেছে, "আমার গোড়া কাটা! আমি ক্রমশ শুকিয়ে যাবো। আমার

দ্বারা কিছুই হবে না। তোর এখনও বিপুল বিক্রম। সংসারের হাঁড়িকাঠে গলা ঢুকিয়েও তুই ছিটকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিস। আমার প্রবাদের খাতাখানা তোকে চিরকালের জন্য দিয়ে দেবো। তুই রেখে দিস, কখনও যদি লেখার লাইনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারিস তখন কাজে লাগাতে পারবি।"

"আঃ রাধাগোবিন্দ, কী হচ্ছে!" আমি বকুনি লাগিয়েছি।

"পদ্যগুলো তুই যেমন খুশী ব্যবহার করবি। শুধু একটা কণ্ডিশন রইলো, কোথাও আমার নাম ব্যবহার করবি না। এই দুনিয়ার কোথাও আমি নিজের নাম রেখে যেতে চাই না।"

আমি তখন রাধাগোবিন্দকে বলেছি, পুরুষ মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে তুই সেবারে একটা কবিতা বলেছিলি। সেটাই এখন তোকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাইঃ

যখন থাকে দুই পাও
যথা ইচ্ছা তথা যাও;
যখন হয় চার পাও,
খানা খোরাক দিয়া যাও;
যখন হয় ছয় পাও
'বাবাজান লইয়া যাও।"

"তার মানে আমি যা বুঝেছিলাম, যতক্ষণ শক্তসমর্থ আছি ততক্ষণ প্রবলবেগে কাজকর্ম করতে হবে, কাউকে পরোয়া না করে। শেষ পর্যন্ত তো খাটিয়ায় শুয়ে অপরের কাঁধে চড়ে অসহায় শ্মশানযাত্রা আছেই।"

"বলেছিলাম বুঝি? হবেও বা!" রাধাগোবিন্দ নিজেই তার সংগৃহীত, কবিতার লাইন এখন আর মনে করতে পারছে না।

মিস্টার হীরালালের বড়তলা স্ট্রীটের অফিসেই কাজ করে চলেছে রাধাগোবিন্দ। ছোট অফিস, পরিচয় দেবার মতো কিছু নেই। কিন্তু চাকরিটা না হলে খুব অসুবিধেয় পড়তো রাধাগোবিন্দ। বাড়িতে টাকার খুব প্রয়োজন।

মিস্টার হীরালালের ওখানে কাজ কী রকম লাগছে তা অবশ্য রাধাগোবিন্দকে আমি জিজ্ঞেস করতে সাহস পেতাম না। ছোট এবং

মাঝারি সাইজের বিজনেসে এদেশে কী পরিমাণে অসাধুতা আছে তা ভুক্তভোগীরা ভালভাবেই জানেন। জিনিসে ভেজাল, ওজনে ফাঁকি, হিসেবে ভেজাল, অন্যায়টাই বিজনেসের এমন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে যে এসব কেউ অন্যায় মনে করেন না।

এই অসাধুদের বক্তব্য নিয়েই রাধাগোবিন্দ একসময় মজা করতো—

"সাতে পাঁচে মিলে চৌদ্দ,
দু'টাকা না হয়, না-দিলে অদ্য।"

আর ওজনে ফাঁকি সম্পর্কে রাধাগোবিন্দ যে-কথা বলেছিল তা কোনোদিন ভুলবো না—

"যে ধরে পাল্লা
তার নেই আল্লাহ।"

বছর কয়েক মিস্টার হীরালালের কাছে কাজ করে রাধাগোবিন্দ আমার চেনাশোনা আরেক আপিসে চলে এসেছে। এখানে মাইনে কিছুটা বেশী। আমি ভেবেছিলাম, মিস্টার হীরালালের কাছে কাজের অভিজ্ঞতা রাধাগোবিন্দ এবার পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে। বড়-বড় অফিসে সে ইন্টারভিউ দিতে যেতো, কিন্তু কোনো কারণে ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে দয়া করতেন না।

রাধাগোবিন্দ যাতে মুষড়ে না পড়ে তার জন্যে আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই তুলতাম। আমি বলতাম, "ভগবান যা করেন অনেক সময় তা ভালর জন্যেই করেন। আমি তখন বেঙ্গল চেম্বারে কাজ করি। একশ টাকা বাড়তি মাইনের লোভে 'ক্যালটেক্সে' ইন্টারভিউ দিলাম। একটুর জন্যে শেষ মুহূর্তে চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে গেলো, ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই ওই কোম্পানির দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, ওখানে গেলে আমার একূল ওকূল দুকূলই যেতো!"

রাধাগোবিন্দ শুনলো, কিন্তু আমাকে খুব বিশ্বাস করলো মনে হয় না। রাধাগোবিন্দর ধারণা, ঠকবার জন্যেই বাঙালী মধ্যবিত্তর জন্ম হয়েছে। "রাস্তায় ঘাটে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে সবাই আমাদের ঠকাবার জন্যে উঁচিয়ে আছে, অফিসেও মানুষকে ঠকাবে না তো কী?"

"কোনো অফিসে নিরপেক্ষভাবে মানুষের গুণ বিচার হয় না, ভিতর-ভিতর ব্যবস্থা করেই সব চাকরি ঠিক হয়ে যায়," রাধাগোবিন্দর ধারণা।

রাধাগোবিন্দর জন্য আমার কষ্ট হয়েছে। সে এখন কাজকর্ম ভালই

করে—ঝকঝকে নির্ভুল টাইপিং। আর একটু ভাল চাকরি হলে ওর সাংসারিক কষ্ট কিছু কম হতো।

রাধাগোবিন্দকে মনে-মনে আমি প্রশংসাও করেছি। আমার মা বলতেন, "তোর যত বন্ধু আছে তার মধ্যে রাধাগোবিন্দই সবচেয়ে ভাল, মুখ বুঁজে সংসারের সেবা করে চলেছে, কখনও কোনো কথা বলে না।"

ওদের বাড়িতে গিয়েও দেখেছি, রাধাগোবিন্দ সকালে ছাত্র পড়াচ্ছে। ওর মা বলেন, "রাধুর ধৈর্য দেখবার। সারাক্ষণ কাজ নিয়ে আছে। যেখান থেকে যা পায় সব আমার হাতে তুলে দেয়।"

রাধাগোবিন্দ আমাকে বলে, "প্রতিটি পয়সা ইজ নিডেড। বুঝলি, শংকর। তিনটি বোন, দুটি ভায়ের সংসার, সোজা কথা নয়। তবে আমার দুঃখ নেই। আমার বোন এবং ভাইগুলো পড়াশোনায় ভাল। কারও জন্যে মাস্টার রাখতে পারিনি কিন্তু পরীক্ষায় সবাই ভাল করেছে।"

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েও শুধু সংসারের কথা। এই বয়সের যুবকদের মধ্যে আরও অনেক আলোচনার বিষয় থাকে। কিন্তু রাধাগোবিন্দর মন থেকে সেসব চিন্তা উধাও। কে বলবে, এই রাধাগোবিন্দ একদিন সুহাসিনীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতো?

একদিন ভাবছিলাম, জিজ্ঞেস করবো সুহাসিনীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কিনা? কিন্তু সাহস হলো না। বেচারী হয়তো মনে কষ্ট পাবে।

বরং অন্য সহপাঠিনীদের খবর রাধাগোবিন্দর কাছেই পেলাম। "মৃদুলা সেনগুপ্তর সঙ্গে সেদিন হাওড়া স্টেশনে দেখা হয়ে গেলো। খুব ভাল বিয়ে হয়েছে মৃদুলার—স্বামীর গাড়ি আছে। কিছুতেই শুনলো না, আমাকে ব্রেবোর্ন রোডে নামিয়ে দিয়ে গেলো।"

সুহাসিনীর কথা তুলবো? কিন্তু রাধাগোবিন্দ তখন বলছে, 'আমার বড় বোন কুন্তলার জন্যে ওই রকম একটা বর জোগাড় করতে হবে, জানিস শংকর।"

আমার মা বলতেন, "ধন্য ছেলে! কে দেখে বলবে সৎমায়ের সংসার নীরবে টেনে চলেছে?" এ-ব্যাপারে আমার মায়ের দুর্বলতা ছিল, তিনি নিজেই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে অপরের সাহায্যে সংসারতরীকে কিছুদিন সচল রেখেছিলেন।

কুন্তলার বিয়ের ব্যবস্থা একদিন সত্যিই হয়ে গেলো। রাধাগোবিন্দর মনে তখন খুব আনন্দ।

"দ্যাখ, মায়ের মনে ভয় ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার বোনগুলো দেখতে খারাপ নয়, পড়াশোনায় খুব ভাল, সংসারের

কাজ জানে, পরিশ্রমকে ভয় পায় না। তাদের আবার চিন্তা কীসে?" রাধাগোবিন্দ আমাকে বলেছিল।

কুন্তলাকে দেখেছি আমি। ভারি মিষ্টি চেহারা। মাথায় অনেক চুল। ঝকঝকে মুক্তোর মতো দাঁত, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। রাধাগোবিন্দটাই একসময় আমার কাছে ভাগ্যবতী রমণীর দেহ-লক্ষণ বর্ণনা করেছিল—

মুক্তা-দাঁতী, হরিণ-চোখী,
লম্বা মাথার চুল,
সেই নারী করিলা বিয়া,
ঘরে ফুটে ফুল।"

আমি তখন সুহাসিনীর শরীর-লক্ষণের সঙ্গে ওই বর্ণনা মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত, হরিণ-চোখ ছাড়া আর সবই পাওয়া যাচ্ছে, যদিও রঙটি একটু চাপা।

কুন্তলার বিয়ে হয়ে গেলো। রাধাগোবিন্দ আমাকে বললো, "আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সমস্ত ক্রেডিট বাবার ইনসিওরেন্সের টাকার এবং মায়ের গয়নার।"

সময় কি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। যথাসময়ে, দ্বিতীয় বোন মিনতিও একদিন বড় হয়ে উঠলো এবং মিনতির বিয়েও ঠিক করে ফেলেছিল রাধাগোবিন্দ। এবারের পাত্রও বেশ ভাল।

রাধাগোবিন্দ আবার বলেছে, "আমার কোনো ক্রেডিট নেই। মিনতির কুষ্টিটা টপ ক্লাশ। দেখেই ছেলের বাবা লাফিয়ে উঠলেন। তাছাড়া ভারি মিষ্টি স্বভাব আমার এই বোনের।" আনন্দের মাথায় অনেকদিন পরে রাধাগোবিন্দ একটা ছড়া কেটে বসলো। "ঠিক মতো দেখে শুনে বউ না-আনলে কী অবস্থা হয় তা জানিস? বউ সম্পর্কে শাশুড়ীর মত শোন—

'বউয়ের চলন-ফিরন কেমন?'
'তুরকী ঘোড়া যেমন।'
'বউয়ের গলার আওয়াজ কেমন?'
'শালিক কেঁ'কায় যেমন!' "

মিনতিকে সংসার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছে রাধাগোবিন্দ: "শাশুড়ীকে সম্মান করবি, তাহলে কখনও অসুখী হবি না। মনে রাখবি, গাঁয়ের মেয়েরা আগে বলতো—

ডালের মধ্যে মসুরী
মানুষের মধ্যে শাশুড়ী!"

রাধাগোবিন্দকে আমি আবার অভিনন্দন জানিয়েছি। অসহায় অবস্থায় এইভাবে দ্বিতীয় বোন পার করা বাঙালী ঘরে সোজা ব্যাপার নয়।

রাধাগোবিন্দ উত্তর দিয়েছে, 'তোকে বলছি, বাবার শেষ টাকাগুলো, মায়ের শেষ গয়নাগুলো এবং মিনতির কুষ্ঠি কাজ দিয়েছে। আমার মুরোদ বোঝা যাবে তৃতীয় বারে।" আমি জানি ছোট বোন রানী দেখতে ভাল নয়। ওর রঙ কালো।

যদিও পণ্ডিতেরা বলেন—

জাতের নারী কালাও ভাল
নদীর জল ঘোলাও ভাল।

তবু সে-কথা পাত্রী নির্বাচনের সময় ক'জনের মনে থাকে? "সুন্দর মুখের সন্ধান ব্যর্থ হবার পরেই লোককে বলতে শুনি—

রূপে মারি লাথি
গুণে ধরি ছাতি।"

কয়েক বছর আরও কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে রাধাগোবিন্দর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ কমে এসেছে। আমি সাহিত্যের জগতে অপ্রত্যাশিত প্রবেশপত্র পেয়েছি। আমার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা না-কমলেও তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। এখন আমাকে ভীষণ ঘুরে বেড়াতে হয়। কর্মসূত্রে কখন কোথায় যেতে হবে তার ঠিক থাকে না। আমি নতুন এক জগতে প্রবেশ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছি, যার প্রতি মুহূর্ত আমি উপভোগ করছি, যদিও সময়ের টানাটানি আমাকে মাঝে-মাঝে কষ্ট দেয়।

রাধাগোবিন্দ আমার প্রতিটি প্রকাশিত লেখা মন দিয়ে পড়ে। দেখা না-হলেও দীর্ঘ চিঠি লিখে সে সমালোচনা করে। সে আমার অনেক ভুল দেখিয়ে দেয় সস্নেহে। উৎসাহ দেয় রাধাগোবিন্দ, কিন্তু অন্ধ প্রশস্তিতে আমার পথভ্রান্তির ইন্ধন জোগায় না। রাধাগোবিন্দর সমালোচনায় আমার খুব উপকার হয়।

রাধাগোবিন্দ একবার আমাকে লিখেছিল, "শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার টান নিয়ে গল্প লিখিস না। ভাই-বোনের সম্পর্কের কথাটাও সাহিত্যের আলোকে ভেবে দেখিস। বাঙালীর এই মিষ্টি সম্পর্ক সম্বন্ধে তোর তো অভিজ্ঞতা না-থাকার কথা নয়। আমার ছড়ার যে খাতাটা তোকে দিয়েছিলাম তার কোথাও নিচের কথাগুলো পাবি :

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান
তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান
তেমনি বোনের ভাইকে টান।"

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি, "কেমন চলছে?"

"ভালই তো।" ছোট্ট জায়গায় চাকরি করে রাধাগোবিন্দ। তারা খাটিয়ে নেয় প্রচুর, কিন্তু সে-তুলনায় মাইনে দেয় না। আমাদের এই দেশে কর্মীদের দু'রকম অবস্থা। সরকারী প্রতিষ্ঠানে মাইনে দিলেও কাজ ওঠে না, ছোট প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও বাঁচার মতো মাইনে পাওয়া যায় না। এদেশের খুব সামান্য জায়গায় কাজ ও মাইনের সমতা আছে।

রাধাগোবিন্দ আমাকে বলেছে, "দু' একটা পার্ট টাইম কাজ আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

এরপর আমি গোটা দুয়েক জায়গায় ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

কিছুদিন পর রাধাগোবিন্দ বলেছে,"শনিবার এবং রবিবারে স্পেশাল কিছু ব্যবস্থা করতে পারিস?"

আমি বলেছি, "রাধাগোবিন্দ, তুই কী শুরু করেছিস? সকালে টিউশনি, দুপুরে এক নম্বর চাকরি, সন্ধ্যেয় দুটো পার্ট টাইম চাকরি, তার পরেও রবিবারে কাজ খুঁজছিস তুই?"

রাধাগোবিন্দ বললো, "বোনের বিয়ের জন্যে তৈরি হতে বারণ করছিস তুই?"

রবিবারে এ-দেশে কোনো কাজকর্ম হয় না। দু' একজনকে বলেছি আমার বন্ধুর কথা। কিন্তু তেমন কোনো সুখবর আসেনি।

রাধাগোবিন্দ কিন্তু আমাকে মাঝে-মাঝে মনে করিয়ে দিয়েছে তার প্রয়োজনের কথা। শেষ পর্যন্ত আমি আমার পরিচিত মনোবিজ্ঞানী ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জিকে বলেছি, কখনও যদি পার্ট টাইম লোকজনের প্রয়োজন হয় বলবেন। বোনের বিয়ের জন্য আমার এক বন্ধু কিছু টাকা রোজগার করতে চায়।

সবাই যেমন ভুলে যায়, ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জিও ব্যাপারটা ভুলে যাবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি হঠাৎ একদিন টেলিফোন করলেন, "আপনার বন্ধুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন, যিনি শনি-রবিবার কাজ খুঁজছিলেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে রাধাগোবিন্দর বাড়িতে খবর দিতে গিয়েছি।

রাধাগোবিন্দ তখন কাজ থেকে ফেরেনি। কলকাতার এই যান-জঙ্গল ঠেলে যাদের নানা জায়গায় নানা কাজ করে বেড়াতে হয় তাদের কষ্টের কথা কে মনে রাখে? এই অসম্ভব অবস্থায় প্রতিদিন যে এতো লোক নিরাপদে বাড়ি ফিরছে এটাই আশ্চর্য ঘটনা!

রাধাগোবিন্দর মা অনেকদিন পরে আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন, "বউমা কেমন আছে? মেয়ে?"

সবাই ভাল আছে শুনে বললেন, "আমি কী বলবো, বাবা। রাধুর কথা যখন ভাবি তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়।"

আমি বুঝলাম তিনি রাধাগোবিন্দর বিয়ের কথা তুলছেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ওরই একমাত্র বিয়ে হয়নি। বিয়ে হবার বয়সও পেরিয়ে চলেছে। ওর মা বললেন, "দেখো বাবা, ছোট মেয়ে ঠিক পার হয়ে যাবে। ছেলেরা বড় হচ্ছে, তাদের দুঃখও শেষ হবে। কিন্তু তখন এই রাধু বেচারার কী হবে বলো তো?"

ওর মা রাধাগোবিন্দর বিয়ের কথা তুলছেন, কিন্তু রাধাগোবিন্দ বলেছে, "পাগল হয়েছেন?"

একবার আমিও কথাটা তুলেছিলাম! রাধাগোবিন্দ বুঝিয়েছিল, সময় চলে গিয়েছে। নিজের মনেই সে বলেছিল,

"সাঁজ গেলে দীয়া
বয়স গেলে বিয়া।"

"দুঃখ আমাদের থাকবেই, তবু বিয়ে কর। গরীবরা কি বিয়ে করে না?" আমি রাধাগোবিন্দকে বলেছি। একটু ভয়ও দেখিয়েছি। "বুড়ো বয়সে কে দেখবে? তখন হয়তো বিয়ে করবি বাধ্য হয়ে। বুড়ো-বয়সের বউ সম্বন্ধে তুই তো বলেছিলি—

আহ্লাদের বউ তুমি
কেঁদো না কেঁদো না
চাল চিবিয়ে খাব আমি
রেঁধো না রেঁধো না।"

রাধাগোবিন্দ ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছিল। "ওসব তোর সঙ্গে পরে আলোচনা হবে। এখন আমার রবিবারের একটা কাজের কথা ভাব।"

ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে কিছুদিন পর আমার যোগাযোগ হয়েছে। মানুষের মনের ব্যাপারে তিনি নীরবে যা করে চলেছেন তার জন্যে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

সুধাকর বললেন, "আপনার বন্ধুটির বেশ মধুর ব্যক্তিত্ব। ওঁকে আমি কাজে লাগাচ্ছি। টাইপ-ফাইপের কাজ নয়, আমার অনেক রোগীর কমপ্যানিয়ন প্রয়োজন হয়। তার জন্যে প্রতি সিটিং-এ টাকা দেওয়া হয়।"

রাধাগোবিন্দ আমার কাছেও যথাসময়ে এসেছে। বলেছে, "তোর দয়ায় নতুন ধরনের কাজ জুটেছে। শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং-এর হাঙ্গামা থেকে অনেক ভাল। এক বুড়ো ভদ্রলোক স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিশ্বসংসারে সবাইকে গালাগালি করেন। রবিবার সকালে পাকা আড়াই ঘণ্টা মুখ বুঁজে তাঁর স্পিচ শুনতে হয়। কথা শোনাবার লোক খুঁজে না পেয়েই তাঁর মানসিক রোগ নাকি আরও বেড়ে যাচ্ছিল।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "শনি রবি আমি বেশ পয়সা রোজগার করছি। এতো কম পরিশ্রম করে টাইপিং-এ পয়সা পাওয়া যায় না। আমি তোর জন্যেও ঘটনা সংগ্রহ করছি। তোকে আমি মাঝে-মাঝে ঘটনা দিয়ে যাবো, তুই বোধ হয় তা থেকে রসদ নিয়ে গল্প লিখতে পারবি।"

রাধাগোবিন্দ কয়েক মাস পরে এলো বেশ গম্ভীর হয়ে। বললো, "বিয়ে না-করে বেঁচে গিয়েছি! ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জির দয়ায় যেসব কেস দেখছি! এদের কারও সঙ্গে ছাঁদনাতলায় দেখা হলে হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে যেতো।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "পয়সা পাচ্ছি বটে, সতেরো টাকা করে প্রতি সিটিং-এ। কিন্তু মায়ের জাত সম্পর্ক সম্বন্ধে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। এক ভদ্রমহিলা ইস্কুল শিক্ষিকা, বাইরে অতি সুসভ্য—কিন্তু কী গালাগালিই যে জানেন! এই গালাগালি শোনার জন্যে আমি রয়েছি। এঁর এক বয় ফ্রেণ্ড ছিল। তিনি একদিন নেশার ঘোরে রাগের মাথায় বলেছিলেন, ডাঁট দেখিও না, তোমার যা দেহ বাজারে তা পাঁচ সিকেয় পাওয়া যায়। সেই শুনেই বোধ হয় মহিলার মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গেলো।"

"তোর কাজ কী?" আমি জিজ্ঞেস করি রাধাগোবিন্দকে।

"আমার কাজ খুব সহজ। ডঃ চ্যাটার্জির নির্দেশ মতো মাঝে মাঝে বলি, 'আপনি সুন্দরী। রাস্তায় আপনাকে নিয়ে বেরনো নিরাপদ নয়'!"

আমি ক্রমশ লক্ষ্য করেছি, টাকা রোজগার করছে বটে রাধাগোবিন্দ, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধাভক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

রাধাগোবিন্দ বলে, "বিয়ে না-করে খুব বেঁচে গিয়েছি ভাই। অসুস্থ

মন নিয়ে লাখ-লাখ মেয়ে সুস্থ মানুষের স্টাইলে এই শহরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ট্রামে-বাসে এদের রুজ-মাখা মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এদের মনের মধ্যে শ্মশান জ্বলছে, চান্স পেলেই সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।"

"রাধাগোবিন্দ, তোর খাতাতেই তো লেখা আছে—

কাচ আর মন এই দুই সমপ্রায়
একবার ভাঙে যদি জোড়া লাগা দায়।"

"জোড়া তো দূরের কথা, ওই ভাঙা কাচে লোক খুন হয়!" রাধাগোবিন্দ সাবধান করে দিলো।

আমার চিন্তা বাড়ছে। বিয়ের কথা তুলতেই রাধাগোবিন্দ একবার বলেছে,

"ঘরের স্ত্রীও আপন নয়
গাঁটে যখন পয়সা নাই।"

রাধাগোবিন্দ নিজের বোনের বিয়ের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না।

অনেকদিন পরে সেবার রাধাগোবিন্দ দেখা করতে এলো। বললো, "মালতীকে চিনতিস তুই? সুহাসিনীর খুব বন্ধু ছিল, যদিও এক বছরের জুনিয়র।"

আমি মালতীকে মনে করতে পারছি না। পৃথিবীতে কত লোককে দেখেছি, সবাইকে মনে রাখবার মতো স্মৃতিশক্তি ভগবান আমাকে দেননি।

রাধাগোবিন্দ বললো, "ওই মালতীই এখন ডক্টর চ্যাটার্জির পেশেণ্ট হয়েছে। ছেলেদের একেবারে সহ্য করতে পারে না। পুরুষ মানুষ দেখলেই নাকি বুকে ব্যথা হয়।"

"আমার সঙ্গে পুরনো চেনাটা শাপে বর হয়ে গেলো," রাধাগোবিন্দ বললো। "ওকে আমি ঘণ্টাখানেক সঙ্গ দিই। পুরনো কথা আলাপ করি। বড্ড কষ্ট লাগে।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"সতেরো টাকা হাত তুলে দেন ডক্টর চ্যাটার্জি। টাকাটা নিশ্চয় ওই মালতীর।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "মালতীর কেসটা বড় পেনফুল। স্বামীর বুকের ব্যথা হলো স্ত্রীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করতে-করতে। স্বামীর বয়স অনেক বেশী ছিল মালতীর তুলনায়। ডাক্তার চ্যাটার্জি বলেছিলেন

ওর মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে. স্বামীর মৃত্যুর জন্য মালতী দায়ী। অথচ ব্যাপারটা কারও জানবার নয়—ঝগড়াটা হয়েছিল বিছানায়, গভীর রাতে।"

"মালতীকে বোঝাতে হয়, তোমার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে তুমি মোটেই দায়ী নও। মালতীর স্বামীর ভূমিকায় আমি কী সুন্দর অভিনয় করি।"

এরপর ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, "আপনার বন্ধুটি মশাই বেশ লোক। আমার ওই পেশেণ্ট মালতী সিনহার জন্যে কোন টাকা নিতে চাইছে না। আমাকে বলছে. আমাকে মহিলা পেশেণ্ট দেবেন না, ডাক্তারবাবু। মেয়েদের দেখলে আমার ভয় হয়—কী সব ফুটফুটে চেহারা, কী চমৎকার সাজগোজ. কিন্তু যেমনি কথা বলি তখনই বুঝতে পারি বুকের মধ্যে বিষ।"

"টাকা নিচ্ছে না কেন?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"বলে এক সময় সহপাঠিনী ছিল। তখন পাত্তা দিতো না। এখন বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে পয়সা নিতে কেমন লাগে।"

এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হলে ভাল হতো। ডাক্তার চ্যাটার্জির সঙ্গে রাধাগোবিন্দর দেখা না-হলেই ভাল হতো।

কিন্তু তারপর কত ঘটনা ঘটে গেলো। যার ফলশ্রুতি হিসেবে এতো বছর পরে সুহাসিনীর এই টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সুহাসিনী আমাকে লিখেছে তার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে।

রাধাগোবিন্দর জন্যে আমার চিন্তা হতো। আমি আন্দাজ করতাম পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাধাগোবিন্দর মা আর ছেলের বিয়ের কথা তোলেন না। বোনের বিয়ের টাকা জমাতে রাধাগোবিন্দর আরও কত বছর লাগবে তার ঠিকানা নেই। তার ওপর রাধাগোবিন্দর ধারণা হচ্ছে মেয়েদের মনের মধ্যে নানা রোগ লুকিয়ে থাকে।

ঠিক সেই সময় সেবার সায়েবগঞ্জ বঙ্গসাহিত্যসভায় সুহাসিনীর সঙ্গে আমার আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেলো। কতকাল পরে এই দেখা। লেখক হবার এই লাভ—বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাঝে মধ্যে অনেক হারানো মানুষকে ফিরে পাওয়া যায়। সুহাসিনীকে আমি চিনতেও পারতাম না যদি-না সে পরিচয় দিতো। আমাদের সঙ্গে সেবার

কয়েকজন কবি বন্ধুও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও সুহাসিনীর আলাপ করিয়ে দিলাম।

সুহাসিনী ওখানে মেয়েদের হোস্টেলে থাকে। সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। সেই সন্ধ্যেবেলায় আমি যেখানে ছিলাম সেখানে একান্তে দেখা করতে এলো। সুহাসিনী বিয়ে করেনি জেনে আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হলাম।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে একান্তে আলোচনা হলো। যৌবনের প্রারম্ভে যে-পরিচয় তা এতো বছর পরে আবার নিবিড় হতে চাইছে। সুহাসিনী কিছুই ভোলেনি, সেই চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাটুকু পর্যন্ত।

সুহাসিনী বললো, "সেইসব তুচ্ছ ঘটনা তোমার এখনও মনে আছে ? আমার মতো একজন সাধারণ মেয়ের চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়ার কথা !"

আমি বললাম, "জীবনের ভোরবেলার যা ঘটে অপরাহ্ণেও তা মনে থাকে। তাছাড়া রাধাগোবিন্দ এখনও আমার বিশেষ বন্ধু। আমার দুঃখের দিনে সে সর্বদা আমার পাশে-পাশে ছিল, এখনও নিজের পায়ে দাঁড়ালেও তার কোনো কথা ভুলতে পারি না।"

"কী করছে এখন রাধাগোবিন্দ ?" জিজ্ঞেস করলো সুহাসিনী।

"এখন বিমাতার সংসারকে মাঝদরিয়া থেকে তীরে টেনে আনবার লড়াই করছে।" রাধাগোবিন্দ এখনও বিয়ে করেনি শুনে সুহাসিনী খুব অবাক হয়ে গেলো।

আমি বললাম, "রাধাগোবিন্দর ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে তোমার খোঁজ করেছিলাম, সুহাসিনী।"

সুহাসিনী গম্ভীর হয়ে গেলো। "খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওর বাড়িতে যাই, ওর পাশে দাঁড়োই। কিন্তু প্রথমে সাহস পাইনি। মনে হলো ঐ অবস্থায় কলেজের বান্ধবীকে কেউ বাড়িতে দেখতে চাইবে কিনা। এদেশে বন্ধু-বান্ধবীর সম্পর্কটা এখনও অতটা সহজ সরল হয়নি। তোমরা পুরুষ মানুষরা আমাদের থেকে অনেক বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করো।"

কোথায় আমি সুহাসিনীকে আক্রমণ করবো না সুহাসিনীই অভিযোগ করলো, "রাধাগোবিন্দ আমাকে দুঃখের মুহূর্তেই ভুলে গেলো, আমাকে কোন গুরুত্ব দিলো না। চিঠি লিখেও আমি কোন উত্তর পেলাম না।"

"ওর অবস্থাটা তখন ভেবে দেখো। তোমাকে কী লিখবে তাই

বোধহয় বেচারা রাধাগোবিন্দ ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লে মনঃস্থির করতে মানুষের সময় লাগে, সুহাসিনী।"

গভীর দুঃখের সঙ্গে সুহাসিনী বললো, "কাল অনন্ত হলেও মানুষের সময়ের সীমা থাকে, শঙ্কর।

আমি বললাম, "তোমার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে, আমি একবার তোমার বাড়িতেও গিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম তোমার বাবা বদলি হয়ে হাওড়া চলে গিয়েছেন।" সুহাসিনী আমাকে এবার অবাক করে দিলো। যা রাধাগোবিন্দ আমাকে কোনোদিন বলেনি তাই প্রকাশ পেলো এত বছর পরে। সুহাসিনী জানালো, "কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে আমি লজ্জার মাথা খেয়ে রাধাগোবিন্দকে আবার চিঠি লিখেছিলাম। বলেছিলাম, শনিবার, ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

"তারপর? আমি জানতে চাই।

"রাধাগোবিন্দ এসেছিল। সে সোজা বললো, আমাকে ভুলে যাও সুহাসিনী। যে-রাধাগোবিন্দর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল সে বেঁচে নেই, এই ভাবো। এখন যে-রাধাবিন্দ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেম তার কাছে বিলাসিতা। আমার অনেক দায়দায়িত্ব সুহাসিনী তুমি আমাকে আর চিঠি লিখে দুর্বল করে তোল না, প্লিজ।"

আমি ভেবেছিলাম অভিমান করেই দুজন পরস্পরের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। সুহাসিনীকে আমি ভুল বুঝেছি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

সামান্য কয়েক ঘণ্টায় বহুদিনের পুরনো সম্পর্কটা আবার নিবিড় হয়ে উঠলো। সুহাসিনীর মাধ্যমে যেন আমার হারিয়ে যাওয়া যৌবনে আবার খুঁজে পাচ্ছি।

সুহাসিনী কয়েকদিনের ছুটিতে কলকাতায় আসতে উৎসুক। সুহাসিনীর ওপর দিয়েও এই ক'বছর একই ঝড় বয়ে গিয়েছে। বাড়িতে বাবার অসুখ অকস্মাৎ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বাঙালীর সংসারে এ আর এমন কি নতুন ঘটনা?

সুহাসিনী বললো, "একটানা বারো বছর বাবা বিছানায় শুয়েছিলেন। পাশ ফিরবার শক্তিও ছিল না। ভাগ্যে আমি চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম।"

আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের কথা। এদের কর্মবিমুখতা ও অসহিষ্ণুতার কথাই দিনের পর দিন ভারতবর্ষের

পত্র পত্রিকার শিরোনাম হয়, কিন্তু শত-শত নীরব আত্মত্যাগের কথা কেউ জানতে পারে না।

"সুহাসিনী, তুমি কলকাতায় এসো। আমার বাড়িতে তুমি ইচ্ছে করলে অতিথি হতে পারো। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমার স্ত্রী তোমার অনেক গল্প শুনেছে সুতরাং তুমি কিছু অজানা চরিত্র নও।"

সুহাসিনী শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতে আসবে, রাধাগোবিন্দর সঙ্গে তার আবার দেখা হবে এবং পুরনো প্রেম যে আবার জেগে উঠবে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। কারণ, প্রথম যখন রাধাগোবিন্দর কাছে সুহাসিনী-পুনরাবিষ্কারের খবরটা দিলাম সে তেমন আগ্রহ দেখালো না। রাধাগোবিন্দ শুধু বললো, "তাই বুঝি?"

আমি বললাম, "এতো বছর কেটেছে, কিন্তু বিশ্বাস করবি না সুহাসিনীর কোনোই পরিবর্তন হয়নি। মুখের হাসিটি ঠিক সেই রকম আছে। দুঃখের দেবতা ভাগ্য নিয়ে পরীক্ষা করলেও সুহাসিনীর শরীরে কোনরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেননি। বয়সের তুলনায় সুহাসিনীকে আমার অনেক তাজা মনে হলো।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "তুই চশমাটা পাল্টা। নিজের বন্ধু এবং বান্ধবীদের মধ্যে তুই কোন পরিবর্তন দেখতে পাস না। তারা এখনও কচি খোকা ও কচি খুকী হয়ে আছে তোর চেতনায়।"

আমি রাধাগোবিন্দকে বলেছিলাম, "আমি কোন কথা শুনতে চাই না, তুই অবশ্যই ওর সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়িতে আসবি।"

রাধাগোবিন্দ তখন বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। সে বলেছে, "মালতীর লেটেস্ট খবর শুনেছিস? একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। আমাকে স্বামী ভেবে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেছিল। অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়েছি। পুরুষ এবং নারীর সম্পর্কটা এদেশে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে, তুই তো বিশ্বাস করবি না। মেয়েদের ওপর বেজায় বিশ্বাস করে তুই এখনও লিখে চলেছিস। একদিন খুব বিপদে পড়ে যাবি তুই, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবি মেয়েদের সম্বন্ধে তোর ধারণা একেবারে ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়েছে, মায়ের জাতের মুখোশ পরে মায়াবিনীরাই বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

মালতী সিনাহার ব্যাপারটা আমি ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করেছি। সুধাকর বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনার বন্ধুরও একটু দোষ আছে। মিস্টার শিকদার বেশ কয়েকটা সাক্ষাৎকারে ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। আমি বলেছিলাম, মালতী বিশেষ কোনো

মুড়ে আপনাকে মৃতস্বামী বলে মনে করতে পারে, আপনি বাধা দেবেন না। কিন্তু মিস্টার শিকদার ক্রমশ মেয়েদের সম্বন্ধে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।”

ওখানে যাই হোক, আমার বাড়িতে বেশ ভাল ফলই হলো। আমি দেখলাম, রাধাগোবিন্দ সুহাসিনী অনেকদিন পরে নিজেদের যেন খুঁজে পেলো। নিজেদের সুখদুঃখের অনেক কথা হলো।

সুহাসিনী বললো. “সমস্ত দায়দায়িত্ব চুকিয়ে এখন আমি স্বাধীন হয়েছি। বাবা মা দু'জনেই চলে গিয়েছেন, আমার ছোটবোনটা নিজে বিয়ে করেছে—খুব ভাল ছেলেকে স্বামী হিসাবে পেয়েছে।”

রাধাগোবিন্দ নিজের খবর দিয়েছে। বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার সম্মান সে এতদিন রেখেছে। এক ভাই এবছরেই কাজে ঢুকেছে। শুধু ছোট বোনের বিয়ের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না।

সুহাসিনী ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে, নতুন প্রশ্ন তুলে ওকে লজ্জা দেয়নি। সমস্যা যে টাকার তা বুঝবার মতো শক্তি তার আছে।

আমার আরও চিন্তা ছিল। সুধাকর চ্যাটার্জির রোগীদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে রাধাগোবিন্দ কিছু অর্থ উপার্জন করেছে বটে. কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনে যথেষ্ট ভয়ও ঢুকেছে। এতোদিন মেয়ে বলতে মা এবং বোনদের চিনে এসেছে সুধাকর, কিন্তু এই দুই সম্পর্কের বাইরে যে ভয়ানক নারীজাতের জঙ্গল বিরাজ করছে তা রাধাগোবিন্দ এতোদিন বোধ হয় ভালভাবে বুঝতো না। কুসুমে কীট ও কাঁটার একত্র উপস্থিতির জন্য রাধাগোবিন্দর মানসিক প্রস্তুতি ছিল না।

যে-রাধাগোবিন্দ একসময় নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতো

মনে মনে দিল
লেগে গেল খিল,

সেই রাধাগোবিন্দ মানসিক রোগিনীদের সঙ্গে ডিউটি থেকে ফিরে বলতো, “মনের মিল প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার। মেয়েদের মন বড় ডেঞ্জারাস জিনিস—যতই তোরা নাটক-নভেলে মেয়েদের কীর্তন করিস বেশীর ভাগ ফুলই পাথরের ফুল।”

রাধাগোবিন্দর সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। “গুণে এবং রূপে মেয়েরাই তো জগৎ সংসার আলো করে রেখেছে।”

আমার কথা শুনে হেসেছে রাধাগোবিন্দ। “রূপের কথাই যখন উঠলো, তখন জানিস রূপ মানেই গরব। আমার যে-খাতাটা তোকে

দিয়েছিলাম তাতে রূপসীর গর্ব সম্বন্ধে পড়িসনি?

'ওলো রঙ্গী তোর ঘর পুড়েছে!'
'পুড়ুক গিয়ে ঘর,
আমার তো রঙ পুড়বে না কো
কিবা তাতে ডর?"

"আঃ রাধাগোবিন্দ।" আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি পৃথিবীটা এখন সুধাকর চ্যাটার্জির রোগিনীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়নি। সুধাকর চ্যাটার্জির রোগিনীরাও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে।"

রাধাগোবিন্দ বললো, "তোকে খাতাখানা কেন দিলাম? পড়িসনি?

পিঙ্গল আঁখি, চঞ্চল মতি,
ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি;
পেট, পিঠ, উচ্চ ললাট—
দেখ যদি ছাড়হ বাট।"

"বাট ছাড়লেই হলো!" রাধাগোবিন্দকে আমি ধাক্কা দিতে চাই। মেয়েদের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে ওর নিজের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

রাধাগোবিন্দ বললো, "আমার দিদিমা বলতেন:

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট
লক্ষ্মী পালায় ডরে
ভাত নাই ঘরে।"

আমি বললাম, "রাধাগোবিন্দ, আমাদের গ্রামীন সমাজ মেয়েদের ছোট করে রাখবার জন্যে যতরকম সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে দিয়েছে। এইসব কবিতাগুলো তারই প্রমাণ।"

রাধাগোবিন্দর উত্তর: "এইসব গ্রাম্য কথার মধ্যে শত-শত বছরের সত্য লুকানো রয়েছে—

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী
এ তিনে না বিশ্বাস করি।

এই স্টেটমেন্ট দেবার আগে কত যুগের অবজার্ভেশন প্রয়োজন হয়েছে বল তো?"

"তোর খাতায় লেখা নেই, কিন্তু সুহাসিনীও এবার আমাকে একখানা ছড়া উপহার দিয়েছে:

খ্যান-খেনে জ্বরে আর
প্যান-পেনে ভাতারে
আর কিছু না পারে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে।"

"সুহাসিনী? "সে-ও কি মেয়েদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছে?" কী বুঝতে কী যে বুঝলো রাধাগোবিন্দ!

আমি বললাম, "সুহাসিনী জানে তুই ছড়া সংগ্রহ পছন্দ করতিস, তাই সে-কাজটা সে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। কবিতাগুলো সুহাসিনী তো নিজে রচনা করেনি।"

রাধাগোবিন্দ চুপ করে রইলো। ঘরসংসারী হবার কথা তুলতে সাহস পেলাম না।

এর আগে বিষয়টা একবার তুলেছিলাম। রাধাগোবিন্দ বলেছিল, "তুই তো আমার সংসারের সব কথা জানিস। এখানকার মেয়েদের তো সুধাকর চ্যাটার্জির দয়ায় দেখেছি। কেউ দায়দায়িত্ব চায় না। সবাই চায়—

একলা ঘরের গিন্নী হব
চাবি-কাটি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।"

রাধাগোবিন্দর কথা শুনে আমার মাঝে-মাঝে চিন্তা হয়। আমি এক এক সময় ভাবি সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে ওর পরিচয় না-করিয়ে দিলেই হতো। টাইপ করেই রাধাগোবিন্দ কিছু বাড়তি পয়সা রোজগার করতে পারতো।

সুধাকর চ্যাটার্জি আমার কথা শুনে বলেছেন, "তা হলে বলবেন, ওঁকে আর থেরাপি দিতে পাঠাবো না।"

আমি বললাম, "যে-মানুষটা মেয়েদের এতো শ্রদ্ধা করতো সে এখন আপনার রোগিনীদের সান্নিধ্যে এসে আমাকে কী বললো জানেন?

দিন, ক্ষণ, দূতী
না পায় যুবতী,
তবে হয় সতী।"

সুধাকর হেসে উত্তর দিলেন, "আপনার বন্ধু বেশ রসিক আছেন। ননদ এবং বউয়ের মানোমালিন্যের একটা কেস এসেছে। বাড়ির গিন্নীর টান নিজের মেয়ের দিকে। সেই শুনে আপনার বন্ধু চমৎকার একখানা শ্লোকে আমাদের সবাইকে সেদিন হাসালেন:

পদ্মমুখী মেয়ে আমার পরের ঘরে যায়
খেঁদা-নাকী বউ এসে বাটার পান খায়।"

এই কবিতা আউড়িয়ে সুধাকর চ্যাটার্জির রোগিনী বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাধাগোবিন্দ নাকি তাঁকে বলেছে, "এখন যা-যা হচ্ছে তা অনেক আগেই অন্যত্র হয়ে গিয়েছে। আপনার সঙ্গে ননদের ঝগড়াটা এখন কিছু নতুন ঘটনা নয়।"

সুহাসিনীকে এসব ব্যাপারে একটু সাবধান করে দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু প্রয়োজন হলো না। আমি দেখলাম ছ'মাসের মধ্যে বিভিন্ন কাজের ছুতোয় সুহাসিনী তিনবার কলকাতায় আমাদের অতিথি হলো। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতো না সুহাসিনী—বেরিয়ে পড়তো কোনো কাজের অছিলায়।

তার পরের ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই রকম: রাধাগোবিন্দর মনে মেয়েদের সম্পর্কে ভয় থাকলেও সুহাসিনী সম্পর্কে কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই। ছোট বোনের বিয়েই রাধাগোবিন্দ চিন্তিত। তার মায়েরও মনে ভয় হলো। এই দায়িত্ব পালন না করে রাধাগোবিন্দ বিয়ে করে বসলে তাঁকে অথৈ জলে পড়তে হবে। চিন্তার কারণও রয়েছে, অত্যন্ত সাধারণ আপিসে চাকরি করে রাধাগোবিন্দ। মালিক উল্টোসিধে পথে অনেক কামালেও কর্মীদের তার ভাগ দেন না। "এই অবস্থায় একমাত্র সমাধান লটারি!" রাধাগোবিন্দ ও সুহাসিনী দু'জনকেই আমি রসিকতা করে বলেছি।

এরপর আশ্চর্য ব্যাপার। রাধাগোবিন্দর পোড়া কপালে ছোট একটা লটারির প্রাইজ জুটলো। হাজার পনেরো টাকা পেয়ে রাধাগোবিন্দর সে কি মূর্তি! আমি বললাম, "এটা তোর ভাগ্যে জোটেনি, সুহাসিনীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বন্ধুত্ব হবার পরেই টাকা পেলি—

স্ত্রী ভাগ্যে ধন
পুরুষের ভাগ্যে জন।"

"সুহাসিনী এখনও আমার স্ত্রী নয়।" রাধাগোবিন্দ আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

"যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন," এই বলে কাটিয়ে দিয়েছি আমি।

সুহাসিনীর সান্নিধ্য এবং লটারির কল্যাণে রাধাগোবিন্দর ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ পাল্টে গেলো। প্রেম মানুষকে কতখানি কর্মময় করে তুলতে পারে তার প্রমাণও যেন হাতে হাতে পেলাম।

রাধাগোবিন্দর ছোট বোনের টপ করে বিয়ে হয়ে গেলো। সুহাসিনী তার সায়েবগঞ্জের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে হাজির হলো। হাওড়ার এক প্রাইভেট স্কুলে একটা কম মাইনের চাকরি জুটিয়ে

নিয়েছে সে। রাধাগোবিন্দরও পুরনো অফিস আর ভালো লাগছিল না। আমার জানাশোনা মিস্টার চ্যাটার্জি তাঁর কোম্পানির জন্যে স্টেনো খুঁজছিলেন, ওখানেই পাঠিয়ে দিলাম রাধাগোবিন্দকে। তারপর একদিন সুহাসিনী ও রাধাগোবিন্দর বিয়েও হয়ে গেলো।

ব্যাপারটায় খুব আনন্দ হয়েছিল আমার। আমার জীবনে মিলনান্ত কিছুই ঘটে না। 'তারপর তারা সুখে দিন যাপন করতে লাগলো' এমন ঘটনা চেনাশোনা কারও জীবনে সচরাচর ঘটতে দেখি না। তাই সুহাসিনীকে বলেছি, "আজ আমার ভীষণ আনন্দের দিন। অনেক দিনের পুরানো একটা সম্বন্ধ যে শেষ পর্যন্ত এইভাবে সফল হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। ভগবান তোমাদের সুখী করুন।"

সুহাসিনীর চোখ ছল ছল করে উঠেছে। রাধাগোবিন্দ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি বলেছি, "রাধাগোবিন্দ, তোর স্পেশাল ক্রেডিট। বাবার সংসারের সব দায়িত্ব তুই পালন করেছিস। ছোট ভাইয়ের চাকরি হয়েছে ধানবাদে।"

আমি চোখ বুজে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। অন্তত একবার মিলনাত্মক পরিণতি খুঁজি পেয়েছি আমার প্রিয়জনদের জীবনে।

এরপর আমাদের দেখাশোনা কমে গিয়েছে। তাই তো স্বাভাবিক—শুভ বিবাহের পরে ওরা দু'জনেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, এইটাই তো প্রত্যাশিত। আমিও পুরানো বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে এসেছি। রাধাগোবিন্দ ও সুহাসিনী সেই ভাঙা বাড়ি ছেড়ে, ছোট একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে।

আমি ওদের দেখা না পেলেও মিস্টার চ্যাটারর্জির সঙ্গে সংযোগ রেখেছি এবং তিনি বলেছেন, "মিস্টার শিকদার ভালই কাজ করছেন। লাজুক লোক, বেশী কথা বলেন না, কিন্তু নিজের কাজ খুব মন দিয়ে করেন। চমৎকার ডিক্টেশন নেন।"

আমি আমার স্ত্রীর কাছে রসিকতা করেছি, "নতুন বাড়ি, নতুন চাকরি এবং নতুন স্ত্রী নিয়ে রাধাগোবিন্দ এখন হাবুডুবু খাচ্ছে ; পুরনো বন্ধুদের খোঁজখবর নেবার সময় নেই তার।"

"আহা! বেচারাকে কিছু বলে বসো না যেন, তোমার যা স্বভাব! রাধাগোবিন্দবাবু যে এইভাবে ছোটবোনের বিয়ে দিয়ে নিজের

সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে পারবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি। আমি তো ওকে সেদিন বলেছি, সৎ পথে থেকে, চুরি-ডাকাতি না করে আপনি যা দেখালেন তার তুলনা নেই।"

"রাধাগোবিন্দ কি বললো তোমাকে?" স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করেছি।

"কিছু বললেন না, বরং গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভদ্রলোক যেন ইদানীং কেমন গোমড়ামুখো হয়ে উঠেছেন।"

"ওই ওর স্বভাব। একটু চাপা। একটু বেশী লজ্জা পায়।" আমি স্ত্রীকে বুঝিয়েছি।

স্ত্রীর উত্তর: "সৎপথে কিছু হয় না এই কথাই তো তোমার গল্প-উপন্যাসে রোজ লিখে যাচ্ছো। কিন্তু হলো তো? পারো যদি এটা লেখো—রাধাগোবিন্দবাবুর লাইফটা তো অ্যাভারেজ বাঙালীর লাইফ।"

ভাবি বললাম, "লটারির ছোট প্রাইজ না পেলে তো রাধাগোবিন্দর ফাইন্যাল সমস্যাগুলোর সমাধান হতো না। গল্পটা কিন্তু লটারির প্রচার হয়ে যেতে পারে।"

"হয় হবে!" গৃহিণী মৃদু বকুনি লাগালেন। "লোক এটাও বুঝবে যারা সহজপথে থাকে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের দয়া করেন।"

এরপর আর তর্ক চলে না। পুজোর জন্যে সেবার এই গল্পটাই লিখবো ভাবছিলাম, যার শেষ লাইন হবে, "রাধাগোবিন্দ এখন নতুন চাকরি, নতুন ফ্ল্যাট—নববিবাহিত সুহাসিনীকে নিয়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করছে।"

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সুহাসিনীর টেলিগ্রাম এলো। ডাঃ সুধাকর চাটার্জির সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টেলিফোনে সুধাকর বললেন, "আপনার বন্ধু রাধাগোবিন্দবাবু এখন আর তো খোঁজখবর নেন না?"

আমি বললাম, "মহিলা রোগিনীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো এখন ওর পক্ষে একটু শক্ত। বেচারা বেশী বয়সে বিয়ে করে ফেলেছে!"

আমি যাদের ভালবাসি, যাদের সুখী দেখলে সুখী হতে পারি, তাদের জীবনে বোধ হয় সুখ কমই জোটে।

টেলিগ্রাম পেয়ে কতদিন পরে সুহাসিনীর সংসার দেখতে এলাম, কিন্তু সেখানে বিপর্যয়। মুখ শুকনো করে বসে আছে সুহাসিনী। মেয়েরা যে-বয়সেই বিয়ে করুক বিয়ের পরে তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সুহাসিনীর মধ্যে কিন্তু এখন সেই সজীবতা নেই, তার মুখে মেঘলা আষাঢ়ের অন্ধকার।

আমি সুহাসিনীকে দেখে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। কী হলো, কে জানে রাধাগোবিন্দকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার চিন্তা আরও বাড়ছে।

আমি সুহাসিনীর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বেশি বয়সে বিয়ের অসুবিধে অনেক। নিজেদের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেক সময়েই বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। অনেক দিনের জানাশোনার পরে বিয়ে, তবু বিশ্বাস নেই, আমার চিন্তা বেড়েই চলেছে। বিয়ের ব্যাপারে সুহাসিনীর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল, আমিই তাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছি। এ-বিষয়ে আমার স্ত্রী একটু ভয় পান। তিনি প্রায়ই বলেন, "বিয়ে জিনিসটা ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার—ঘটকালীর মধ্যে কখনও থেকো না, কিছু একটা ঘটে গেলে সারাজীবনই দোষের ভাগী হবে।"

আমি স্ত্রীর অমতেই তখনও পুরুষ ও রমণীর মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিই। আমার বক্তব্য, "কাউকে তো একাজ করতেই হবে। একটু ঝুঁকি থাকলে কী করা যাবে?"

কিন্তু বিয়ের কয়েক মাস পরেই বধূর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলে এবং এরকম শুকনো মুখ দেখলে অবশ্যই মনে হয়, কেন এই সব হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম? কোনো প্রয়োজন ছিল না পরের ব্যাপারে নাক গলানোর, বিয়ে ছাড়াই সুহাসিনী ও রাধাগোবিন্দ তো নিজেদের জীবন নিয়েই বেশ ব্যস্ত ছিল।

সুহাসিনীর কোন নিকট আত্মীয় কলকাতায় নেই। বুড়ো বয়সের বিয়েতে আমিই কন্যা সম্প্রদান করেছি। ভূতপূর্ব সহপাঠিনী যে কন্যাসমা হতে পারে তার নতুন নজীর স্থাপন করেছি আমি। রাধাগোবিন্দর ইচ্ছে ছিল রেজিস্ট্রি আপিসে চুপি-চুপি ব্যাপারটা সেরে ফেলে, কিন্তু সুহাসিনীর ইচ্ছা ছাঁদনাতলার নিরাপত্তায় দাম্পত্য জীবন শুরু করার। তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হয়েছে। ফলে বিবাহ-পরবর্তী আচরণাদিও আমার বাড়িতে পালন করা হয়েছে। ওরা দ্বিরাগমনে এসেছে আমার বাড়িতে। জোর করে ওদের দু'জনকে হনিমুনেও পাঠিয়েছিলাম এবং হনিমুনের পর হাসিমুখ দেখেই আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা বিদায় নিয়েছিল।

সুহাসিনী আমাকে রাধাগোবিন্দর সামনেই বলেছে, "খুব ফাঁড়া গিয়েছে আমার। তোমার ওই ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জির একজন পেশেন্ট ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল।"

"আমারে বধিবে যে সাহেবগঞ্জে বাড়িছে সে। সে বেচারা জানবে কী করে?" রাধাগোবিন্দ নিজেই রসিকতা করেছিল।

আজ শুকনো মুখে সুহাসিনী বললো, "আমার সময় খারাপ চলছে।"

"কেন, কী হলো?"

"ইস্কুলের চাকরিটা আমার চলে গিয়েছে।"

"এতো চিন্তার কী? অন্য ইস্কুলে একটা চাকরি পেয়ে যাবে।" আমি ওকে ভরসা দিই, যদিও আমি জানি ইস্কুলে চাকরি পাওয়াটা এখন বেশ শক্ত ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

"ইস্কুলের চাকরি যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য বিপদ আসবে, তা কে জানতো?" এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো সুহাসিনী।

"কী হলো তোমার? রাধাগোবিন্দর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?" আমি সুহাসিনীকে শক্তি দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

"না, দাম্পত্য কোলাহল তেমন কিছু হয়নি। রাধাগোবিন্দ নিজে মাঝ-মাঝে গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতো এই পর্যন্ত। 'আমাকে বিয়ে না করলেই পারত, বেশ ছিলে সাহেবগঞ্জে,' একথা দু'একবার বলেছে রাধাগোবিন্দ। কিন্তু তারপরেই বিপদ—রাধাগোবিন্দ চারদিন আগে আপিসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।"

অসুখ? এই বয়সে অসুখ-বিসুখ শুনেই আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। রাধাগোবিন্দ ও সুহাসিনী জানে গত মাসেই আমাদের কলেজবন্ধু বিমান হালদার হার্ট-অ্যাটাকে মারা গিয়েছে। কম বয়সের অ্যাটাকগুলোই নাকি মারাত্মক হয় শুনলাম। কিন্তু এসব কথা শুনেও বা কী লাভ?

সুহাসিনী বললো, "কী হলো জানি না, পাশের বাড়িতে টেলিফোন এলো রাধাগোবিন্দ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি পড়ি তো মরি করে ছুটলাম অফিসে। দেখলাম একটা টেবিলের ওপর টেলিফোন ডাইরেক্টরি মাথায় দিয়ে ওকে শুইয়ে রেখেছে।"

সুহাসিনীর মুখেই শুনলাম, রাধাগোবিন্দ অফিসের এক ভদ্রলোকের সামনে বসে ডিক্টেশন নিচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎ অসুখ। চেয়ারেই ঢলে পড়ে রাধাগোবিন্দ।

"বুকের ব্যথা ছিল নাকি?" আমি প্রথমেই জানতে চাই।

"ভীষণ ঘেমে ছিল তখন—ঠিক যেন স্নান করেছে।"

"বাঁ হাতে কোনো তীব্র ব্যথা?" হার্ট অ্যাটাকের যে দু'একটা লক্ষণ আমার জানা আছে তা আমি মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

সুহাসিনী বললো, "সোজা ট্যাক্সি করে ওকে আমি বাড়ি নিয়ে

চলে এসেছি। তারপরেই তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।"

"শ্রীমান কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কিছুতেই শুনলো না, একটু গিয়েছে কালীমন্দিরে।"

"মা কালী একা কী করবেন? ডাক্তার দেখিয়েছো?"

"ডাক্তার দেখেছেন। বলছেন তো হার্ট-ফার্ট ভালই।"

এরপর আমি বলেছি, "কোনো চিন্তা নেই। জানাশোনা স্পেশালিস্ট রয়েছেন, আবার দেখিয়ে দিচ্ছি।"

রাধাগোবিন্দ ফিরে এলো। বড় ডাক্তারের ব্যাপারে খরচের চিন্তা করছে নিশ্চয়। আমি বললাম, "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।"

বৈদ্য এবং জ্যোতিষীর খপ্পরে পড়বে না। এইরকম কী একটা কবিতা রাধাগোবিন্দ আমাদের শোনাতো। ডাক্তারকে ওর ভীষণ ভয়।

"গণকরে না দেখাইও বাড়ী
কবিরাজরে না দেখাইও নাড়ী।"

সুহাসিনী ও আমি দুজনেই বললাম, "চলো আমার জানাশোনা নাম-করা ডাক্তারের কাছে।"

কিছুতেই রাজী হলো না রাধাগোবিন্দ। বললো, সেরকম কিছু হয়নি আমার। আমি ভাল হয়ে গিয়েছি।"

আমি ওকে বললাম, "খুব নামি ডাক্তার, আমার বিশেষ চেনাশোনা।"

অনেকদিন পরে রাধাগোবিন্দ ছড়া কাটলো :

"আমার এমনই হাত-যশ
এ পাড়ায় যদি ঔষধ দিই
ও-পাড়ায় মরে গণ্ডা-দশ!"

আমাদের কথা শুনলো না রাধাগোবিন্দ এবং দুয়েকদিন পরেই সে আপিস যাতায়াত শুরু করলো। এ বিষয়ে আমি ওর সঙ্গে একমত, নতুন চাকরি—শরীর যদি সম্পূর্ণ বিকল না থাকে তাহলে কর্মস্থলে হাজিরা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

দিন দশেক পরে আমি একমনে লিখে চলেছি এমন সময় আমার বাড়িতে আবার টেলিফোন। খোদ মিস্টার চ্যাটার্জি, যাঁকে ধরে রাধাগোবিন্দকে চাকরিতে ঢুকিয়েছিলাম, তিনিই আমাকে ফোন করছেন। রাধাগোবিন্দ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার পাশের বাড়ির ফোন পাওয়া যায়নি, স্ত্রীকে খবর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সব কাজ ফেলে ছুটলাম রাধাগোবিন্দর আপিসে। শুনলাম, সবে ডিক্টেশন নেওয়া শুরু করেছিল, সেই সময় অসুখ। লক্ষণ দেখলে করোনারি

অ্যাটাক মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

আপিসে ডাক্তার এসেছিলেন। তিনি শুইয়ে রেখে গিয়েছেন। অফিসের ডাক্তার বেশী হাঙ্গামায় যেতে চান না। বলেছেন ভালভাবে চেক-আপ করাতে।

ট্যাক্সি চড়িয়ে রাধাগোবিন্দকে তার বাড়িতে নিয়ে এলাম। গাড়িতে রাধাগোবিন্দর চোখে জল। "বেশ ছিলাম। বুড়ো বয়সে বিয়ের পরে কী হলো বল তো? এখন যদি হার্টের রোগী হই তাহলে কী হবে?"

"কী আবার হবে? চিকিৎসা করাবি। কত রকমের রোগ নিয়ে কত লোক ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরি করছে।" আমি সান্ত্বনা দিই বন্ধুকে।

আপিসে দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়েছে শুনে সুহাসিনী কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমি ওকে অড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, "তুমি এইভাবে ভেঙে পড়লে ওর অসুখ বেড়ে যাবে! এমনিতেই বিয়ের পরে ওর মনের জোর অনেকটা কমে গিয়েছে।"

এবার আমি কোনো কথা শুনিনি। জোর করেই আমাদের বিপত্তারণ বন্ধু ডাক্তার জগবন্ধু বিশ্বাসের চেম্বারে হাজির করিয়েছি। জগবন্ধুও আমাদের সহপাঠী, ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে অনেক খেতাব জোগাড় করে এনে বিপুল প্রসার জমিয়ে বসেছে সে। কিন্তু এখনও বন্ধুদের প্রতি দয়া আছে, খুব মন দিয়েই সে রাধাগোবিন্দর স্বাস্থ্য অনুসন্ধান শুরু করলো।

বুকের ইসিজি, লাংস-এর এক্স-রে এবং নানা রকম পরীক্ষার পরে ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় জগবন্ধু যা লিখেছিলো তাকে ইংরেজীতে বলে—ক্লিন বিল্ অফ হেল্‌থ। সুহাসিনীকে ডেকে জগবন্ধু বলেছিল, "কোনো চিন্তা নেই। আরও পাঁচজন সুস্থ লোকের মতোই রাধাগোবিন্দ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করবে! অবশ্যই সে আপিস যাতায়াত আরম্ভ করবে।" দেখলাম এই একটি ব্যাপারে সুধাকর চ্যাটার্জি ও জগবন্ধু বিশ্বাসের মধ্যে কোনো মতের অমিল নেই। অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা কাজের লোককে বসিয়ে দিতে চান না। "রেসের ঘোড়াকে বিশ্রাম দিলেই বিপদ।" জগবন্ধু একবার আমাকে বলেছিল।

আমি খুশি হয়ে বললাম, "আর কী? রাধাগোবিন্দ আবার অফিস যাও কাল থেকে। চুটিয়ে কাজ শুরু করো আগের মতো।"

রাধাগোবিন্দর অফিসে মিস্টার চ্যাটার্জি আমাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওর কী ফিট হয়ে যাওয়ার রোগটোগ আছে?

"জোর করেই বলতে পারি—না। কারণ সেই ছোটবেলা থেকে

রাধাগোবিন্দকে আমি দেখে আসছি কখনও সে অসুস্থ হয়েছে শুনি নি। ওর শরীর খুব শক্ত। এই বিয়ের পরেই দু'বার কী যে হয়ে গেলো।"

"বিয়ের আগেই তো যতো হৃদয়ঘটিত ব্যথা! বিয়ের পরে তো কেবল ফুসফুস থেকে দীর্ঘশ্বাস।"

মিস্টার চ্যাটার্জি রসিকতা করলেন।

এরপর কয়েকদিন নিজের কাজে জড়িয়ে ছিলাম। কোনো খোঁজখবর নিতে পারিনি ওদের। সেদিন ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জির চেম্বারে গিয়েছিলাম একটু মানসিক বিশ্রামের জন্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ আনন্দ পাই, মনের সব অবসাদ দূর হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

আমাদের গল্পের মাঝেই একবার রাধাগোবিন্দর অফিসে ফোন করলাম। হতভাগা সুখে জীবন যাপন করার সময় আমার খোঁজ নেয় না।

টেলিফোন করতেই রাধাগোবিন্দ যাঁর স্টেনো সেই মিস্টার দাশগুপ্ত ধরলেন, "শংকরবাবু, আপনার টেলিফোনটা গড্ সেন্ট। আপনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। আপনার বন্ধু রাধাগোবিন্দ শিকদার আবার অসুস্থ বোধ করছেন। এবার বুকে ব্যথাট্যথা নেই, কিন্তু ভীষণ ঘামছেন। উনি বলছেন, উনি ঠিক হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমার ভাল মনে হচ্ছে না।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। সুধাকর চ্যাটার্জি সমস্ত ব্যাপারটাই জানেন; আজকের কথাও শুনলেন। তারপর আমাকে ওদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। যা জানা ছিল সব বললাম।

সব শুনে ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "একবার ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

সুধাকর চ্যাটার্জিকে করজোড়ে বললাম, "এর আগেও আপনি রাধাগোবিন্দর অনেক উপকার করেছেন, এবার যদি একটু দেখে দেন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। রাধাগোবিন্দ আমার দুঃখদিনের বন্ধু, ওকে আমি সুখী দেখতে চাই।"

নব বিবাহিতা স্ত্রীর সামনে স্বামীকে মানসিক চিকিৎসকের কাছে যাবার প্রস্তাব দেওয়া যে নিরাপদ নয় তা আন্দাজ করেই রাধাগোবিন্দকে আমি একদিন বাড়ির বাইরে নিয়ে এলাম। রাধাগোবিন্দর মনেও বেশ

দুশ্চিন্তা ঢুকেছে। সে বললো, "এই চাকরি বোধ হয় বেশী দিন থাকবে না।"

"কেন থাকবে না ?" চুরি করলে মানুষের চাকরি যায়। এক আধবার অসুখ করলে…"

রাধাগোবিন্দ যেন কেমন হয়ে গেলো। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললো, "তুই কেন এতোবছর পরে সুহাসিনীর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করিয়ে দিলি ? আমি তো বেশ ছিলাম, আমার কোনো অসুখ ছিল না।"

আমি বললাম, "ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জি দেখা করতে বলেছেন। বউকে কিছু বলার দরকার নেই। ওখানে যা। উনি যা বলেন তা শুনবি।"

তারপর আমি সুধাকরের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছেন, "পরপর তিনদিন অন্ধকার ঘরে লাল আলো জ্বালিয়ে কথাবার্তা বলেছি। ব্যাপারটা মানসিক হলেও হতে পারে। কিন্তু অফিসে কোন অশান্তি আছে কিনা একটু জানা দরকার। আপনি একটু খোঁজখবর করুন।"

রাধাগোবিন্দর অফিসের মিস্টার দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়ে এসেছি।

সুধাকরকে বললাম, "না, অফিসে কোনো অশান্তি নেই। সবাই রাধাগোবিন্দকে ভালবাসেন, ওর কাজের খুব প্রশংসা করেন।"

সুধাকর জিজ্ঞেস করলেন, "তিন দিনের বর্ণনা শুনে এসেছেন ?"

অবশ্যই শুনে এসেছি। শেষ দিনে ডঃ জগবন্ধু বিশ্বাসের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট পেয়ে রাধাগোবিন্দ বেশ খুশী মনেই ছিল। তারপর মিস্টার বিজয় দাশগুপ্ত পরপর তিনখানা চিঠি ডিক্টেশন দিয়েছেন। চতুর্থ চিঠি ডিক্টেশন দেওয়ার মাঝখানে মিস্টার চ্যাটার্জি ডেকে পাঠালেন বিজয়বাবুকে। ফিরে এলেন যখন তখনও রাধাগোবিন্দ শর্টহ্যাণ্ড খাতা নিয়ে টেবিলে বসে আছে, হাসিখুশি লোক। মিস্টার দাশগুপ্ত তারপর চিঠিখানা শেষ করার জন্যে বললেন, "যতদ্দুর বলেছি প্লিজ রিড আউট।"

তারপরই মিস্টার দাসগুপ্ত দেখেন রাধাগোবিন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে উঠেছে, ওইখানেই শুয়ে পড়তে চাইছে।

তার আগের দিনেও ওই ডিক্টেশনের সময়েই অসুস্থ হয়েছে অথচ রাধোগোবিন্দ ডিক্টেশনে ভয় পাওয়ার ছেলে তো রাধাগোবিন্দ নয়।

ডাঃ সুধাকর চ্যাটার্জি আমার কাছে সব শুনে মিস্টার দাশগুপ্তর টেলিফোন নম্বর নিলেন। এবং পরের দিন আবার আসতে বললেন

পরের দিন যেতেই তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে রোগটা আন্দাজ করতে পারছি। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনি এখনই রাধাগোবিন্দর অফিসে যান এবং যা বলছি তাই করুন।"

নির্দেশ মতো আমি প্রথমে মিস্টার চ্যাটার্জির ঘরে গেলাম এবং সেখানে মিস্টার দাশগুপ্তকে ডেকে পাঠানো হলো। রাধাগোবিন্দ জানে না যে আমি ওর অফিসে এসেছি।

আমার সঙ্গে কথাবার্তার পরে মিস্টার দাশগুপ্ত নিজের টেবিলে ফিরে গেলেন এবং আমি চ্যাটার্জির ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পরেই হৈ হৈ কাণ্ড। রাধাগোবিন্দ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে মিস্টার দাশগুপ্তর টেবিলে। মিস্টার দাশগুপ্ত আমার কাছে ছুটে এলেন। "আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আপনার ডাক্তার ঠিক রোগ ধরেছেন। ভদ্রলোক চমৎকার সুস্থ ছিলেন। যেমনি আপনার কথা মতো রিকোয়েস্ট করলাম, 'যদ্দুর বলেছি প্লিজ রিড আউট,' অমনি ডিক্টেশন পড়া তো দূরের কথা উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলাম সুধাকর চ্যাটার্জির চেম্বারে। বললাম, "তাজ্জব ব্যাপার, আপনি যা আন্দাজ করেছেন তাই।"

সুধাকর বললেন, "উনি যখন কাজ করবেন তখন কী লিখেছেন তা রিড আউট করতে না বললে চলে না?"

আমি নিজে একদিন স্টেনোর কাজ করেছি। যিনি ডিক্টেশন দিচ্ছেন তিনি জিজ্ঞেস করতে পারবেন না আগে কী বলেছেন তা কেমন করে হয়?"

সুধাকর চ্যাটার্জি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন, "না হয় দু'খানা চিঠি নষ্ট হলো।"

আমি বললাম, "এই রিড আউটটা প্রায়ই প্রয়োজন হয়, ব্যাকগিয়ার না থাকলে মোটর গাড়ি রাস্তায় বের করা চলে? আপনি বলুন।"

সুধাকর চ্যাটার্জি এবার রাধাগোবিন্দ সম্বন্ধে নিজের নোটগুলো দেখতে লাগলেন। রাধাগোবিন্দর সঙ্গে বিভিন্ন একান্ত সিটিং-এর সময় তিনি অনেক কথা লিখে নিয়েছেন।

আমি বললাম, "অন্ধকার ঘরে ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় লাল আলো জ্বেলে আপনারা কী করেন?"

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "খানিকটা সম্মোহন বলতে পারেন। আসলে আমরা রোগীকে বিনা ওষুধেই রিল্যাক্স করিয়ে দিই, যাতে প্রশ্নোত্তরের সময় তাঁরা কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায়।"

সুধাকর আরও বললেন, "মনের রোগে তো মলম লাগানো যায় না। অনেক সময় রোগটা কী তা জানাটাই একমাত্র চিকিৎসা। কেন একটা বিশেষ অবস্থা হচ্ছে তা বুঝতে পারলে রোগী নিজেই ভাল হয়ে যায়। কখনও কখনও অবশ্য পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরিবেশ থেকে এদেশের রোগীরা প্রায়ই কোনো সাহায্য পায় না, বরং নিষ্ঠুর পরিস্থিতি তাদের আরও অসুস্থ করে তোলে।

আমি বললাম, "রাধাগোবিন্দর জন্য একটা কিছু করুন, ডক্টর চ্যাটার্জি। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। বেচারা নতুন ঘরসংসার বেঁধেছে!"

"কিন্তু অফিস থেকে হেল্প পাচ্ছি কই?" সুধাকর চ্যাটার্জি চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

আমি বললাম, "ব্যাসদেব যখন গণেশকে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত ডিক্টেশন দিয়েছিলেন এবং প্রজাপতি গণেশ যখন চার হাতে তা লিখে নিতে রাজী হয়েছিলেন তখন গনেশ একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন। ডিক্টেশন দিতে-দিতে থামা চলবে না। তার অর্থ, কী লিখেছি, 'প্লিজ রিড আউট' বলবার সুযোগই হচ্ছে না।"

"মহাভারতের ঐ ব্যাপারটা রাধাগোবিন্দবাবুর অফিসে বলুন না।" সুধাকর চ্যাটার্জি আমাকে অনুরোধ জানালেন।

আমি বললাম, "মনে রাখবেন চাকরিটা ওর নতুন। এই রকম অসুস্থতা থাকলে নির্ঘাত কাজটা যাবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "রাধাগোবিন্দবাবু সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?"

"এরকম সৎ ও আদর্শবাদী লোক বেশী দেখিনি। নিজের দুর্ভাগ্য হাসি মুখে মেনে নিয়ে এতোদিন জীবন চালিয়েছে।"

"আগের চাকরিটা রাধাগোবিন্দবাবু হঠাৎ ছাড়লেন কেন?"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা ঠিক জানি না। মাইনে-টাইনে তেমন ভাল ছিল না।"

সুধাকর সন্তুষ্ট হলেন না। "মাইনে এখানেও এমন কিছু নয়। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে কেউ এইভাবে পুরনো চাকরি ছেড়ে আসে না। আপনি একটু খোঁজখবর করুন।"

"আপনি তো রাধাগোবিন্দকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"তাকে যা জিজ্ঞেস করবার তা আমি করবো। আপনি খোঁজখবর রাখুন।" সুধাকর হেসে বললেন, "রোগীর পরিবেশটা স্পষ্ট জানা থাকলে

মানসিক চিকিৎসার অনেক সুবিধে হয়। অসংখ্য ঘটনার ভিড়ে রোগী সহযোগিতা করলেও অনেক সময় আসল ঘটনাটা খুঁজে পায় না।"

সুধাকর চ্যাটার্জির এই প্রফেশন আমাকে আকর্ষণ করে। তিনি যেভাবে বিনা ওষুধে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করেন তাও আমার ভাল লাগে।

সুধাকর বললেন, "পৃথিবীটা হলো ছোটছেলেদের ইস্কুলের মতো —সেখানে হাজার রকম নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার একটা লঙ্ঘন করলেই শাস্তি। এইসব আইন মানতে-মানতে মানুষ অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে; তখনই মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়। অথচ মানুষের যখন জন্ম হয়েছিল প্রকৃতি তখন তাকে বনের বাঘ থেকে আলাদা করেনি—সে স্বাধীন। মন এবং দেহ যা চায় তাই করতে পারে সে।"

সুধাকর বললেন, "মৃত্যুর আগে ইস্কুলের কড়া নিয়মকানুন থেকে মানুষের মুক্তি নেই, কোথাও কোনো নিয়মভঙ্গ হলেই ভয়াবহ শাস্তি দেন মা, বাবা, কখনও ইস্কুলের মাস্টার, কখনও অফিসের মালিক, কখনও আদালত, কখনও স্ত্রী।"

আমি সুধাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, "শাস্তিদাতার হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে এসে মানুষ আগে ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করতো, মানুষ সেখানে মায়ের-কোলে শিশুর মতো। যত দোষই করুক তার ক্ষমা আছে। এখন অনেকেই ছুটে আসে ডাক্তারের চেম্বারে। আমাদের কাছেও ন্যায়-অন্যায়ের জন্য কোনো পুরস্কারও নেই, তিরস্কারও নেই। কেউ যদি বলে কোনো একটি দেহকে পাবার জন্যে সে সারাক্ষণ ব্যাকুল হয়ে ছিল তা হলে আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি না, তাকে শাস্তির ভয়ও দেখাই না।"

"তার মানে আপনারা অন্যায়কে মেনে নেন?"

"মান্য-অমান্যর প্রশ্ন নয়, আমরা তার ঊর্ধ্বে উঠে যাবার চেষ্টা করি; নিজেকে লুকোতে গিয়ে, ঢাকতে গিয়েই তো মানুষ নানা বিপদ ডেকে আনে, সে সব বিপদ প্রকৃতির অন্য জীবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

আমি মন দিয়ে সুধাকরের কথা শুনে যাচ্ছি। ডঃ চ্যাটার্জি বললেন, "একটা তো জায়গা চাই যেখানে মানুষ নিজেকে মুক্ত মনে করবে, যেখানে সংসার-ইস্কুলের আইন-কানুন তাকে তাড়া করবে না। যাদের বন্ধু আছে অনেক সময় তারা কিছুটা হাল্কা হয়ে যায়।"

আমি বললাম, "রাধাগোবিন্দর বন্ধু নেই বললেই চলে। আমার সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখন সে আমার কাছেও মন খুলে কথা বলে না। তা ছাড়া ছোট বয়সে রাধাগোবিন্দর মা মারা গিয়েছিল।"

রাধাগোবিন্দ এর পর কয়েকবার সুধাকর চ্যাটার্জির চেম্বারে এসেছে। সুহাসিনীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সুধাকর তাকে জিজ্ঞেস করেছেন। হাজার হোক যে-লোকটা সারাজীবন স্টেনোগ্রাফার হিসেবে যা লিখে গিয়েছে তা রিড-আউট করে গিয়েছে সে বিয়ের পর এমন হলো কেন?

সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছি আমি। সে-বেচারা ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছে। সে বলেছে, "বেশী বয়সে বিয়ে হলেও আমরা সব বিষয়ে নর্মাল। আমাদের দু'জনের মধ্যে ভীষণ টান আছে। দৈহিক মানসিক কোনো বিষয়েই কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি।"

সুহাসিনীর সেই খবর সুধাকর চ্যাটার্জিকে আমি দিয়েছি। সুধাকর বললেন, "আমি তিনদিন ধরে দাম্পত্য রিলেশন সম্বন্ধে রাধাগোবিন্দ-বাবুকে প্রশ্ন করেছি। দু'জনে বেশ ভাল মিল হয়েছে—মেড্ ফর ইচ আদার বলতে পারেন। রাধাগোবিন্দবাবু বলেছেন, অনেকদিন পরে শংকরের বাড়িতে সুহাসিনীকে দেখে আমার মেয়েদের সম্পর্কে ভয় যা ছিল তা কেটে গেলো, আমি তো ঠিকই করেছিলাম, বিয়ে-থা করবো না, শেষ জীবনটা কোন মতে একলা কাটিয়ে দেবো।"

সুধাকর যেসব কথা বলেছেন সে-সব নিয়ে আমিও চিন্তা করেছি। তাঁকে বলেছি, "আপনারা যখন শোনেন রোগীর মধ্যে প্রচণ্ড কোনো অন্যায়ের ইচ্ছা রয়েছে তখন আপনারা তা সাপোর্ট করেন? যদি কেউ কোন দুষ্কর্ম করে এসে আপনাকে তার বর্ণনা দেয় আপনি তখন কেবল তা মুখ বুজে শুনে যাবেন?"

সুধাকর বললেন, "আমাদের কাজ হলো রোগের কারণটা খুঁজে বের করা—অপরাধ ও সৎকর্মের তিরস্কার ও পুরস্কারের জন্যে সংসারে অনেক পুলিশ এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছেন, সেখানে আমরা ভিড় বাড়াই না। আমাদের একমাত্র কাজ চিকিৎসা—মানুষকে সুস্থ করে তোলা।"

"তাহলে লাল আলো জ্বালা নির্জন ঘরে আপনারা অনেক ডাস্টবিনের নোংরামি সহ্য করেন!"

"একমাত্র আমরাই প্রতিদিন বুঝতে পারি সমাজ কোনদিকে যাচ্ছে- ডাস্টবিনের সংখ্যা কী ভাবে বাড়ছে। ধর্মে বিশ্বাস যত কমছে মানসিক পরিস্থিতি তত গুরুতর হচ্ছে। হিন্দুধর্মের অনেক শক্তি ছিল।"

"কী রকম?" আমি জিজ্ঞেস করি।

ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "আপনি তো জানেন, স্বামী বিবেকানন্দর কথা। কোনো কোনো ধর্মে নিরন্তর বলছে তুমি পাপী—মানুষের পাপের জন্যে ঈশ্বরের পুত্রকে শেষ পর্যন্ত চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

তুমি পাপের বোঝা কমাও। আর আমরা বলেছি, জগৎ সংসারে কোনো ব্যাটা পাপী নয়। আমরা সবাই অমৃতস্য পুত্রা—স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ আমরা। আমাদের মধ্যেই 'তিনি' বিরাজ করছেন—আমাদের আত্মা অবিনাশী। সব ধর্মই স্বর্গে যাবার লোভ দেখায়, কিন্তু এখানেই মানুষ স্বর্গের আনন্দের বদলে মোক্ষ বা মুক্তি কামনা করছে।"

সুধাকর বললেন, "স্বয়ং বিধাতা আমাদের কপালে জয়তিলক পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই বিশ্বাস যদি সবার মধ্যে বেঁচে থাকতো তাহলে আমার চেম্বার খালি হয়ে যেতো।"

সবই তো হলো, ঘুরে ফিরে কেবল রাধাগোবিন্দর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সুধাকর বললেন, "চিন্তা করবেন না। আমাদের এক-একটা কেস ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন। তফাতের মধ্যে এই যে আমরা গল্পের শেষে দোষীকে পুলিসের হাতে দিয়ে হাততালি কুড়োই না। আমরা মানুষকে তার নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখার ব্যবস্থা করি। আপনার বন্ধুর ব্যাপারেও একটা আইডিয়া মাথায় আসছে। তার আগে আপনি একটু খোঁজ-খবর করুন।"

আমি আবার মিস্টার চ্যাটার্জির অফিসে গিয়ে মিস্টার দাশগুপ্তর সঙ্গে গোপনে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। মিস্টার দাশগুপ্ত কোন ঘরে বসেন না। একটুখানি কাচ দিয়ে এমন নিচু পার্টিশন দেওয়া যে চেয়ারে বসে সমস্ত হল ঘরটার কর্মীদের দেখা যায়। মিস্টার দাশগুপ্ত যেখানে বসেন সেটা সিঁড়ির কাছে। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে গেলে তাঁর নজর এড়ানো শক্ত।

সুধাকরের কথা মতো প্রথম দিনে কী হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ শুনলাম। দাশগুপ্ত বলেন, "তখন বুঝিনি কিন্তু এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার। যেমনি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছি কী বলেছি প্লিজ রিড আউট, অমনি ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অদ্ভুত ব্যাপার মশায়, আমি কখনও ওঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি।"

"তাই তো মনে হয়। শুধু তার আগের দিনে বোধহয় আমি যখন ডিক্টেশন দিচ্ছিলাম সেই সময় একজন পুলিস সার্জেন্ট আমাদের অফিসে কারও নামে ট্রাফিক কেসের সমন ধরাতে এসেছিল। পুলিস সোজা দোতালায় এসে ওয়ারেন্ট হাতে কাউকে খুঁজছে সেই সময় রাধাগোবিন্দবাবুও হাঁ করে তাকাচ্ছেন সেই দিকে। আমিও ঠিক সেই সময় আপিসে পুলিস দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তারপরেই জিজ্ঞেস করলাম, কী বলেছি প্লিজ রিড আউট। ভদ্রলোক আমার

কথা কানেই নিলেন না। আমি তখন বললাম দেখুন তো পুলিস কী চাইছে? তখনও রাধাগোবিন্দবাবু আমার নির্দেশ মানলেন না, চুপ করে চেয়ারে বসে রইলেন। সেই সময়ে হয়তো আমি বিরক্তি প্রকাশ করে থাকতে পারি। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই উঠে গেলাম পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে। আর ডিক্টেশন দেওয়া হলো না।”

সামান্য ব্যাপার। এটা তো হিসাবের মধ্যেই ধরা যায় না। তবু চেম্বারে ফিরে এসে সব বলেছি ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জিকে। তিনি ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার রাধাগোবিন্দর রেড-লাইট সেসন নিয়েছেন। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাননি।

সুধাকর তবু বললেন, “হতাশ হবেন না। সন্ধানপর্বে হতাশ হলে মানসিক ডাক্তারের কাজ চলে না। তবে আপনাকে আরও একটু কাজ দেবো। রাধাগোবিন্দবাবুর পুরনো অফিসে চাকরি থেকে রিজাইন দেবার ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে আসুন।”

“ওই জায়গাটা অপয়া ছিল, ডক্টর চ্যাটার্জি। চাকরি ছাড়বার পরেই তো আমার বন্ধু লটারিতে ছোট একটা প্রাইজ পেলো। যদি ফার্স্ট প্রাইজ পেতো তা হলে তো হিল্লে হয়ে যেতো। যাইহোক ভাগ্যটা খুললো ওইখানেই।”

সুধাকর বললেন, “আর একটা ব্যাপার, আপনার বান্ধবী সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করবেন। ঠিক কোন সময়ে রাধাগোবিন্দবাবু তাঁকে বিয়ে করার আগ্রহ দেখান।”

“সে আগ্রহ তো আমি নিজের চোখে কলেজ লাইফে দেখেছি, আমি বলি। মৃদু হেসে সুধাকর বললেন, “আমরা দ্বিতীয়পর্বের কথা বলছি।”

“আপনি কি দ্বিতীয়া কোনো রমণীর অনুরাগ সংবাদ রাধাগোবিন্দর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন?”

সুধাকর বললেন, “রহস্যের উদ্ঘাটন হলে সবই জানতে পারবেন। আমি বলেছি, আমাদের এই অনুসন্ধানে মানুষের কোনো ন্যায়-অন্যায় নেই, আপনার বন্ধু যদি অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে গোপন কোনো সম্পর্ক রেখেও থাকেন আমরা তার নৈতিক দিক নিয়ে মোটেই ব্যস্ত হবো না।”

খুব খারাপ লাগছিল। সুহাসিনী আমার বান্ধবী হলেও তাকে ব্যক্তিগত প্রণয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করার সম্পর্ক নয় আমাদের। আমরা অনেক মিশেছি কিন্তু কখনও কারও প্রাইভেসিতে নাক গলাইনি। মেয়েরা লজ্জায় পড়তে পারে এমন কোনো প্রশ্ন কখনো তুলিনি।

কিন্তু সুহাসিনীকে সব বলতে হলো। সুহাসিনী প্রথমে লজ্জা পেলো। কিন্তু মুখ বুজে বসে রইলো না। টুক করে ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা চিঠির বাণ্ডিল নিয়ে এলো। বললো, "তোমার বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা হবার পরে যা-যা ঘটেছে তা সব এই চিঠির বাণ্ডিলে পাবে। আমার লেখা এবং ওর লেখা সব চিঠি বিয়ের পরে মিশিয়ে ফেলেছি, দিন অনুযায়ী সাজিয়েছি।"

আমি ওই সব চিঠি মোটেই পড়তে চাই না। সুহাসিনীকে বললাম, "তুমিই দু একটা কথা বলে দাও, আমি ওসব দেখবো না।"

সুহাসিনী স্বীকার করলো, অনেক দিন পর দু'জনে দেখা হবার পর সুহাসিনীই প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিল। পর পর অনেকগুলো প্রেমপত্র লিখেছে সে, কিন্তু রাধাগোবিন্দর দিক থেকে কোনো প্রতিধ্বনি আসে নি। রাধাগোবিন্দ বরং বুঝিয়ে দিয়েছে, বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা তার মাথায় নেই। যা পারিবারিক অবস্থা তাতে রাধাগোবিন্দর পক্ষে বিয়ের কথাই ওঠে না।

"তারপর এক অঘটন ঘটলো। সেবার তোমার এখানে এলাম। তুমি জোর করে দু'জনকে একসঙ্গে সিনেমায় পাঠালে। রাধাগোবিন্দ সিনেমা হলেও আমাকে কিছু বললো না। আমি পরের দিন নিজের কাজে ফিরে গেলাম। এবং সেখানে গিয়েই রাধাগোবিন্দর মস্ত বড় চিঠি পেলাম। সেই চিঠিতে প্রথম সে আমাকে ভালবাসা নিবেদন করেছে এবং লোকে যা সব লেখে তাই জানিয়েছে।"

রাধাগোবিন্দর সেই চিঠিটা সুহাসিনী বাণ্ডিল থেকে বের করে দিলো। সেই চিঠি নিয়ে আমি আবার ছুটলাম ডাঃ সুধাকর চ্যাটার্জির কাছে। তিনি এক নজরে চিঠিটা দেখে নিলেন। "এইখানেই তাহলে বিয়ের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।" তারিখটা তিনি খাতায় নোট করে নিলেন। "কিন্তু কী এমন ঘটনা ঘটলো যে রাধাগোবিন্দর বিয়েতে আগ্রহ হলো? তার আগে তো বিয়ের কথা ভাবতেই পারছিলেন না।"

"প্রজাপতির নির্বন্ধ! জানেনই তো। কে কখন ধরা দিতে রাজী হবে বলা শক্ত", আমি বললাম।

কিন্তু ডাঃ সুধাকর চ্যাটার্জি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। "এ-কালে প্রজাপতিও অনেক হিসেব করে চলে, শংকরবাবু। বিশেষ ঋতু ছাড়া তাদের দেখতে পান?"

সুধাকর বললেন, "আপনি ওই পুরনো অপিসটার খবর নিন। কী হয়েছিল ওখানে?"

"ওই অপিসটা মোটেই ভাল নয়, ডক্টর চ্যাটার্জি। ওদের অনেক কীর্তিকাহিনী শুনেছি আমার বন্ধুর মুখে। অনেক হিসেবের খাতা। বহু কাঁচা টাকা। তবু কর্মীদের কিছু দেবে না। খোদ মালিকের দু'জন বিশ্বস্ত সহকারী—আমাদের রাধাগোবিন্দ এবং আরেক জন মিস্টার দীননাথ শর্মা।"

সুধাকর চ্যাটার্জি তবু খোঁজখবর করতে বললেন। "এতোটা যখন করেছেন তখন আর একটু দেখুন না।"

আমি দু'দিন পরেই ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে রাধাগোবিন্দ আরেকদিন আপিসে অসুস্থ হয়েছে। আমার আশঙ্কা তার চাকরি এবার থাকবে না। এইরকম স্টেনোগ্রাফারকে আপিসে কে রাখবে?"

সুধাকরকে বললাম, "বাস্ত লোক। ঐ পুরনো কোম্পানির মালিক মুখ খুলতে চাইলেন না। রাধাগোবিন্দ যে অত কম মাইনেতে অত দিন কাজ করে এসেছে তার জন্যে কোনো অনুভূতি নেই। তখন ভাবলাম একবার ওর বন্ধু দীননাথ শর্মার খোঁজ করি। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। দীননাথের চাকরি গিয়েছে কিছুদিন আগে। মালিক এমন পাজি যে দীননাথের নামে থানায় কীসব বলে এসেছিল। একদিন বোধহয় পুলিস আপিসেও এসেছিল। দীননাথের ঠিকানাটা আজ কালের মধ্যেই পেয়ে যাবো তখন আপনি পুরো ব্যাপারটা জানতে পারবেন।"

সুধাকর গম্ভীরভাবে বললেন, "দীননাথকে এখন খুঁজে বের করতে হবে না। আপনি বরং রাধাগোবিন্দকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন। আজ কাল পরশু তিনটে দিন আমাকে ছেড়ে দিন। তারপর দেখা যাক কী হয়। আপনি পরশু দিন সন্ধ্যেবেলায় অবশ্যই আসবেন।"

তিন দিন প্রবল ছটফটানির মধ্যে কাটলো। এই জটিল রোগের কী চিকিৎসা হবে তা আমার মাথায় আসছে না। সুধাকর চ্যাটার্জির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে থাকা ছাড়া আমাদের কোনো পথও নেই?

এর মধ্যে সুহাসিনীও এসেছে, খুব কান্নাকাটি করেছে। বলেছে, "বেশ ছিলুম সায়েবগঞ্জে।" আমার নিজেরও দুঃখ হচ্ছে—সেবার কেন যে আমি সাহেবগঞ্জ বঙ্গ সাহিত্য সভায় গেলাম। কেন সুহাসিনীকে কলকতায় আসবার লোভ দেখালাম!

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ঠিক আটটায় সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর চেম্বার তখন খালি হয়ে গিয়েছে। আমাকে দেখে খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠলেন ডাঃ চ্যাটার্জি। "হয়েছে, সমস্যার সমাধান হয়েছে অবশেষে! এই রকম পিকুলিয়র কেস আমি বেশী পাইনি।"

"রাধাগোবিন্দ তাহলে ভাল হয়ে যাবে?" আমি ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করি।

"অবশ্যই হবে, আপনাকে যা বলবো তা যেন আপনার মাথাতেই থাকে। রাধাগোবিন্দ যেন কখনও বুঝতে না পারেন যে আপনি ব্যাপারটা জানেন। সুহাসিনী দেবীরও এসব জানবার কথাই ওঠে না। আপনার বন্ধু ভীষণ সেনসিটিভ মানুষ—আপনাদের কাছে ছোট হয়ে গেলে ওঁর জীবনে কিছুই থাকবে না, হয়তো আত্মহত্যা করে বসবেন।"

"ব্যাপারটা কী বলুন?"

ডক্টর সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "শুনুন, সুহাসিনীকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করবার জন্যে আপনার বন্ধু মরীয়া হয়ে উঠে একটু অন্যায় করেছিলেন। ওই সে ছোট লটারি পাওয়া-টাওয়া ওসব বাজে কথা। দীননাথ শর্মা যখন মনিবকে ঠকিয়ে টাকা সরছিলেন তখন রাধাগোবিন্দবাবুও যোগসাজশ করে তার থেকে কিছু ভাগ বসাচ্ছেন। এতোদিন যিনি এতো সৎ ছিলেন তিনি বোনের দায় কাঁধ থেকে নামাবার জন্যে সুযোগ হাতছাড়া করতে পারলেন না। তারপর ভয় পেয়ে আপনার বন্ধু চাকরি ছেড়ে দিলেন। আপনিই তাকে নতুন জায়গায় চাকরি করে দিলেন। কিন্তু দীননাথ শর্মাকে যে পুলিসের হাতে পড়তে হয়েছে সেখবর তার কানে গিয়েছে। পুরনো মালিক অবশ্য কাউকেই বেশী ঘাঁটাতে চাননি, কারণ তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টসে অনেক গোলমাল। তবু আপনার বন্ধুর অবচেতন মন থেকে পুলিসের ভয় দূর হইনি। পুলিসকে বিশ্বাসও নেই। তারপর নতুন আপিসে যেদিন হঠাৎ একজন পুলিস অফিসারকে খোঁজখবর করতে দেখলেন তখনই মনের মধ্যে আচমকা আঘাত লাগে আপনার বন্ধুর। তাঁর তখন ধারণা তাঁকে ধরতেই বুঝি পুলিস এই আপিসে এসেছে। মনটা যখন অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় মিস্টার দাশগুপ্ত, যিনি ডিক্টেশন দিচ্ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী বলেছি, 'প্লিজ রিড আউট'?"

"মনের কেমিস্ট্রি বড় জটিল জিনিস। পুলিস ও প্লিজ রিড আউট রাধাগোবিন্দবাবুর অজান্তেই মনের মধ্যে জড়িয়ে গেলো। তার পরে না হয়, পুলিস চলে গিয়েছে কিন্তু 'পুলিসের ভয় যায়নি। যতবার মিস্টার দাসগুপ্ত বলেছেন, প্লিজ রিড আউট, উনি ততবার ভাবছেন পুলিস তাকে ধরতে এলো বলে।"

"অনেক প্রশ্নের পরে এই তিন দিনে খবরটা বেরিয়েছে। আমি ওঁকে বলেছি, কত লোক মালিকের টাকা তছরূপ করেছে, মালিক কাউকে ধরতে পারেনি। ওই চ্যাপ্টার আপনি ভুলে যান। আপনি